মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

জুন ১৯৮৯ • মূল্য ৬·০০

কলকাতার জ্যোতিষচক্র

নস্ত্রাদামু ও প্রভু জগৎবন্ধুর ভারত ও বাংলা সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণী !

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ব্যান ?
কেন না এতে রয়েছে ৫৩ সেঃ মিঃ এফ্ এস্ টি ?
কেন না এটি সময়ের অনেক আগেই এসে হাজির ?
কেন না এতে রয়েছে একাধিক সম্মোহনী বৈশিষ্ট্য ?
অথবা শুধু এইজন্যে যে এটি আবার আনবে
প্রবল ঈর্ষার বন্যা ?
ওনিডা ২১
প্রতিবেশীর ঈর্ষা, আপনার গর্ব্ব।
নতুন ওনিডা কি 'ব্যান' করে দেওয়া হবে ?
AVENUES 0275 89
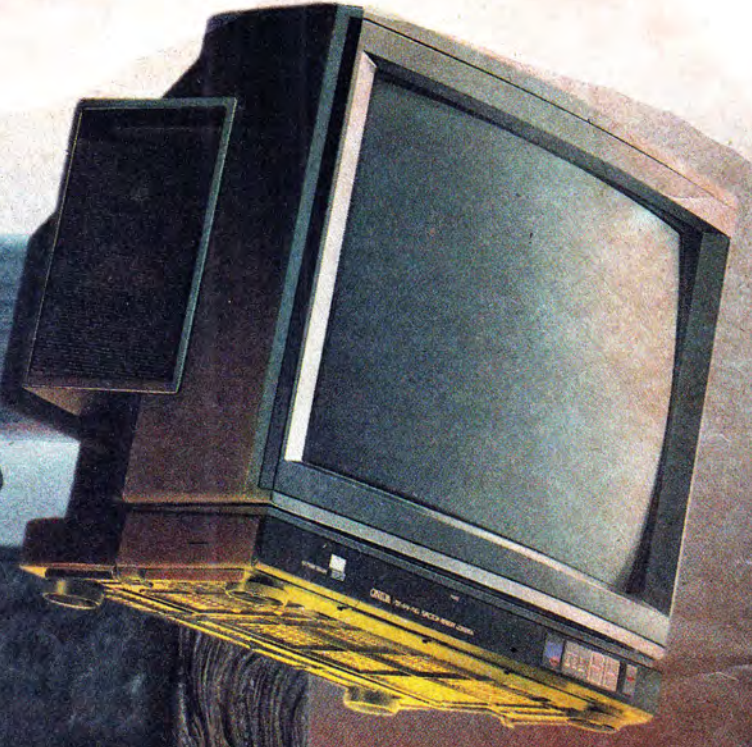
৪র্থ বর্ষ * পঞ্চম সংখ্যা * জুন ১৯৮৯

আলোকপাত

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপ সম্পাদক: গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দরবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লণ্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
ভিস্যুয়ালাইজার: শান্তনু মুখার্জি
দিল্লি কার্যালয়:
সঞ্জয় লাল: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি-১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ জুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮১০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে-৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬
টেলেক্স: ০১১ ২৫৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি-১০৩, গোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৫০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ, লখনউ-২২৬০০১
দূরভাষ: ৩৬২৬২/৩৪৪৭৭
ব্যুরো প্রধান: অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়:
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট-৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯০৩৫, ২৯৮৫৪০, ২৯৭৮২৮
টেলেক্স: ০২১ ৫১৭৩, নিউজ ইন
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক: অমিত সেন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪-২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ-এর একটি ইউনিট-সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shilong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

চলচ্চিত্র পৃষ্ঠা: ৩৭

সম্প্রতি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন তিন প্রজন্মের চিত্রাভিনেতা অশোক কুমার। চিরতরুণ অভিনেতা আর মানুষ অশোক কুমারকে নিয়ে এক অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা: ২২

নস্ত্রাদামু ও প্রভু জগৎবন্ধুর ভারত ও বাংলা সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণীগুলি কি সফল হওয়ার ইঙ্গিত পাচ্ছে? আনন্দমূর্তিজীর ভবিষ্যৎবাণীগুলিই বা কোন ইঙ্গিতবাহী? রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের ভবিষ্যৎ, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে-জ্যোতিষীদের বক্তব্য কি? রাশিয়া কি আধ্যাত্মবাদের শরণ নেবে অতঃপর? সুবাস ঘিসিং আর জ্যোতি বসুর পক্ষে আগামী দিনগুলো কোন মারাত্মক সম্ভাবনা বহন করছে?

পশচাদপট পৃষ্ঠা: ৪০

আনন্দমার্গীরা হঠাৎ তাঁদের হেড কোয়ার্টারকে কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায় নিয়ে গেল কেন? পুলিশ কি সন্দেহ করছে? আনন্দমার্গেরই বা বক্তব্য কি? একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

প্র·ধা·ন স·ম্পা·দ·কে·র ক·ল·মে

কবিপক্ষ পেরিয়ে এলাম আমরা। বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের যে সরণীতে আমাদের প্রতিদৈনিক পদযাত্রা তার সুগমতার, ঋদ্ধতার ঋত্বিক, প্রগতিশীলতার অগ্রপুরুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বার্ষিক এই বিশেষায়তন আমাদের আরেকবার সচেতন করে দেয়। যদিও এই স্মরণ, এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ঘটনা প্রতিটি দিনের, মুহূর্তেরই-তবু বিশেষ একটি দিন ২৫শে বৈশাখ-তাঁরই নামের সঙ্গে যেভাবে একাত্ম হয়ে গেছে, তাতে বলা যায় এই দিনটি থেকেই যেন আবার নতুন করে শুরু হয় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তরায়ণ। যে উত্তরায়ণের আলোকস্পর্শ আমাদের আবর্ষ আলোকিত করে রাখে।

কলকাতা শহরের জ্যোতিষজগৎ নিয়ে আমাদের এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। মধ্যযুগের ফরাসী ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নস্ত্রাদামু আর এই বাংলারই প্রভু জগৎবন্ধু যে বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন কলকাতার শীর্ষসারির জ্যোতিষীরা কি তার বাস্তবায়ণের লক্ষণগুলি সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কার করতে পেরেছেন! ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ঘটনায় তারই প্রতিভাস। এছাড়াও কলকাতার জ্যোতিষীরা আগামী সাধারণ নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্বন্ধে কতকগুলো আশ্চর্যজনক ভবিষ্যৎবাণীও করেছেন। কেউ দিয়েছেন গোর্খা নেতা সুভাষ ঘিষিংয়ের জীবনের এক অশুভ সম্ভাবনার পূর্বাভাষ। এই সঙ্গেই রয়েছে জ্যোতিষ কি বিজ্ঞান না অপবিজ্ঞান তা নিয়ে একটি যুক্তি-পরম্পরার বিতর্ক-ইতিহাস।

পশ্চিমবঙ্গ এখন বিদ্যুৎসমস্যায় ক্লিষ্ট, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অসহায়। অথচ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে নিয়ে উঠছে অভিযোগের পর অভিযোগ। অভিযোগ দেশীয় কোম্পানীর বদলে বিদেশি কোম্পানীকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ, দেশীয় পদ্ধতিকে প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাবকারী কৃতি ইঞ্জিনীয়ারকে নিদারুণ হেনস্থার, অভিযোগ কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের। এই সব তথ্য নিয়ে একটি অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে এই সংখ্যায়।

'আনন্দমার্গ', যে সংস্থাটির নাম জনমনে সততই সন্দেহের ভাব জাগায়, সৃষ্টি করে বিতর্কের–সেই আনন্দমার্গ সম্প্রতি তাদের হেডকোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে গেল কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে সুদূর দুর্গম পুরুলিয়ায়। এ ব্যাপারে আনন্দমার্গীদের বক্তব্য কি? পুলিশই বা কি ভাবছে এ নিয়ে। রয়েছে 'আনন্দমার্গ'-এর দর্শন ও কার্যকলাপের পরিচয়সহ একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

রুশ বাহিনী দেশে ফিরে গেছে বেশ কিছুদিন। ক্ষমতায় যদিও রুশ মদতপুষ্ট নাজিবুল্লাহ্ সরকার। অভিযোগ উঠেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনদের সঙ্গে এক হয়ে সরকারচ্যুতির প্রচেষ্টার। দুর্গম জালালাবাদের পাহাড়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির হালহকিকৎ নিয়ে আজকের আফগানিস্তানের ওপর একটি সরজমিন রিপোর্ট-এই আন্তর্জাতিক জটিলতার কেন্দ্রটিকে বিবৃত করেছে।

সম্প্রতি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন অশোককুমার। তাঁর এই পুরস্কারপ্রাপ্তি বোধহয় আরও অনেক আগেই সম্ভাবিত ছিল। আর অশোককুমারের ক্ষেত্রে যা কিছু পুরস্কার তা বোধহয় এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অভিনয় জীবনেই পাওয়া হয়ে গেছে। তবু স্মৃতিতে সাম্প্রতিকে মেশা এক অনন্য অশোককুমার যাঁর সঙ্গে এক অন্তরঙ্গচারণার বিবরণ রয়েছে এই সংখ্যায়।

এছাড়াও রয়েছে মহামারীর আকার ধারণ করা কমপিউটার ভাইরাস-এর ইতিবৃত্ত, বাংলার টেবিল টেনিসের ক্লিষ্ট বারমাস্যা আর উত্তর পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রের সাম্প্রতিকতা।

প্রচণ্ড দাবদাহে ক্লিষ্ট জীবনে-উদযাপিত হল একের পর এক কতকগুলি উৎসব অনুষ্ঠান। নববর্ষ, পঁচিশে বৈশাখ, ইদুলফিতর, অক্ষয়-তৃতীয়া। আসলে এই ক্লিষ্টতার মধ্য থেকে, জীবনযাপনের স্বাভাবিক রুক্ষতার মধ্য থেকেই মানুষ জীবনের রসপাত্র ভরে নেওয়ার প্রয়াস করে যায়। আর এভাবেই প্রবহমান থাকে জীবনের নিরন্তরতা। সেই নিরন্তরতার স্বাক্ষী আমরাও।

আলোক মিত্র
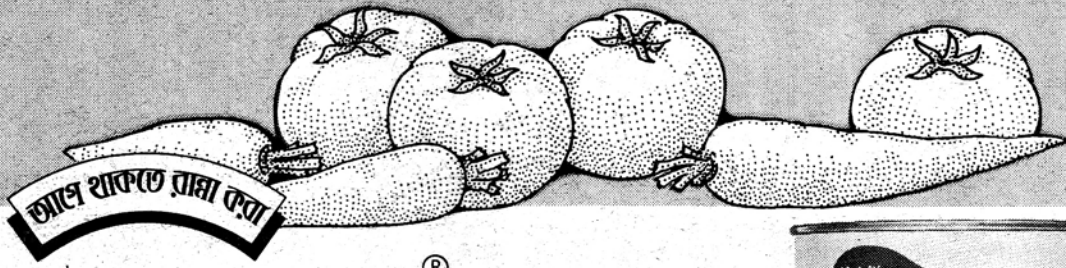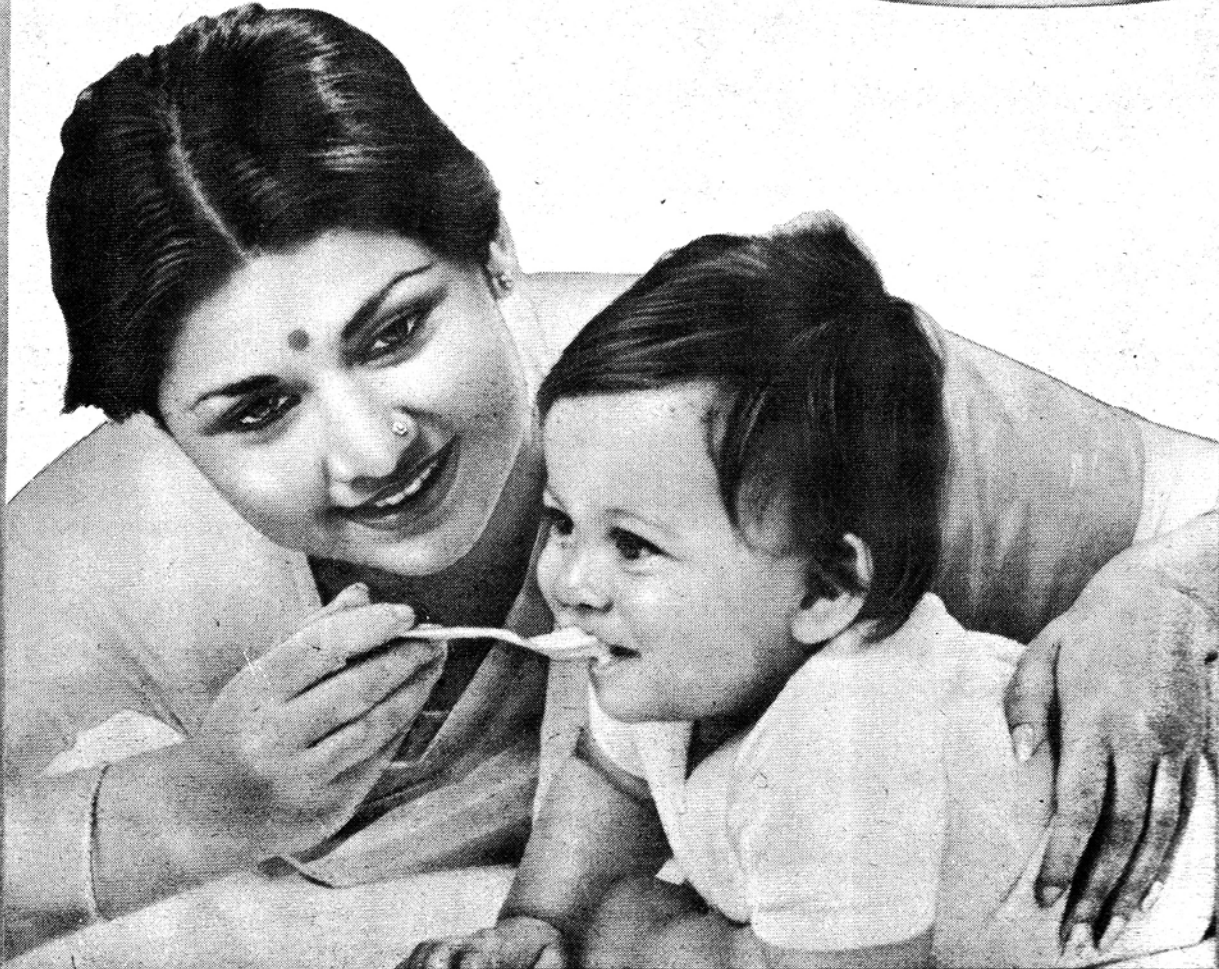
প্রতিষ্ঠানিকায় প্রকাশিত বক্তব্য প্রসঙ্গে

এপ্রিল '৮৯ সংখ্যায় ৪৯-পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিষ্ঠানিকা শীর্ষক প্রতিবেদনে প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রতিবাদ জানানোর ন্যায় সঙ্গত অধিকার সকলেরই আছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিধান সভায় আমরা মাননীয় রাজ্যপালের বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম মাত্র, দৈহিক তো বহুদূরের কথা, মানসিকভাবেও বিন্দুমাত্র অবমাননা করার কোন ক্ষীণতম চিন্তা আমাদের ছিল না। আমরা রাজ্যের নৈরাজ্যমূলক অবস্থার প্রতি সরবে মাননীয় রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। কাজেই 'নরুল সাহেবকে মারতে তেড়ে আসেন' মন্তব্যটি সঠিক নয় এবং আপত্তিকর। বরং আমাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে—কতিপয় বামপন্থী বিধায়কের কাছে। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নার্সিং হোমে ভর্তি হতে হয়েছিল আঘাতের চিকিৎসার জন্যে। এ বিষয়ে আপনার পত্রিকাতে কোনও উল্লেখ নেই।

কাজেই এমন বিতর্কিত বিষয়ে প্রতিবেদন ছাপতে পাঠানোর আগে—কংগ্রেস আমলে বর্তমান শাসক দলের তৎকালীন বিধানসভায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভের পদ্ধতি ও ঘটনাগুলো যে কোন প্রতিষ্ঠিত দৈনিকের পুরোনো রেকর্ড থেকেই জানতে পারবেন—'যে ভারতের ইতিহাসে প্রথম ' কথাটিও ঠিক নয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবাদ পত্র পাঠালাম। সংবাদপত্র ও জনগণের স্বার্থে 'পাঠকের অধিকারে' এটা ছাপলে বাধিত হব।

সুলতান আহমেদ
এম.এল.এ.
কলকাতা—১৬

দলমা পাহাড়ের হাতি

'আলোকপাত' মার্চ ১৯৮৯, জলে জঙ্গলে 'দলমা পাহাড়ের হাতি' বিষয়ক সরজমিন প্রতিবেদনটি পড়ে প্রতিবেদকের প্রতীয়মান ও প্রদত্ত প্রসঙ্গের দু'একটি বিষয়ের উপর কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই।

প্রথমত তারিখটা ছিল ডিসেম্বর মাসের ১৭, শনিবার অর্থাৎ বাংলা ২রা পৌষ। এবার প্রতিবেদকের লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি—'মাঝে মধ্যে বিশাল চেহারার মহয়া গাছ। তার ডালে ডালে আধ পাকা মহয়া ফলের থোকা। যেগুলি পেকেছে, নিচে পড়েছে সেগুলি। আর পাকা মহুলের নেশাঘন সুবাস; মাতাল করে দিচ্ছে এখানকার বাতাসকে।

বীরেন মাহাতোর দলবল হঠাৎই সতর্ক হয়ে গেল এখানটায়। মহয়া মদের নেশা যেমন অরণ্যচারী মানুষের, তেমনি পাকা মহুলের নেশা অরণ্যচারী হস্তিবাহিনীর।'

এখানে প্রতিবেদক মহুল ফুলকেই ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন, মহুল, ফুল এবং ফল এক জিনিস নয়। প্রথমে মহুল ফুল হয় এবং ফুল ঝরে পড়তেই পরে তা থেকে ফল ধরে। কিন্তু ফুল ও ফল দুটি দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের কার্যকারিতাও বিভিন্ন। প্রতিবেদক যেটা দেখেছেন সেটা মহুল ফুল, ফল নয়। আর ঠিক এই মহয়া প্রসঙ্গেই প্রতিবেদকের লেখাটি পড়ে হোঁচট খেলাম। কেননা, তিনি যে সময়ে মহয়া ফুলের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন সেই সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৭, কোনক্রমেই মহয়া ফুল বা ফলের উপযুক্ত সময় নয়। মহয়া ফুল প্রধানত আসে আরও আড়াই মাস পরে অর্থাৎ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কিংবা মাঝামাঝি সময় থেকে। প্রকৃতির এতবড় ব্যাপক পরিবর্তন বোধহয় নিশ্চয়ই হয়নি যে নির্দিষ্ট সময়ের জিনিস অসময়ে দেখা দেবে। আরও তিনি লিখছেন—'মাঝে মধ্যে দু' একটা পাখপাখালীর ডাক ও পাতা খসে পড়ার শব্দ।' পাতা খসতে শুরু করে শীত যাবার সঙ্গে সঙ্গে, শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে নয়। তাই এখানে প্রতিবেদক বাস্তব ঘটনা না লিখে তাঁর অনুভূতিটাই ব্যক্ত করেছেন বলে আমার মনে হয়।

দ্বিতীয়ত প্রতিবেদক লিখেছেন, আদিবাসীদের দেবতা হচ্ছে গণেশ ঠাকুর, অর্থাৎ পক্ষান্তরে তিনি বলতে চেয়েছেন, হিন্দুদের ঠাকুর নয়। যদি হত তা হলে নিশ্চয়ই মৃত হাতিটা নিয়ে বিরোধ দেখা দিত না। আমি একজন স্বয়ং আদিবাসী হয়ে জোর গলায় বলতে পারি যে গণেশ ঠাকুর হিন্দুদেরই দেবতা বরং আদিবাসীদেরই নয়। আমি জানি আদিবাসীরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়, তাঁরা প্রকৃতির পূজা করে। মারাং বুরু, জাহের এরা, সিঙ চাঁদো, এইসব তাদের দেব দেবী এবং এগুলি এক একটি প্রকৃতিরই নাম থেকে উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতির পূর্ণ উপাদানগুলিকে মানতেই তারা পূজা দেয়। পক্ষান্তরে হিন্দুদের গণেশ ঠাকুরকে দেখেছি দেবী দুর্গার সাথে কলা বৌ হিসেবে, ব্যবসাদারদের খাতায় শুভ সিদ্ধিদাতা হিসেবে।

কাজেই এটা জোর করে আদিবাসীদের ঘাড়ে, আলোকপাতের পাঠকদের ঘাড়ে, অধুর ঘাড়ে বধুর বোঝা চাপানোর মত ব্যাপারটা হচ্ছে না কি?

জগন্নাথ হেমব্রম।
বাঁকুড়া

লেখকের উত্তর

মহয়া ফুল নয় ফল; এ প্রসঙ্গে জগন্নাথবাবু ঠিকই বলেছেন, তবে ঠিক বলেননি গণেশ ঠাকুর সম্পর্কে হাতী-দেবতাকে আদিবাসীরা গণেশ ঠাকুর বলে পূজা করে; তার প্রমাণ বান্দোয়ানের পাশে পুরুলিয়ার চম্পাসিনি গ্রামের মন্দির। তবে গণেশ হিন্দুদেরও দেবতা বটে। আমার লেখা পড়ার এবং মতামত জানাবার জন্য জগন্নাথবাবুকে ধন্যবাদ।

অমিতবিক্রম রাণা

সলমান রুশদি ও খোমেইনি

একজন দেশের প্রেসিডেন্ট খোমেইনির মনোবৃত্তি যে কত জঘন্য, বর্বরচিত ও অমানুষিক তা সলমান রুশদিকে হত্যা করার আদেশেই বোঝা যায়। খোমেইনি নিজেই বোধ হয় সলমান রুশদির ওই 'স্যাটানিক ভার্সেস' পড়েননি। এই বইয়ে এমন কিছু জঘন্য উক্তি 'রুশদি' করেননি যাতে ওনার প্রাণদণ্ড হতে পারে। প্রত্যেক ধর্মের প্রধান ত্যাগ স্বীকার ও ক্ষমাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। খোমেইনি যে নিজেই একজন ফ্যানাটিক তা তাঁর রুশদিকে হত্যা করার আদেশেই বোঝা যায়। ইরাণকে খোমেইনি এমন জায়গায় নিয়ে এসেছেন যা বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, শিল্পকলায় ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক পেছনে পড়ে গেছে। খোমেইনি শুধু নিজের ধর্মীয় প্রাচীন প্রথার বিস্তারের জন্যই ইরাণকে সমূলে বিনাশ করেছেন। সলমান রুশদি যে একজন বড় লেখক তার প্রমাণ উনি আগেও দিয়েছেন। বই লেখার জন্য যদি কারুকে হত্যা করার আদেশ হয় তবে এই সভ্য জগতে তার চেয়ে আর কিছু জঘন্যতম হয় না। আলোকপাতের এপ্রিল সংখ্যার খোমেইনি ও সলমান রুশদির প্রতিবেদনটি খুবই সময়োচিত ও সুলিখিত।

ভূপেন বসু
টেলকো কলোনি, জামসেদপুর—৪

সবাই এখন অস্ত্র যোগাড়ে ব্যস্ত

প্রতিবাদী মানুষদের হাতে গোপনে অস্ত্র তুলে দেবার খেলা বহুদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে। এই শুরু হওয়ার উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। এখন প্রশ্ন হ'ল—কে বা কারা জনগণ? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাখ্যানুসারে 'জনগন' শব্দটার অর্থ এখন অন্য রকম। বলা বাহুল্য সাধারণ মানুষের অবস্থা যত বেশি খারাপ হচ্ছে তত বেশি পরিমাণে কিছু লোক দলাদলি আর হিংসা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কার স্বার্থে। এ তো সেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। জমিনের ওপর কত রঙের নিশান, দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার আর প্ল্যাকার্ড—'এই অন্যায় রুখবই'। কিন্তু অন্যায় রোখার হাতিয়ার কোন কর্মশালায় তৈরি হয় এটা কারুর জানা নেই। বোমা বারুদ তৈরি হয় গ্রামেগঞ্জে, ছেলে ছোকরারা এ বিষয়ে একসপার্ট, তাছাড়া গোপনে আগ্নেয়াস্ত্রের বোঝা নেমে আসে। ডাকাতি ছিনতাই চুরি এ সব কাজে হাতিয়ার বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রাসট্রেটেড যুবকেরা। কিন্তু এত অস্ত্র ওরা পেল কোত্থেকে? নেতারা এ কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসেন। পুলিশের মনে আতঙ্ক, সমাজবিরোধীদের হাতে এত আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে—যে ওদের মারতে গেলে নিজেদেরও মরতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে যে এত কড়া প্রহরা ও সাবধানতা বজায় রাখা সত্ত্বেও অসংখ্য বন্দুক, স্টেনগান এসব রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে চলে গেল কিভাবে? এখন পুলিশ ও জনতা মুখোমুখি।

পরিস্থিতি এমন হলে জনমানসে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা তো ছড়াবেই। দেশের অস্ত্রশালা থেকে চোরাই পথে হাজার হাজার অস্ত্র বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, বাইরে থেকেও অস্ত্রের আমদানী হয়, সুতরাং বিভেদ আর বিচ্ছেদের আগুন যে কোন সময়ে জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। কোনও রকম সংহতি ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াস সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিভেদের গোড়ায় শান্তিজল দিতে না পারলে ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ স্থাপিত হবে না। কোনকালেই নয়। কিন্তু এই মূল প্রক্রিয়া কিভাবে শুরু হবে সেটাই তো বড় কথা। এ কাজ করবার সাহসই বা আছে কার—এ প্রশ্ন এখন নিরীহ জনগণের মনে দানা বাঁধছে।

রমেন্দ্র নারায়ণ দে।
দিনহাটা, কোচবিহার।

কলকাতা দূরদর্শনের ফ্রি ল্যান্সারর

তপদ্রিদের বাড়িতে গান বাজনার রেওয়াজ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় করার দিকে একটা ঝোঁক ছিল। তাই বসিরহাটের আম্রপালী থেকে পায়ে পায়ে এসে উপস্থিত হল টালিগঞ্জের রসা রোডের দূরদর্শন ভবনে। শখ ছিল দূরদর্শনে নাটকে অভিনয় করার। অনেক ঘোরাঘুরির পর ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম করেছিল।

এরপর পরেশ ভট্টাচার্য্যের কাহিনী এবং পরিচালনায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিল 'জঙ্গল পাহাড়ী' ছবিতে। রোলটা বেশ বড়। দুর্ভাগ্য, এখন পর্যন্ত ছবিটি বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে। ওর ভাগ ওই জায়গায় এসে থেমে গেছে। চেষ্টা চরিত্র করে কিছু হয়নি। এখন ভোটার লিস্টের ক্যাজুয় চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে, ও সময়টা যদি অন্য কাজে লাগাতাম তাহলে অ বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হ না।

কৃষ্ণপদ দাস আকাশবাণীর অস্থায়ী ঘোষ দূরদর্শনে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান করেছে কিছুদিন আগে মাইকেল মধুসূদনের জন্মদি মেঘনাদ বধ কাব্যের একটি অংশ পাঠ করলে

অমৃতা দত্ত

টি·ভি· পর্দায় মুখ দেখাবার আশায় কলকাতা দূরদর্শনের কাছে ভিড় করা ফ্রি ল্যান্স অংশগ্রহণ কারীদের এই সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাদের সমস্যা ও সমাধানের দিকে সরজমিন আলোকপাত।
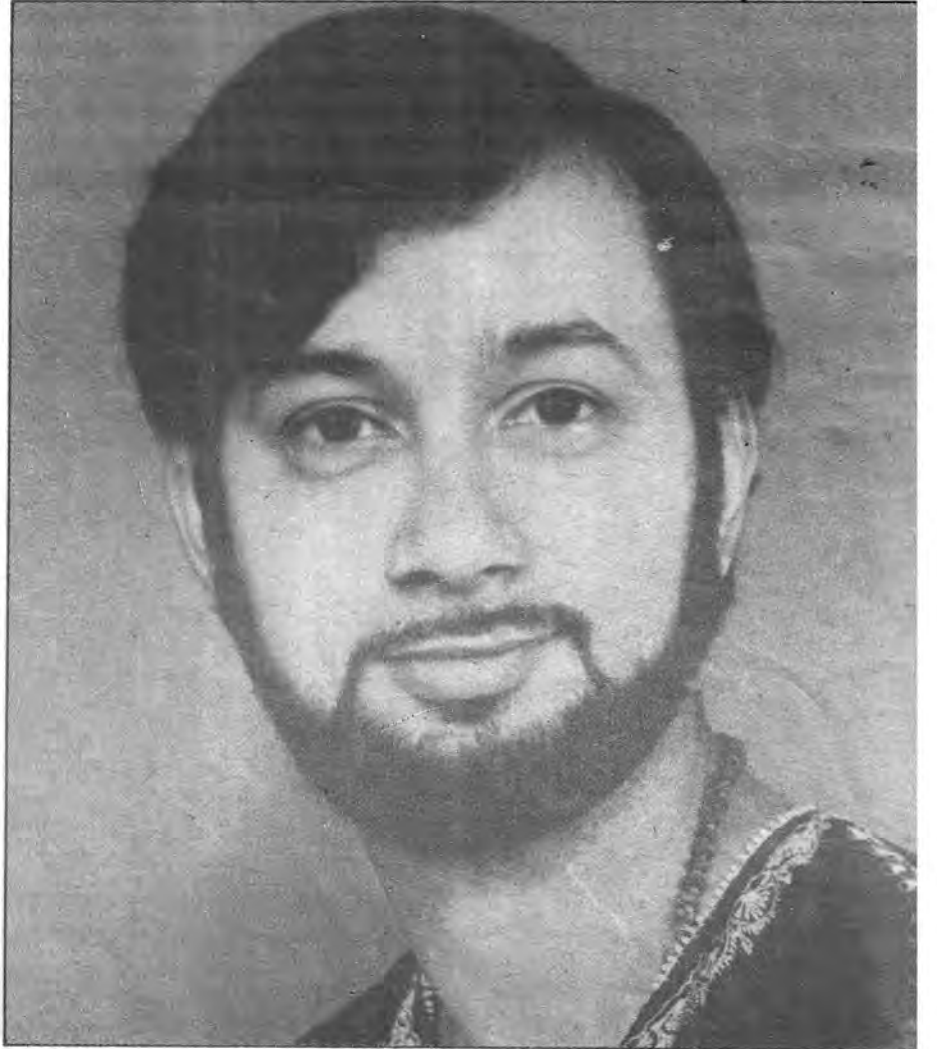
তপদ্রি ভট্টাচার্য্য : ছোট পর্দায় মুখ দেখানোর ইচ্ছা

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

কারণ কমপ্লান ওদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়।

সাধারণত ১৫/১৬ বছর পর্যন্তই ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার বয়েস।
প্রোটিন হোল এমন এক পুষ্টিকর উপাদান, যা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈহিক গঠনে সরাসরি কাজ দেয়। তাই এখন থেকে আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যেও চাই কমপ্লান।
কমপ্লান-এ আছে সেরা প্রোটিন অর্থাৎ দুধের প্রোটিন (২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

কমপ্লান বিভিন্ন মুখরোচক স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়

23

সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/38/244 BEN

কৃষ্ণপদ দাস

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

এছাড়া 'তরুণদের জন্য' বিভাগে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠানও করেছেন। দূরদর্শনে কি ভাবে অনুষ্ঠান করা যায়? প্রশ্ন করার আগেই চটপট উত্তর দিলেন কৃষ্ণ। যারা আকাশবাণীতে আগে অনুষ্ঠান করেছেন তাঁরাই সুযোগটা বেশি পান। প্রথমেই জানতে চাওয়া হয় আকাশবাণীতে তিনি কি ধরনের প্রোগ্রাম করেছেন। তারপর তার ওপরে নানা ধরনের প্রশ্ন করা হয়। সঠিক উত্তর দিতে পারলেই প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। তবে রেকর্ডিং করার আগে একটা রিহার্স্যাল হয়। তাতে কে কিভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে তা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়। সেইমত রেকর্ডিং হয়। তারপর তা প্রচার করা হয়।

অমৃতা দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন নিয়ে এম·এ· পাশ করেছেন। আগে অনুষ্ঠান করতেন আকাশবাণীর যুববাণীতে। এম·এ পাশ করার পর বেশ কিছুদিন অধ্যাপনা করেন শ্রীরামপুর কলেজে। সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্কের লাইব্রেরীতে কাজ করছেন।

কথায় কথায় বললেন, আমি আকাশবাণীতে অনুষ্ঠান করার সময় একদিন এক প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ আমায় বলেন তুমি দূরদর্শনে প্রোগ্রাম করছ না কেন? তোমার যা পারফরমেন্স ওখানে গেলে তুমি সুযোগ পাবে। একদিন দূরদর্শন ভবনে এলাম। দেখা করলাম 'তরুণদের জন্য' অনুষ্ঠানের প্রযোজক সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উনি আমার সব কিছু জানার পর কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, আমি তার যথাযথ উত্তরও দিলাম। উনি খুশি হয়ে আমায় সুযোগ দিলেন অনুষ্ঠান করার। আমি ১৩ই এপ্রিল ১৯৮৯ আমবেদকারের ওপর একটা আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করি।

নারায়ণ পাল আকাশবাণীর নাটক বিভাগের ক্যাজুয়াল কর্মী। নাটক সম্পাদনা ওঁর কাজ। দূরদর্শনে 'সৌরশক্তি' নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছেন। দূরদর্শনে ওর সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছিল। সৌরশক্তি কি ভাবে মানুষের কাজে লাগে তার ওপরই ছিল এই অনুষ্ঠান।

দূরদর্শনে 'তরুণদের জন্য', 'যুবজগৎ' এইসব অনুষ্ঠান করার জন্য অডিশন দিতে হয়। অডিশন ফর্ম পাওয়া যায় দূরদর্শন ভবন থেকে। দূরদর্শনের মাধ্যমেই জানিয়ে দেওয়া হয় কবে অডিশন ফর্ম দেওয়া হবে। তারপর সেই ফর্ম জমা দিতে হয়। এবং একটা নির্দিষ্ট দিনে অডিশন নেওয়ার জন্য ডাকা হয়। তাতে উত্তীর্ণ হলে অনুষ্ঠান করার সুযোগ আসে।

তবে অডিশন নিয়ে অনেকেরই নানা ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। দূরদর্শনে গান বা নাচের অডিশন যখন নেওয়া হয় বিচারকেরা তাদের সামনেই বসে থাকেন। ফলে যারা পরীক্ষার্থী তারা ঘাবড়ে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যারা বিচারক হয়ে এসেছেন তাদের ছাত্র কিংবা ছাত্রীরা অডিশন দিতে এসেছে। এমন কি সেইসব পরীক্ষার্থীদের আবেদন পত্রে সেইসব বিচারকদের দেওয়া ক্যারেকটার সার্টিফিকেটও আলপিন দিয়ে আঁটা থাকে।

এদিক থেকে আকাশবাণীর অডিশনের ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে কোন পরীক্ষার্থী বিচারকদের দেখতে পায় না। বিচারকরা পরীক্ষার্থীদের দেখতে পায় না। এমন কি নামও জানতে পারে না। একমাত্র রোল নম্বরেই থাকে এর পরিচয়।

অডিশনে পাস করার পর সেইসব পরিক্ষার্থীর বাড়িতে চিঠি যায়। অর্থাৎ প্রোপোজাল লেটার পাঠানো হয়। তাতে লেখা থাকে সে কি অনুষ্ঠান করবে, কত সময়ের জন্য এবং কত পারিশ্রমিক পাবে। রেকর্ডিং কবে হবে ও তার প্রচার সময়ও লেখা থাকে প্রোপোজাল লেটারে।

রেকর্ডিং—এর আগে একবার মহড়া দিয়ে নেওয়া হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে দূরদর্শনে লাইফ প্রোগ্রামও দেখানো হয়। সেটা 'তরুণদের জন্য; যুবজগতেও' মাঝে মাঝে দেখানো হয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের ঝুঁকি অসম্ভব। বেফাঁস কিছু হয়ে গেলেই গণ্ডগোল। এই প্রসঙ্গে স্মরণে আনা যেতে পারে গতবছর পাটনা বেতার কেন্দ্র থেকে একটা লাইফ প্রোগ্রাম প্রচারিত হচ্ছিল শিশুদের নিয়ে। অনুষ্ঠান চলার সময় প্রায় শেষের দিকে হঠাৎ রাজীব গান্ধীকে ব্যাঙ্গ করে একটা বাজারচলতি শ্লোগান ঢুকে পড়েছিল। ফলে পাটনা স্টেশন ডিরেকটর বদলি হন এবং প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভকে সাসপেন্ড করা হয়। এই ধরনের ঝুঁকি থাকে বলেই খেলা ছাড়া দূরদর্শনে লাইফ প্রোগ্রাম খুব কম হয়।

দূরদর্শনে অডিশনে পাস করার পর একবার মাত্র অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেয়েছেন বলে অনেকে আক্ষেপ করেছেন। এই বিষয়ে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের মতামত, আমাদের প্রত্যেক দিন সম্প্রসারণের সময় ২ ঘন্টা ৩৫ মিঃ বা সামান্য কিছু বেশি। এই কম সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গার অনুষ্ঠান কম বেশি রাখতে হয়। সুযোগও দিতে হয় সকলকে। তাতে একজনকেই একবারের বেশি দুবার অনুষ্ঠান করার সুযোগ দেওয়া অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

কেমন লাগে? এই প্রশ্নের উত্তরে কম বেশি সকলেই একই কথা বলেছেন। দূরদর্শনের পর্দায় নিজেকে দেখতে কার না ভাল লাগে। সুযোগ পাওয়াটাই এখানে বড় ব্যাপার। আর কিছু না হোক একটা আত্মতৃপ্তি তো পাওয়া যায়। তবে অডিশনের ব্যাপারে কারচুপি যে একেবারেই হয় না একথা অস্বীকার করছেন অনেকেই।

২০শে মার্চ ১৯৮৯ দূরদর্শনের অডিশন চলছিল নাচের। উপস্থিত বিচারকদের মধ্যে ছিলেন শিবশঙ্কর এবং বেলা অর্ণব। দেখা গেল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী অডিশন দিতে এসেছেন। কথাবার্তায় বোঝা যায় এইসব ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে বিচারকদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই আছে। ফলে এইসব দৃশ্যে অন্যান্য যারা উপস্থিত থাকে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মনের উপর একটা চাপ পড়ে। আর অডিশনের সময় পরিচিত ছাত্র ছাত্রীদের একটু তো অন্য চোখে দেখেনই উপস্থিত বিচারকরা। এ নিয়ে অনেক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে দূরদর্শন কেন্দ্রে। কিন্তু এ বিষয়ে কারুর কোন মাথাব্যাথা নেই। গতানুগতিক প্রথায় এগিয়ে চলেছে অডিশন নামের এই প্রহসন।

জ্যোতি প্রকাশ ব্যানার্জি।

বিতর্কিতা শ্রদ্ধামাতা

এম·ও·মাথাইয়ের 'রেমিনিসেন্সেজ অফ দি নেহেরু এজ' বইটির এক বিশেষ অধ্যায়ে নেহেরু জীবনের যে চারজন বিশিষ্ট মহিলার কথা বলা হয়েছে তার প্রধানতমা শ্রদ্ধামাতা। নেহেরুর সঙ্গে কেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিসম্পর্ক! ব্যাঙ্গালোরে ফেলে যাওয়া শিশু পুত্রটিই বা কার? কেমন করেই বা কাটছে শ্রদ্ধামাতার সাম্প্রতিক জীবন?

নিজের আশ্রমের, প্রিয় কুকুরদের সঙ্গে

দশ বছরেরও আগে এম·ও· মাথাইয়ের 'রেমিনিসেন্সেজ অফ দি নেহেরু এজ' বইটি বাজারে এসেই হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের এমন কিছু কথা মাথাই লিখেছিলেন যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এই বইটিতে একটি অধ্যায় ছিল 'নেহেরু এণ্ড উইমেন'। এই অধ্যায়ে চারজন বিশিষ্ট মহিলার কথা লেখা হয়েছিল। তাঁরা হলেন: মৃদুলা সারাভাই, পদ্মজা নাইডু, শ্রদ্ধামাতা এবং এড্উইনা মাউন্টব্যাটেন। এই চার মহিলার সঙ্গে নেহেরুর সম্পর্ককে ঘিরে মাথাই এমন খোলাখুলিভাবে লিখেছিলেন যে এই অধ্যায়টিই সবচেয়ে চর্চিত হয়ে উঠেছিল।

যখন কিছু সাংবাদিক জানতে পারলেন যে এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধামাতা আজও জয়পুরে সন্ন্যাসিনী রূপে জীবন কাটাচ্ছেন তখন তাঁরা শ্রদ্ধামাতার সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন। দেখা তাঁরা করলেন বটে কিন্তু শ্রদ্ধামাতার কাছ থেকে এমন কোন কথা বার করতে পারলেন না যে মাথাইয়ের লেখা নেহেরুর সঙ্গে তাঁর 'বিশেষ সম্পর্ক'—র কথা আরও মজবুত হয়। শ্রদ্ধামাতা মাথাইয়ের কথাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, মাথাইয়ের লেখা উদ্দেশ্যমূলক এবং শুধুশুধু তাঁর নামে বদনাম ছড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

এম·ও· মাথাই তাঁর এই বহুচর্চিত বইটিতে শ্রদ্ধামাতার জন্যে দুটো পুরো পৃষ্ঠা খরচ করেছেন। তার সারাংশ এই: ··· ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে বেনারস থেকে সংস্কৃত এবং প্রাচীন ভারতীয়

শ্রদ্ধামাতা, এখন

ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত সুন্দরী যুবতী সন্ন্যাসিনী শ্রদ্ধামাতা এক সাংসদের মারফৎ পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে প্রথম দেখা করেন। এরপর যখন তখন নেহেরুর সঙ্গে তিনি দেখা করতেন। এই দেখাসাক্ষাৎটা হত অনেক রাতে, যখন নেহেরু তাঁর দিনের কাজ শেষ করতেন। একবার তো লখনউ–এ তিনি মাঝরাতে দেখা করেছিলেন নেহেরুর সাথে। এরপর শ্রদ্ধামাতা একেবারে হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলেন। ১৯৪৯–এ নভেম্বরে ব্যাঙ্গালোরের এক কনভেন্ট থেকে একজন লোক এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে দিল্লিতে আসে। সে বলে যে, কয়েক মাস আগে উত্তর ভারতের এক যুবতী, কনভেন্টে একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তিনি বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে চলে গেছেন। যাবার সময় তিনি এই চিঠির বাণ্ডিলটি নিয়ে যেতে ভুলে যান। জানা যায়, চিঠিগুলি প্রধানমন্ত্রীর। এই লোকটিও নিজের সম্পর্কে বা কনভেন্ট সম্পর্কে কিছুই বলেনি।

পণ্ডিত নেহেরুকে সব জানানো হয়। তিনি কোন ভাবান্তর না দেখিয়েই চিঠিগুলি ছিঁড়ে ফেলেন। ঐ বাচ্চাটি সম্পর্কে তখনও বা পরেও কোন আগ্রহই তিনি দেখাননি। শ্রদ্ধামাতা সম্পর্কে পরে আমি শুনি যে তিনি চুল রাখছেন এবং ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছেন। পরে তিনি আর পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করার কোন চেষ্টাই করেননি। আমি ঐ বাচ্চাটিকে খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হইনি। যদি খুঁজে পেতাম তাহলে নিজের কাছে রাখতাম। সে একজন ক্যাথলিক ক্রিশ্চান হিসেবে বড় হয়েছে। বেচারী জানেই না তার বাবা কে!

মাথাইয়ের কথিত এই 'রহস্যোদ্ঘাটন' এর পর, কিছু লোক খোঁজখবর করতে চেয়েছিল কিন্তু বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি কেউই।

বিদেশি শিষ্যের সঙ্গে

অভয় মুদ্রায়

যে সব সাংবাদিক জয়পুরে শ্রদ্ধামাতার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন তাঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধামাতার ব্যবহার ছিল প্রায় শুষ্ক।

ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটাই স্তিমিত হয়ে আসছিল। শ্রদ্ধামাতার সম্পর্কেও আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে গেল। শ্রদ্ধামাতা সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ করে দিলেন। দু'এক বছরের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে এদিক ওদিকে কিছু খবর বেরোতে লাগল কিন্তু তা ছিল অনুযোগপূর্ণ। শ্রদ্ধামাতা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেলেন। তিনি নিজে থেকে বেশি কিছু বলতেন না। শুধু যেটুকু তাঁকে জিজ্ঞেস করা হত সেটুকুরই জবাব দিতেন।

প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব

শ্রদ্ধামাতার ব্যক্তিত্ব খুবই প্রভাবশালী। তিনি অনর্গল ইংরেজী, হিন্দি ও সংস্কৃত বলতে পারেন।

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

এথিনা রাসেল ঃ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী শিশুটির শৈশব

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক জাহাজ ব্যবসায়ী এ্যারিস্ততল ওনাসিসের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা ক্রিশ্চিনাও মারা গেলেন, এই বিশাল বিশ্বে শিশুসন্তান এথিনাকে একমাত্র উত্তরাধিকারী রেখে! কি ভাবে কাটছে এথিনার শৈশব?

এথিনা রাসেল একা হয়ে গেল মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়েসেই। তার মা ক্রিশ্চিনা ওনাসিস হঠাৎ মারা গেলেন। কোটিকোটি টাকার সম্পত্তির মধ্যে এতটুকু মেয়ের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, যদিও সেখানে তার জন্যে বাবা–মা'র এতটুকু স্নেহ ভালবাসার স্পর্শ নেই। বাড়ন্ত বছরগুলো তাকে পাড়ি দিতে হবে একা! একজন অনাথশিশু হিসেবে তাকে বেড়ে উঠতে হবে মায়ের স্নেহ–মমতা যত্ন ছাড়াই! উত্তরাধিকার দাবি করার বয়েসে পৌঁছতে তাকে এখনও দীর্ঘ পনেরটি বছর কাটাতে হবে, কিন্তু এখনই একটা চমকে দেওয়ার মত খবর আছে। তার বাবা তিয়েরি রাসেল তাকে সংসারের স্বাদ দিয়েছেন। এথিনা পেয়েছে সৎমা গ্যাবি ল্যান্ডেজকে এবং গ্যাবির দুই শিশুসন্তান এরিক এবং স্যানড্রিনকে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভার কাছে

এথিনা সৎমা গ্যাবি [illegible] সৎ ভাইয়ের সঙ্গে

একটি ভাড়া বাড়িতে এথিনা এখন এদের সঙ্গে সুখে পারিবারিক জীবনযাপন করছে।

রাসেল বহুদিন থেকেই একই সঙ্গে ক্রিশ্চিনা এবং গ্যাবিকে চিনতেন। এবং একই সঙ্গে দুজনকেই ভালবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই মহিলাও পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা দু'জনে দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং একত্রে বহু সময় কাটাতেন নিজেদের শিশুদের নিয়ে, যে শিশুদের পিতা একই পুরুষ। গতবছরেও, ক্রিশ্চিনার মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও ক্যাপসেরাৎ–এ একটি ভিলায় গ্যাবি, ক্রিশ্চিনার সঙ্গে গরমের ছুটি কাটিয়েছেন। ক্রিশ্চিনা রাসেলের জীবনে অন্য মেয়ের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তিনি জানতেনই ক্রিশ্চিনাকে বিয়ে করার দশ বছর আগে থেকেই রাসেল গ্যাবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

যাইহোক ক্রিশ্চিনার মৃত্যুর পরে এথিনার জীবন থেকে যা হারিয়ে গিয়েছিল এখন সেটুকু অন্তত সে ফিরে পেয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাসেল নিজের ছত্রিশতম জন্মদিন পালন করলেন শ্যাম্পেনের বোতল খুলে। বিখ্যাত কনফেকশনারের বানানো বার্থডে কেকের একটা বড় টুকরোর সাথে তিন চুমুক ফেনায়িত শ্যাম্পেনও দেওয়া হয়েছিল এথিনাকে। তার সৎভাই এবং সৎ বোনও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বাবার সুখী জন্মদিন পালনের জন্যে।

তিয়েরি রাসেল, এথিনার সঙ্গে

তা সত্ত্বেও রাসেল চিন্তিত। কেননা, তাঁর এবং গ্যাবির মধ্যেকার সম্পর্কটা বাচ্চাদের মনে দাগ ফেলতে পারে। তিনি এথিনার জন্যেই বিশেষ করে চিন্তিত। কারণ, খুব শিগগির সে পড়তে শিখবে এবং যখন তার এবং গ্যাবির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন বিরূপ মন্তব্য শুনবে তখন তার খুব খারাপই লাগবে। রাসেল চান তাঁর তিন সন্তান পারস্পরিক আন্তরিকতার মধ্যে বেড়ে উঠুক। এথিনা যেন নিজের মা নেই বলে কোন অসুবিধায় না পড়ে। তাঁর আরও চিন্তা এই জন্যে যে খবরের কাগজগুলো ক্রিশ্চিনার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এই ধরনের খবরের ফলে এথিনা মুষড়ে পড়বে এবং মায়ের কথা জানতে চাইবে আর জানতে চাইবে, তার মা কেন নেই। রাসেল বলেছেন, 'ক্রিশ্চিনার মৃত্যুকে আত্মহত্যা সন্দেহ করায় আমি খুবই আঘাত পেয়েছি। সে এথিনাকে এত ভালবাসত যে তাকে কখনও ছেড়ে থাকার কথা চিন্তা করবে না। তা ছাড়া, ক্রিশ্চিনা তো সুখীই ছিল সব মিলিয়ে।' তিনি আরও বলেছেন যে, 'মৃত্যুর আগে আর্জেন্টিনা থেকে ফোন করে ক্রিশ্চিনা জানিয়েছিলেন যে সেখানে কি করছেন এবং কত আনন্দে ছুটি কাটাচ্ছেন।' রাসেল এও বলেছেন, 'আমরা একসাথে এথিনার জন্মদিন পালনের পরিকল্পনা করেছিলাম।'

তিয়েরি রাসেল ফরাসী ম্যাগাজিন 'প্যারি ম্যাচ'–এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ক্রিশ্চিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং নিজের অতীত কাহিনী অকপটে স্বীকার করেছেন। যখন ক্রিশ্চিনার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় তখন তিনি সুইডিশ মহিলা গ্যাবির সঙ্গে বসবাস করছিলেন। তবে ক্রিশ্চিনার সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল কৈশোরের উচ্ছলতাময়, এবং তা এত প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল যে ক্রিশ্চিনার বাবা বিশ্বের সর্বাধিক ধনী জাহাজ ব্যবসায়ী আরিস্তোতল ওনাসিস স্কোরপিয়স আইল্যান্ডে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে রাসেলকে ক্রিশ্চাকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন।

২০ বছরের রাসেলের কাছে তখন ক্রিশ্চিনা ছিল আগুন আর গ্যাবি নেহাতই জল। যদিও দুজনকেই তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন। ক্রিশ্চিনার সঙ্গে রাসেলের বিয়ে অবশ্য হয়নি। রাসেল ক্রিশ্চিনাকে ছাড়ার পর এরপর ন'বছর গ্যাবির সঙ্গে কাটান। ছাড়া–ছাড়ির পর এই সময় থেকেই ক্রিশ্চিনার দুঃখের দিন শুরু হয়। গ্যাবিও মার্কেটিং–এ পড়াশোনা শেষ করে সুইডেনে চলে যান। তারও তিন বছর পরে রাসেল আবার ক্রিশ্চিনাকে খুঁজে পান। ক্রিশ্চিনা তখন সুইজারল্যান্ডের স্যাঁৎ মরিৎজ ছেড়ে কেনিয়ায়। তিনি রাসেলকে আমন্ত্রণ জানান। আরও বহুবার আমন্ত্রণের মধ্যে এটাই ছিল তাঁর প্রথম আমন্ত্রণ। তিনি রাসেলকে নিজের জীবনের একাকিত্বের ভীষণ সমস্যার কথা জানান। রাসেল আবিষ্ট হন

এবং ক্রিশ্চিনাকে বলেন, জীবনটাকে সহজভাবে নিতে।

এই ঘটনার পর বেশিদিন কাটেনি। অচিরেই তাঁরা মিলিত হন কেনিয়াতে এবং একে অপরের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নেন। তাঁরা দুজনে প্রকৃতই সুখী ছিলেন। তখন দুজনেই একটি সন্তান কামনা করেন, কেননা তাঁদের জীবনে একটু স্থিরতা আসছিল।

১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে রাসেল ও ক্রিশ্চিনা বিয়ে করেন। এই বিয়ে ক্রিশ্চিনাকে অসহ্য নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দেয় এবং যে করুণ অতীতের প্রেতচ্ছায়া তাঁকে সব সময় তাড়া করে ফিরতো তাও অন্তর্হিত হয়। বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারীণী হিসেবে ক্রিশ্চিনার অনেকগুলো সমস্যা তো ছিলই। সুরক্ষা, ব্যবসায়িক ব্যস্ততা এসব। তা সত্ত্বেও একজন আদর্শ মা হিসেবে তাঁর মধ্যে কোনও ঘাটতি ছিল না।

সত্যি বলতে কি আগে ক্রিশ্চিনার কোনও পারিবারিক জীবন ছিল না, যদিও ছিল রানীর মত অর্থ। স্বামী, সন্তান নিয়ে নিজের জীবনকে সুখী গৃহকোণে সাজাবার স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখে। তাঁর সে স্বপ্নও সফল হয়েছিল রাসেলকে বিয়ে করার পর। কিন্তু এই পৃথিবী সেই সুখটুকু তাঁকে উপভোগ করতে দেয়নি, দেয়নি নিজের মত করে বেঁচে থাকতে। তাঁদের দুজনের মধ্যে অন্যের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের পারিবারিক জীবন টলমলিয়ে ওঠে।

ক্রিশ্চিনা আর এথিনা

এইভাবে পাঁচটি বছর ঘুরে যায়। সেইসময় রাসেল আবার গ্যাবির সঙ্গে মিলিত হন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে গ্যাবিকে এখনও ভালবাসেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রিশ্চিনা ও গ্যাবি দুজনকেই ভালবাসতেন। রাসেলের বক্তব্য, 'আমি বলতে লজ্জা পাই না যে, একই সাথে আমি দুটি মহিলাকেই ভালবাসতাম।' গ্যাবি যখন তাঁর ছেলে এরিকের জন্ম দিতে চলেছেন তখন রাসেল ক্রিশ্চিনার কাছে ডিভোর্স চাইলেন। কিন্তু ক্রিশ্চিনা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মানুষ তাঁদের বিবাহিত জীবনের সমস্যা সম্পর্কে নানান জল্পনা কল্পনা জুড়ে দিল। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনটা হয়ে উঠল জনগণের সম্পত্তি। রাসেল বলেছেন, 'লোকে তখন চাইছিল আমাদের আলাদা করে দিতে। এত বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের অধিকারীণীকে একা পেলে ব্যবসায়ীক লাভ অনেকেরই হত।' কিন্তু ক্রিশ্চিনা সবার বাড়াভাতে জল ঢেলে দিয়ে গ্যাবির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন। এই দুই মহিলা নিয়মিত একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন এবং চিঠিপত্র লিখতেন। এবং এই ঘটনায় ক্রিশ্চিনার অনেক বন্ধুবান্ধবই ঘাবড়ে গিয়েছিল এরপর।

এই সম্পর্ক ভাঙলো অবশেষে, যখন গ্যাবি রাসেলের দ্বিতীয় সন্তান স্যান্ড্রিনের জন্ম দিলেন। ক্রিশ্চিনা রাসেলকে ডিভোর্স দিলেন কিন্তু রাসেলের পদবী ছাড়লেন না। ডিভোর্স হল। তবু ক্রিশ্চিনা ও গ্যাবি অন্তত একসাথে তাঁদের ছেলে–মেয়েদের মানুষ করতে চাইলেন। এরপর তো ক্রিশ্চিনা মারাই গেলেন শিশু এথিনাকে বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিকারীণী রেখে।

এথিনা তার বাবা, সৎমা মা গ্যাবি, তার সৎভাই ও সৎবোনের সঙ্গে রয়েছে এখন। তার বাবা রাসেল চেষ্টা করছেন যাতে মেয়ের জীবন সুখী এবং নির্বিঘ্ন হয়। তিনি আশা করেন, ক্রিশ্চিনার মৃত্যুতে এথিনার জীবনে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তা পূরণ করে দিতে পারবেন। তিনি চান, যাদের হৃদয়ে এথিনার জন্যে সত্যিকার কোনও ভালবাসা নেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত না হয়ে এথিনা সুস্থ ভাবে জীবনযাপন করুক। তিনি বলেছেন, 'ক্রিশ্চিনা যা চাইত আমি সেভাবেই এথিনাকে মানুষ করতে চাইছি। আমি বিশ্বাস করি, ক্রিশ্চিনার মৃত্যু একটা স্বপ্ন, আমি এক্ষুনি ঘুম থেকে জেগে উঠবো।' ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর, কিন্তু কেউ কেউ বলছে, এথিনা যে পৃথিবীর একজন শীর্ষসারির ধনী সেটা কেউই এমনকি রাসেলও ভুলতে পারছেন না। এবং তাঁর এথিনাকে মানুষ করার পিছনের যাবতীয় সৎ–উদ্দেশ্য ওই ব্যাপারটার দিকে তাকিয়েই!

জে· মাইথিলি

১০ পৃষ্ঠার পর

শ্রদ্ধামাতার সাক্ষাৎকার

প্র: এম·ও· মাথাই তাঁর বইয়ে আপনার সম্পর্কে যে সমস্ত কথা লিখেছেন সে ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উ: কেউ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলে সাথে সাথে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নেয় বলে তার চরিত্র বড় জটিল হয়ে দাঁড়ায়। কিছু লোক তাঁকে পুজো করে তো কিছু লোক তাঁকে নিজের রাজনৈতিক শত্রু ভেবে নেয়। তারা সব সময় ভয় পায় এই বুঝি তাঁর প্রভাবে বর্তমান পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটে যায়। এই কারণেই গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়েছিল। হিংসার বলি হতে হয়েছিল তাঁকে। এরকম লোকদের মনে হয়, এ তো সমাজের বদল ঘটাতে যাচ্ছে। ঐ সময় দু'ধরনের লোক ছিল। একদল ছিল যারা শ্রদ্ধামাতার পিছনে দৌড়োতে শুরু করেছিল। আর একদল ছিল–যারা পয়সাওয়ালা লোক। যাদের ধারণা ছিল যে নেহেরুর উপর শ্রদ্ধামাতার এতো প্রভাব যে ইচ্ছা করলেই শ্রদ্ধামাতা একটা রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তারা আমায় ভয় করতো। তারাই আমার বদনাম করার চেষ্টা করেছে। তারা চাইত যে নেহেরু এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হোক। তাহলে তাঁদের আর আমাকে সমীহ করার দরকার পড়বে না। উদাহরণস্বরূপ বলি, যখন রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ এল তখন রোমান লিপি এবং হিন্দুস্থানী লিপির কথা উঠেছিল। কিন্তু, আমাদের মনে হয়েছিল যে দেবনাগরী লিপি এবং হিন্দি লিপির মধ্যে বিরাট সম্পর্ক ছাড়াও বেশির ভাগ আঞ্চলিক ভাষা এই লিপির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সে সময় আমি অবশ্যই নেহেরু এবং অন্যদের বুঝিয়েছিলাম যে, লোকের মত পরিবর্তিত হওয়া দরকার এবং হিন্দিকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। যদিও আমার নাম হিন্দিভাষা প্রচারের ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই। আমি সে চেষ্টা করিওনি। কেননা, সব সন্ন্যাসীর কাজ হয় নিঃস্বার্থ। সে যা করে কাউকে দেখানোর জন্যে করে না, নিজের কর্তব্য ভেবেই করে। যাই হোক আমার এই সফলতা কিছু লোকের চোখে জ্বালা ধরিয়েছে।

প্র: ভাষার ব্যাপারে আপনি কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন? মৌলানা আজাদ না নেহেরুর সাথে?

উ: না–না, এ ব্যাপারে আজাদের তো কোন ক্ষমতাই ছিল না। মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন নেহেরু। আমি আজাদের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম কিন্তু আমি পুরো জোর দিয়েছিলাম নেহেরুর উপরে, কেননা ৫০ শতাংশেরও বেশি সাংসদ হিন্দুস্থানীর পক্ষে ছিলেন। পুরুষোত্তম ট্যান্ডন, কে·এম· মুন্সী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রভৃতি একটা গ্রুপ ছিলেন–যাঁরা হিন্দি চাইতেন। আমি রাতারাতি বাংলা এবং দক্ষিণ ভারত থেকে আসা সাংসদদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। প্রথমে তাঁরা হিন্দির বিপক্ষেই অনড় ছিলেন। তাঁদের বোঝানোর পর তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমি চেয়েছিলাম দেশের নাম 'ভারত' বা আর্যাবর্ত' হোক। 'ভারত' নামটাই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। আমার এই প্রস্তাব দেখে কিছু লোক ভয় পেয়েছিল। তারা নেহেরু এবং আমার মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল। তারাই আমার এবং নেহেরুর নামে বদনাম করতে কিছু মুখরোচক গল্প বানিয়েছিল।

প্র: পণ্ডিত নেহেরুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উ: তিনি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজের চারপাশে কখনও অনেক জিনিস জমা করতেন না। তিনি যে সব জিনিস উপহার হিসেবে পেতেন সেসব পর্যন্ত নিজের জন্যে রাখতেন না, অন্য প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিরা যেমন রেখে থাকেন। তিনি হাসি ঠাট্টা পছন্দ করতেন খুবই। খুব খোলামেলা মনের মানুষ ছিলেন।

প্র: কিন্তু, তাঁর মেয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তো অন্যরকম ছিলেন?

উ: ছেড়ে দিন। এখন তিনি এ পৃথিবীতে নেই। আমি সেই সব আত্মার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে সব আত্মা এ সংসার ত্যাগ করেছে। কিন্তু, তাঁর জীবন অন্যরকম হওয়ার কারণটাই এলোমেলো। তিনি মন্দির এবং সাধুসন্তদের ভক্তি করতেন। তিনি মন্দিরে গেছেন, দেবতার পূজার্চনা করেছেন। কিন্তু, তাঁর জীবন তাঁর বাবার মত অত কান্তিময় ছিল না। নেহেরুর পরে রাজনৈতিক লোভ এবং ভ্রষ্টাচারে দেশটা ভরে গেছে। তবে শ্রীমতি গান্ধীর কিছু পদক্ষেপ সত্যিই প্রগতিশীল। তাঁর উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। ইচ্ছাশক্তি ছিল খুবই। তিনি সমাজকে সমাজবাদী না করতে চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, তা হতে পারে না।

প্র: তাহলে দেশকে আপনি কোন পথে চলতে বলেন?

উ: আমি ধর্মনিরপেক্ষতার একেবারে বিরুদ্ধে। কেবল ভারতের ক্ষেত্রে নয়, সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই। আমি কার্ল মার্কসের দর্শন জানি। ডায়ালেকিটক ফিলোসফি বলে যে, এটা কিছু নয়, কিন্তু আমি বলছি যে শুধু ভৌতিক পদার্থ থেকেই চেতনা আসে না। আমি জানি যে সব ক্রিয়াকলাপের পিছনে একটা মহান অদৃশ্য আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে।

প্র: আমরা কিভাবে সাম্য আনতে পারি?

উ: সমস্ত দেশের সরকার মিলে এক মহাসংঘ তৈরি করে। সব দেশ এবং সমাজের এই মহাসংঘ একটি সর্বসম্মত রায়ে চলবে। নেহেরুর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত সম্রাট অশোকের যুগ থেকে নেওয়া। এটাই হ'ল আসল জিনিস যা নেহেরু বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। এই রকম প্রত্যেক দর্শন বা সংস্কৃতিরই নিশ্চয় কিছু আছে যেটা অন্য কোন সংস্কৃতি বা ধর্ম নিতে পারে।

প্র: বিশ্বে কি এমন কিছু আছে যা মানবতাকে রক্ষা করতে পরে এবং এই বাস্তবিকতাকে রুখতে পারে?

উ: হ্যাঁ, সময়-সময় এরকম বহু সন্ন্যাসী এবং জ্ঞানী এসেছেন। তাঁরা স্থায়ী এবং সারগর্ভ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা যা বলেছেন তার মূল সত্যে নিহিত।

প্র: জে· কৃষ্ণমূর্তি এবং রজনীশ সম্পর্কে কি ভাবেন?

উ: জে· কৃষ্ণমূর্তি বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ছিলেন। আর রজনীশ খুবই বাজে লোক। তাঁকে সন্ন্যাসী বলে আমি মানি না।

প্র: দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন? দেশের পরিচালনায় রত রাজনীতিকরা এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মত কি?

উ: রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে খবরাখবর ঠিকমত রাখতে পারি না। আমার চোখে ছানি পড়েছে তাই খবরের কাগজ পড়তে পারি না। পূজা-পাঠে এত ব্যস্ত থাকি যে রেডিয়ো শোনার ফুরসৎও পাই না। কিন্তু আমি জানি তিনি একটা চক্রব্যূহে পড়ে আছেন। যতক্ষণ না তাঁর পাশে শক্তিশালী কেউ একজন আসেন ততক্ষণ তাঁর একার পক্ষে ঐ চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়!

গ্লুকন-ডি সুপারহিরো।

ক্লান্তিদায়ক গরম
হোক না যতই,
থাকে উচ্ছল ও
প্রাণবন্ত সদাই !

Glucon-D
200g

High-grade, finely powdered glucose enriched with vitamin D and calcium phosphates.

200 GRAMS NET

GLINDIA LIMITED
Dr. Annie Besant Road
Bombay 400 025, India.

Max. Price
Rs.
Local Taxes
Extra

● Owner of the Registered Trade Mark

আসল,
এই রঙচঙে
প্যাকটি
দেখে নিন।
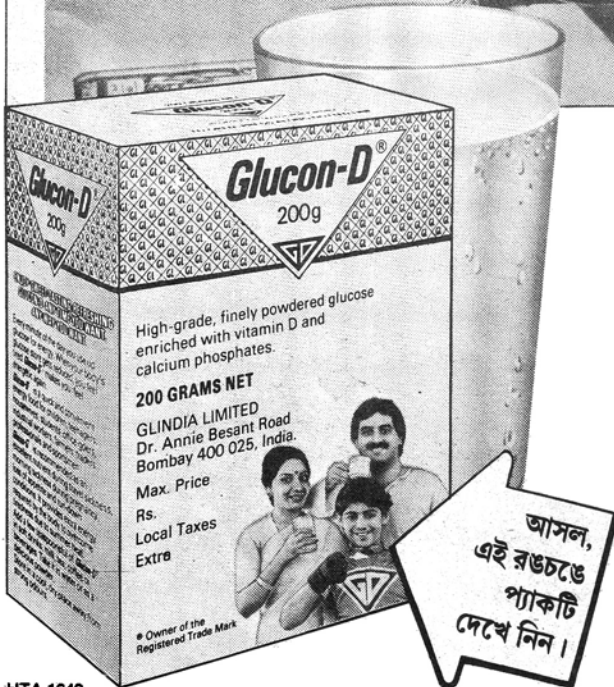
দুঃসহ গরম যতই হোক না কেন ক্লান্তিকর, গ্লুকন-ডি দিয়ে আপনার বাচ্চাকে রাখুন প্রাণচঞ্চল। এই নিমেষে শক্তি যোগানোর পানীয়তে আছে গ্লুকোজ, ভিটামিন-ডি এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট।

গ্লুকন-ডি, জ্যুস, দুধ, চা, কফি বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খান এবং পরিবারের সবাইকে দিন নিমেষে শক্তি যোগানোর এই সতেজ করা পানীয়। ১০০ গ্রাঃ, ২০০ গ্রাঃ ও ৫০০ গ্রামের প্যাকে পাবেন।

শক্তি যোগানোর পানীয়, সুপারহিরোর অতি প্রিয়

HTA 1649

ধর্ম, অধ্যাত্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি সব বিষয়েই তাঁর গভীর জ্ঞান। এই কারণেই শ্রদ্ধামাতার কাছাকাছি এলে সব মানুষই তাঁর চেহারার দীপ্তি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, গভীর জ্ঞান ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যান। তাঁর ব্যক্তিত্বের আর এক গোপন দিক–তন্ত্রবিদ্যা। বহু মানুষ তাঁর কাছে এ জন্যেই যান, কেননা তিনি তান্ত্রিকও বটেন। শ্রদ্ধামাতা জয়পুরে হথরোই কেল্লার যেখানে থাকেন সেখানকার পরিবেশই তাঁকে তন্ত্রময় করে রেখেছে। তিনি সেখানে একটা ভগবতী–মন্দির তৈরি করিয়েছেন। মন্দিরের সামনের দেয়ালে তন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু চিত্র আছে। কিছু দেবদেবীর মূর্তি এবং ছবি রেখেছেন, যাঁদের সামনে মালা, রুদ্রাক্ষ, গোলাকার পাথর ইত্যাদি রাখা আছে। শ্রদ্ধামাতা নিজে গেরুয়া কাপড় পরেন। নিজে লাল কাপড়ে ঢাকা সোফার উপরে বসেন এবং যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁদের বসার ব্যবস্থা ফরাসের ওপর পাতা সতরঞ্জির ওপর।

শ্রদ্ধামাতা কুকুর ভালবাসেন। তাঁর বাসভবন তথা আশ্রমে প্রচুর কুকুর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। কিছু দেশি কুকুর যেমন আছে তেমনি বিদেশী জাতের লম্বা-চওড়া তাগড়াই কুকুরও আছে। কুকুরদের তিনি 'ভৈরব সন্তান' বলে থাকেন।

শ্রদ্ধামাতার কাছে সব সময়ই চার–পাঁচ জন বসে থাকে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা। এদের মধ্যে আবার বিদেশিনী মহিলাদেরও সাক্ষাৎ মেলে। কিছু সম্ভ্রান্তঘরের মহিলাকেও যেমন নজরে পড়ে তেমনি আশপাশের কিছু বস্তির মহিলাও নজরে পড়ে–যারা সেবা করার উদ্দেশ্যে ওখানে আসে। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী বিদেশী ছাত্রদেরও প্রায়ই দেখা যায়। আশপাশের বস্তির মহিলা এবং বাচ্চারা ওখানে এসে শ্রদ্ধামাতার জন্যে খাবার তৈরি থেকে ফরাস ধোওয়া পর্যন্ত ছোট-বড় কাজই করে দেয়। বস্তির এক বয়স্কা মহিলা শান্তিদেবী যাদব বললেন যে, ঐ সব লোক মাতাজীর জমিতে বসবাস করে কিন্তু মাতাজী কখনও তাদের তুলে দেবার জন্যে জোর-জবরদস্তি করেননি। তবে হ্যাঁ, যদি কখনও কেউ মাতাজীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে তবে তিনি জায়গা খালি করে দেবার জন্যে ধমকে দেন মাত্র। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি কাউকেই তুলে দেননি। তাঁর কেল্লা এবং চারপাশের জমিতে প্রায় দেড়শো পরিবার কাঁচা-পাকা বাড়ি তুলেছে। কিছু লোকের সূত্রে জানা গেছে যে, প্রথমদিকে এই ঘরবাড়ি বানানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে পরিবারগুলিকে ওঠানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু, এখন আর সে চেষ্টা করেন না। বরং বস্তিবাসীদের জন্যে একটা ছোট ডাক্তারখানাও বানিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে বিড়লা এখন শ্রদ্ধামাতার নিবাস হথরোই কেল্লাতে একটি ভগবতী–মন্দির এবং হাসপাতাল তৈরি করতে চান। বিড়লার স্থানীয় প্রতিনিধি এ ব্যাপারে শ্রদ্ধামাতার সঙ্গে কয়েকবার দেখাও করেছেন।

বিশিষ্ট লোকের সমাগম

শ্রদ্ধামাতার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি বলেছেন যে কিছু গণ্যমান্য রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রদ্ধামাতার কাছে আকছার এসে থাকেন। বিপদে পড়ে মানেকা গান্ধীর মা শ্রীমতি আমতেশ্বর আনন্দও তাঁর কাছে কয়েকবার এসেছেন। রাজস্থানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী হরিদেব যোশী, ভূতপূর্ব উপ মুখ্যমন্ত্রী হরিভাও উপাধ্যায়, বর্তমান বিপক্ষ নেতা ভয়রো সিং শেখাওয়ত এবং কিছু ভূতপূর্ব মন্ত্রী, বিধায়ক, উচ্চপদস্থ অফিসার তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত করেন। জয়পুরের ভূতপূর্ব পুলিশ অধীক্ষক এবং এখন বিকানীর রেঞ্জের পুলিশ উপ–মহা নিরীক্ষক এন·এন· মীনার উপর শ্রদ্ধামাতা এখনও গভীর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন বলে শোনা যায়। যখন তিনি জয়পুরে ছিলেন তখন শ্রদ্ধামাতার কাছে তাঁর খুবই যাতায়াত ছিল। শ্রদ্ধামাতার যাতায়াতের জন্যে তিনি জিপের ব্যবস্থা করতেন।
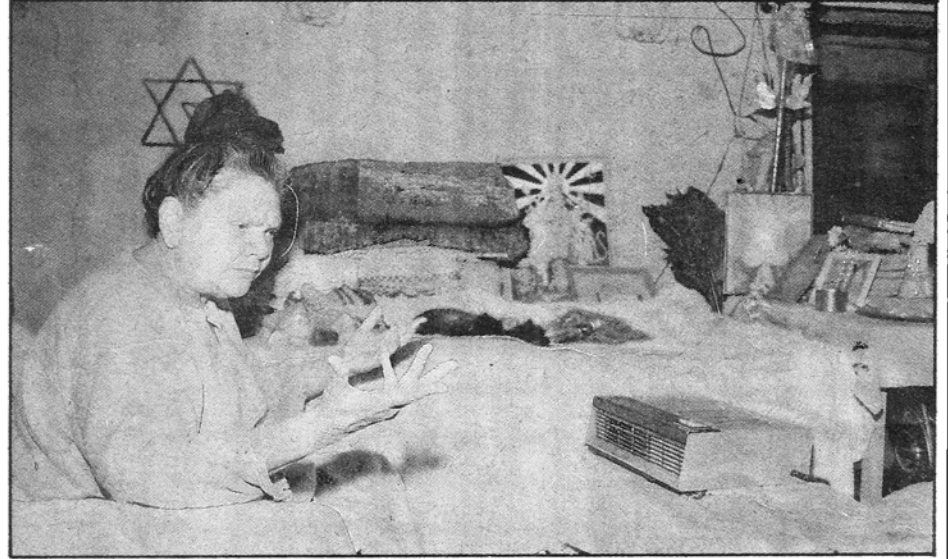
শ্রদ্ধামাতার এই একাকী জীবনের সঙ্গী হল্যাণ্ডের এক মহিলা বারবারা হটন, যিনি শ্রদ্ধামাতার সচিব থেকে সেবিকা–সমস্ত দায়িত্বই পালন করেন। গত প্রায় ১২ বছর বারবারা, শ্রদ্ধামাতার জুটি হয়েছেন। প্রথমদিকে তিনি কিছুকাল অন্তর অন্তর ভারতে এসে থাকতেন এবং দুএক সপ্তা শ্রদ্ধামাতার কাছেও থেকে যেতেন। এখন তো তিনি বলেন যে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়েছেন। গত ন'দশ মাস তিনি জয়পুরেই রয়েছেন।

তাঁর জয়পুরে আসা

১৯৫৬ সালে একটি যজ্ঞ করানোর জন্যে জয়পুরে শ্রদ্ধামাতাকে আহ্বান করা হয়। কয়েকদিন ধরে এই যজ্ঞ চলাকালীন প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। তাঁর যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপের কথা জয়পুরের তৎকালীন নরেশ সওয়াই মানসিংহের কানেও পৌঁছেছিল। মানসিংহ শ্রদ্ধামাতার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে বরাবরের জন্যে জয়পুরে থেকে যেতে অনুরোধ করেন। শ্রদ্ধামাতা রাজি হয়ে যান। তৎকালীন জয়পুর শহরের একেবারে বাইরে নির্জন জায়গায় অবস্থিত হথরোই কেল্লা পলাতক অপরাধীদের আবাসস্থল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, কেল্লার ভিতরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মনোহর। এই কারণেই শ্রদ্ধামাতা এই স্থানটিকে নিজের আশ্রমের জন্যে নির্বাচিত করেছিলেন। শোনা যায় যে, সওয়াই মানসিংহ তড়িঘড়ি ঐ কেল্লাটি শ্রদ্ধামাতাকে উপহার দিয়ে দেন।

নিজের আশ্রমকক্ষে

আজ শহর বাড়তে বাড়তে ঐ কেল্লাটিকে নিজের মধ্যস্থলে এনে ফেলেছে। ফলে, এই জায়গাটির ব্যবসায়িক মূল্যও বেড়ে যেতে চারপাশে উচ্চবিত্ত কলোনী গড়ে উঠেছে। এখানেই এখন জয়পুর শহরের শ্রেষ্ঠ বাড়িগুলি আপন গরিমায় মাথা তুলে রয়েছে। কেল্লার আশেপাশে শ্রদ্ধামাতার জমির উপর যে যেমন পেরেছে দখল নিয়েছে। আশেপাশে আজ দেড়শো পরিবারের বাস, যাদের অধিকাংশই শিখ বা মুসলমান। কেল্লাটি কিন্তু আজও পুরো শহরের থেকে আলাদা মনে হয়, যেখানে শ্রদ্ধামাতা ভগবতীর পূজায় নিজেকে নিবেদন করে দিন কাটাচ্ছেন।

ওম সৈনি, ভুবনেশ জৈন।

ছবি: প্রতাপ সিংহ

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

বিশ্বব্যাংকের ২২০ কোটি টাকায় রাজ্যে ১৩২ কে ভি লাইনে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ৪০০ কে ভি করার প্রোজেক্টকে কেন্দ্র করে ২০ কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই প্রোজেক্টের প্ল্যানার দিব্যেন্দু ঘোষের 'ভেল' কে দিয়ে কাজ করানোর সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালির সংস্থাদুটিকে দিয়ে প্রোজেক্ট রূপায়ণ করানোর পিছনে রাজ্যের কোন কোন চক্র কাজ করেছে?

শ্রী জ্যোতি বসু ১৯·৯·৮৮
বার অ্যাট ল
চীফ মিনিস্টার
গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
রাইটার্স বিল্ডিং
কলকাতা– ৭০০ ০০১.
ডিয়ার মিঃ বসু,

দ্য অ্যাটাচড্ পিটিশন অফ শ্রী দিব্যেন্দু ঘোষ উইল স্পিক ফর ইটসেলফ। ইট ইজ আ ম্যাটার অফ পিটি দ্যাট অ্যান ইঞ্জিনীয়ার অফ হিজ স্ট্যাচার ইভিন হ্যাজ বীন ডিপ্রাইভড ফ্রম লিগাল অ্যান্ড লেজিটিমেট ক্লেমস।

ইট উড নট বি আউট অফ পয়েন্ট টু মেনশান দ্যাট হি হ্যাজ নকড্ মেনি ডোরস, বাট........................

....

উইথ বেস্ট রিগার্ডস,

ইওরস্ সিনসিয়ারলি
সত্যরঞ্জন বাপুলি
(এম.এল.এ ডেপুটি লিডার অফ অপজিশন)
অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, আলিপুর,
সিনিয়ার কাউন্সিল গভঃ অফ ইণ্ডিয়া,
মেম্বার–এ আই সি সি
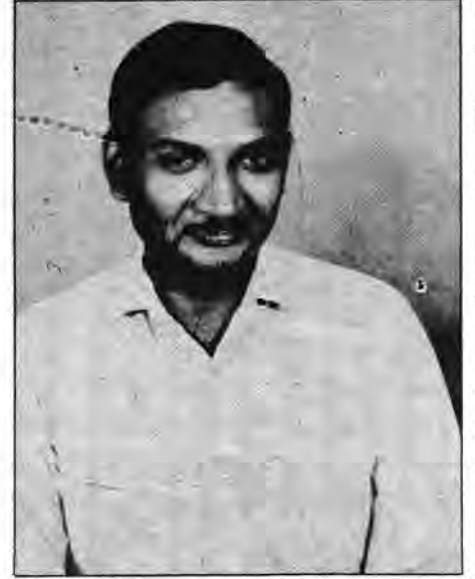
দিব্যেন্দু ঘোষ ছবি: আলেখ্যনীল গুপ্ত

কংগ্রেস এম এল এ সত্যরঞ্জন বাপুলির এই চিঠির সঙ্গে জ্যোতি বসুর কাছে পাঠান দিব্যেন্দু ঘোষের অভিযোগ-লিপি সাম্প্রতিক কালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অন্যতম চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির প্রমাণ। এ রাজ্যের বিদ্যুৎ বাহনদের খোঁচা দিলে বিশ্বের তাবৎ রহস্য কাহিনীও যে লজ্জা পাবে তা নিশ্চয়ই দিব্যেন্দুবাবুরও বিলক্ষণ জানা। বিদ্যুৎ পর্ষদের বিষধর আমলাতান্ত্রিক ছোবল খেয়ে এই তরুণ বাঙালি প্রযুক্তি বিজ্ঞানী এখন ধরাশায়ী। কে বলবে দিব্যেন্দু ঘোষের নামের পেছনে–ভারতে ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিনীয়ার্সের সভ্য, চাটার্ড ইঞ্জিনীয়ার (রেজি. নং এম ৩০১৭৫), মার্কিন মুলুকের ইন্সটিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ার্স–এর রেজিস্টার্ড মেম্বার (নং ৪১৫৩৩১৮ এম), ভারতে ইন্সটিটিউশন অফ ইনস্ট্রুমেন্টটেশন সায়েনটিসটিস্ অ্যাণ্ড টেকনোলজিস্ট–এর সদস্য (রেজি. নং এম ৫০১) পদের মত আন্তর্জাতিক মানের পেশাগত যোগ্যতা আছে। তবুও এখন তিনি পান বিড়ির দোকান করে কোনরকমে জীবন নির্বাহের কথা ভাবছেন! কারণ যোগ্যতার সুবাদে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মর্যাদা সম্পন্ন বিপুল বেতনের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। এমন কি বিদেশে বসবাসকারী স্ত্রীর অনুরোধেও বিদেশে থেকে যেতে চান নি। সেই দেশ সেবার আগ্রহে দিব্যেন্দুবাবু শেষ পর্যন্ত মার্কিন মুলুকের লোভনীয় চাকরি ও নাগরিকত্বে প্রলুব্ধ না হয়ে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে যোগ দেন, ডিজাইন সেলে প্ল্যানিং অ্যাণ্ড সিস্টেম ডিজাইন অফ অটোম্যাটিক প্রোটেকশন বিভাগে।

বছর দু'য়েক বাদেই এই পদ থেকে তিনি বদলি হন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিভাগে। সে সময় তাঁর বিভাগীয় ওপরওয়ালা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ দাশ, ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার। এই ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার রাজ্যের তাবৎ হাইডেল প্রোজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ প্রভৃতির নির্বাচন ও কেনার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮১–র ফেব্রুয়ারিতে দিব্যেন্দুবাবু হঠাৎই বদলি হন। নয়া মহাকরণের আটতলায় নিজের বসার ঘরটিও বদল হয়। আর এখানেই ঘটনার সূত্রপাত। দেশের স্বার্থে বিদ্যুৎ পর্ষদের কয়েকজন প্রভাবশালী ইঞ্জিনীয়ারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি এক রকম যুদ্ধে নামলেন।

১৯৮১র ফেব্রুয়ারি, তদানীন্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার রবীন গাঙ্গুলি দিব্যেন্দুবাবুকে বদলির আদেশ বলে নিয়ে এলেন নিজের অধীনে। নয়া মহাকরণের আটতলায় দিব্যেন্দুবাবুর আগের ঘরটিতে আটকে রইল তাঁর প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নথিপত্র, চিকিৎসার প্রেসক্রিপশনও। লিখিত আবেদন করেও যা তিনি আজও ফেরৎ পান নি।

সে সময় বিশ্বব্যাংকের টাকায় রাজ্যে ১৩২ কে ভি লাইনে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ৪০০ কে ভি প্রোজেক্ট হওয়ার তোড়জোড়। কেন্দ্রিয় সরকারের মাধ্যমে ২২০ কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দ পেয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একদল ইঞ্জিনীয়ারের ওপর প্রজেক্টের দায়িত্ব দিলেন রাজ্য সরকার। এখানেই বিদ্যুৎ পর্ষদের হোমড়া চোমড়া ইঞ্জিনীয়ারদের কেরামতি বোঝা গেল। তাঁদের অকর্মণ্যতায় বরাদ্দ টাকা ফেরৎ যাবার উপক্রম। বলাবাহুল্য তাঁরা যত বড়াই করুন না কেন এ ধরনের প্রজেক্টের নকশা তৈরি করার মত সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তাঁদের নিশ্চয়ই ছিল না। আর এ ধরনের

নকশা তৈরি করতে গেলে সেই অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রযোজ্য। তাই তাঁরা নকশা তৈরি করার জন্য দায়িত্ব দিলেন দিব্যেন্দুবাবুকে। বলাবাহুল্য তাঁদের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কে করিৎকর্মা দিব্যেন্দু ঘোষের হাতযশ বিলক্ষণ জানা ছিল। আর দিব্যেন্দুবাবুও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এমন এক ইঞ্জিনীয়ার যাঁর ঘাড়ে বন্দুক রেখে সহজেই কাজ হাসিল করা যায়।

বছর সাত আটেক আগেও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতায় জ্যোতিবাবুর কংগ্রেসের সমালোচনা রাজ্যের অন্যতম রসিকতা ছিল। জ্যোতিবাবুরও দোষ কি, ওইসব ইঞ্জিনীয়াররাই তখনকার বিদ্যুৎ মন্ত্রী জ্যোতি বসুকে বোঝাতেন, 'স্যার কংগ্রেস সব ধ্বংস করে গেছে!' চতুর ইঞ্জিনীয়াররাও নিজেদের কেরিয়ার গড়ে নেন। যোগ্যতার কোন বালাই নেই। কাজের কোন হিসেব নেই। শুধু একের পর এক প্রমোশন পোস্ট, প্রমোশনের স্কিম, বেতন বৃদ্ধি পারকুইজিটস কিই না করিয়েছেন!

গত ১২ বছর ধরে বিদ্যুৎ পর্ষদ জেনারেশন বিভাগের দাবীদাওয়া মেটাতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের প্রায় দেউলিয়া অবস্থা। ট্রান্সমিশানেও কাঁচা টাকা লেনদেন। লোকও কম। শ' শ' কোটি টাকার টেণ্ডার তাঁদের হাতে। আর এরই প্রতিবাদ করতে গিয়ে দিব্যেন্দুবাবু চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন। এই সবের জন্যই বেগতিক দেখে জ্যোতিবাবু বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পদ প্রবীর সেনগুপ্তর হাতে ছেড়ে যেন হাঁফ ছেড়েই বাঁচলেন!

কারণ ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে ততদিনে সমান তালে এগিয়ে এসেছেন বামফ্রন্টের কমরেডরাও। ট্রান্সমিশনের ইঞ্জিনীয়াররা যেখানে টেণ্ডার নামে লক্ষ্মীকে নিজেদের ভল্টে বন্দী করে রেখেছেন, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের কমরেডরাও ততদিনে ছোটখাটো লাইন ফল্ট সারাতে সারাতে এক একজন ইঞ্জিনীয়ার হয়ে গেছেন। মিটারের নাড়ি নক্ষত্র নেড়ে ডাইরেক্ট করতে তাঁরা বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন। ধান কল, গম কল, তেল কল, স্যালো সবই চলছে লাইন ডাইরেক্ট করে।

উদাহরণ স্বরূপ হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের ঘটনা বলা যায়। ওখানকার গ্রুপ সাপ্লাই–এ বিদ্যুৎ অ্যাডভাইসারি কমিটির চেয়ারম্যান ননী চৌধুরী। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান। আর তাঁরই ভাই স্বপন চৌধুরী গ্রাহক সমিতির কর্তা হয়েও বিদ্যুৎ চুরি নিয়ে অভিযুক্ত। অভিযোগ, এলাকার বিদ্যুৎ চোরেরা তাঁরই প্রশ্রয়ে নির্দ্বিধায় বিদ্যুৎ চুরি চালিয়ে যাচ্ছেন! উদয়নারায়ণপুর এস এস অফিসের মেমো নং ইউ এস পি আর/জি/১২, তারিখ ২৭.৪.৮৫ কিংবা উদয়নারায়ণপুর থানার জি ডি নং ৬৯৮, তারিখ ১৫.৫.৮৫ তারই প্রমাণ। অথচ এস এস ডায়েরি করে আর চিঠি লিখেই হয়রান। ইঞ্জিনীয়ারও অর্ডার দিয়েই এলাকা ছেড়েছেন। পুলিশই বা কি করবে! পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের ভাই! বলাবাহুল্য বিদ্যুৎ পর্ষদের

কিছুতেই টলানো গেল না দেখে দিব্যেন্দুবাবুর নাকতলার বাড়িতে নিয়মিত বোমা পড়তে থাকল। জলের লাইন, বিদ্যুতের লাইন কাটা হলো। বাড়ির নিচের তলা জবর দখল করে স্থানীয় সি পি এম–পার্টি অফিস হল।

Satya Ranjan Bapuli
M. L. A.
Deputy Leader of opposition
Advocate, Judge's Court, Alipore
Senior Counsel Govt. of India
Member—A. I. C. C.

Residence :
SASINIKETAN

19th September 1988

To
Shri Jyoti Basu,
Bar-at-Law,
Chief Minister,
Government of West Bengal,
Writer's Buildings,
Calcutta - 700 001.

Dear Mr. Basu,

The attached petition of Shri Dibyendu Ghosh will speak for itself. It is a matter of pity that an engineer of his stature even has been deprived from his legal and legitimate claims.

It would not be out of point to mention that he has knocked many doors; but none opened for even sympathetical consideration of his grievances.

I Hope and trust that only you can do proper Justice; and the problem can be solved from your end.

A line in this regard will be highly appreciated.

With best regards

Yours sincerely,

(Satya Ranjan Bapuli)

Read a copy with its enclosure
21.9.88
(A. BASU)
Section Officer,
Chief Minister's Sectt.,
Govt. of West Bengal

... expired on 3rd. April, 1987, under the most tragic circumstances -- directly due to total deprivation from and lack of very essential and vital medical care and treatment. The physicians and specialist doctors repeatedly point out to me the fact that my father's life could have been

আগাপাস্তলা যখন দুর্নীতির বেড়াজালে সেখানে দিব্যেন্দু ঘোষ একাই বা কি করবেন?

তাই ১৩২ কে ভি বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ৪০০ কে ভি প্রজেক্টে নকশা তৈরির কাজ করতে গিয়ে দিব্যেন্দুবাবু নিজের সততা আর দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা ভেবে বিদ্যুৎ পর্ষদের এক দুর্নীতি চক্রের রোশে পড়লেন। প্রথমত উচ্চ চাপ বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন লাইন ও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই প্রজেক্টের প্রধান দুটি দিক। মাস দেড়েক অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিব্যেন্দুবাবু প্ল্যানিং ও ডিজাইনের কাজ শেষ করলেন। এই নকশা অনুযায়ী প্রজেক্টটি 'ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস'–এর যন্ত্রপাতি দিয়ে করানো যায়। দিব্যেন্দুবাবু দেশজ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রজেক্টির অর্থগত লাভ ও প্রযুক্তিগত উন্নতি এ দুটি দিক মাথায় রেখেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সেই নকশা পছন্দ নয়। তাঁরা বোধহয় চান তিনি এমন প্ল্যান করুন যাতে বিদেশি সংস্থাদের টেণ্ডার দেওয়া যায়। ইতালীয়ান ফার্ম এস.এ.ই. ও সুইস ফার্ম ব্রাউন অ্যাণ্ড বোভেরির যন্ত্রাংশ যাতে ব্যবহার করা যায় সে ধরনের নকশা চাই। দিব্যেন্দুবাবু জানতেন না বিদেশি মুদ্রায় লেনদেন হলে সুইস ব্যাংকে ব্যালেন্স বাড়ে! তাই তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিতর্কে নামলেন। নকশার রদবদল ঘটাতে চাইলেন না। কেননা তাঁর মতে, দেশিয় মুদ্রায় পাওয়া যাবে ভেল–এর যন্ত্রাংশ, সহজে রিপ্লেস করানোও যাবে। এর পরই শুরু হলো নানা উপায়ে আক্রমণের পালা। চলল চরিত্রহননের কৌশল, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু নিজের কাজের সম্পর্কে এরপরও পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। কিছুতেই টলানো গেল না দেখে দিব্যেন্দুবাবুর নাকতলার বাড়িতে নিয়মিত বোমা পড়তে থাকল। জলের লাইন, বিদ্যুতের লাইন কাটা হলো। বাড়ির নিচের তলা জবর দখল করে স্থানীয় সি পি এম– পার্টি অফিস হল।

এতেই কিন্তু অত্যাচার থেমে থাকল না। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে তখন দিব্যেন্দু ঘোষকে কেন্দ্র করে রীতিমত হইচই। সব রকম প্রশাসনিক রীতিনীতি কঠোর ভাবে দিব্যেন্দুবাবুর ওপর বর্তালো। এমন কি কোন রকম সেমিনারেও যোগ দেওয়া বন্ধ। সে সময় কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্ট্রুমেনটেশনের ওপরে পেপার সাবমিট করতেও দেওয়া হলো না তাঁকে। আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েও কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুতেই অনুমতি পেলেন না তিনি।

নানান ভাবে দিব্যেন্দুবাবুর ওপর অত্যাচার ক্রমাগত বেড়েই চলল। এই অত্যাচারের ফলে

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিস

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

তিনি যাতে নিরুপায় হয়ে আবার বিদেশে চলে যান চক্রান্তকারীরা সেই চেষ্টাই চালাচ্ছিল। তা হলেই তাঁদের দুর্নীতির আর কোন প্রমাণ থাকবে না। এদিকে দিন দিন স্নায়বিক অত্যাচারে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২১ জুলাই '৮১ ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার ডি কে. নাথ–এর কাছে প্রতিকার চেয়ে চিঠি লিখলেন। তাতেও কোন ফল হলো না। বরং বাড়তে থাকল। চিকিৎসার জন্য ভর্তি হলেন এস এস কে এম হসপিটালে। ২৯ জুলাই ১৯৮১। আসন্ন পূজা-বকাশের সময় দু'দিনের জন্য বিদ্যেন্দুবাবুকে ছুটি দেওয়া হল। ৩ অক্টোবর '৮১ যথারীতি অফিসে যোগ দিলেন। আর সেই দিনই জানতে পারলেন ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার সুন্দর নারায়ণ ব্যানার্জির নির্দেশে জুলাই মাস থেকে তাঁর মাইনে বন্ধ, সেই সঙ্গে বোনাস ও অন্যান্য প্রাপ্যও। দিব্যেন্দুবাবু সরাসরি শ্রী ব্যানার্জিকে এই অন্যায় ভাবে মাইনে বন্ধ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কোন কারণ না দেখিয়েই অভদ্র আচরণ করলেন তাঁর প্রতি। পি এ –টু চীফ ইঞ্জিনীয়ার এ ব্যানার্জিও একই ধরনের ব্যবহার করলেন।

১৪ অক্টোবর '৮১ পুজোর ছুটির পর বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিস খুলল। তিন মাসের বেতন ছাড়াই পুজোর ছুটি কাটিয়ে দিব্যেন্দুবাবুও দফতরে এলেন। ১৯ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত বহুবার আবেদন করেও বকেয়া টাকার কোনও কিনারা করতে পারলেন না তিনি। তাই পুণরায় চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে চিঠি লিখলেন। কিন্তু তিনিও নির্বাক। অবশ্য তখনও দিব্যেন্দুবাবু বুঝতে পারেন নি এসব অত্যাচার আসলে বিদেশি কোম্পানির যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আনার সুপারিশ না করার জন্যই। তিনি বুঝতে পারেন নি প্ল্যান করার সময়ে উপরওয়ালার মর্জি মাফিক কাজ না করে তাঁদের সকলকে তিনি খেপিয়ে দিয়েছেন। এমন কি দিব্যেন্দুবাবুকে শায়েস্তা করার জন্য খাতাপত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধনও করে ফেলার তোড়জোড়ও নাকি চলেছে। দিব্যেন্দুবাবু তখন বিদ্যুৎ পর্ষদের তদানীন্তন চেয়ারম্যান এন সি বসুকে দুটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার তদন্তের অনুরোধ করলেন। যাতে তিনি প্রমাণ করতে পারেন এতসবের আসল রহস্য কি। কিন্তু ফল হল বিপরীত। হঠাৎই তাঁর বদলির আদেশ জারী হল কোচবিহারের দিনহাটায়। সে সময় তিনি গুরুতর অসুস্থতায় চিকিৎসাধীন। কলকাতার বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে খুবই বিপদসংকুল। দুই প্রেসিডেন্সী সার্জেন–ডঃ দিলীপ কুমার রায় এবং ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক রিপোর্ট সহ শারীরিক কারণে বদলির আদেশের সংশোধন চাইলেন দিব্যেন্দুবাবু। ৩ ফেব্রুয়ারি এই ঘটনার পর তিনি আরও শারীরিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি '৮২ তিনি আবার চিকিৎসাধীন হলেন। ৩০ এপ্রিল ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে দফতরে জয়েন করতে এলে দিব্যেন্দুবাবুকে আবার সকলে ঘিরে ধরলেন। বললেন, 'বাড়ি চলে যান–অফিস থেকে জলদি একটা চিঠি পাবেন।' যার মুখ্য ভূমিকায় অবশ্যই ওই পি এ–টু ইঞ্জিনীয়ার।

বহু লাঞ্ছনা সহ্য করে কম্পিউটর আর অটোম্যাটিক প্রোটেকশন বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার দিব্যেন্দু ঘোষ নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরলেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া এই টেকনোক্র্যাটের অপরাধ হলো তিনি দেশের সেবা করতে গিয়েছিলেন মাত্র! এদিকে ৯ ফেব্রুয়ারিতেই তাঁকে দীনহাটায় যাবার জন্য রিলিজ করা হয়ে গেছে। বদলির অর্ডার পেয়ে তিনি আবার প্রতিবাদ পত্র দিলেন ১৩ মে। কোন পাল্টা জবাব না পেয়ে তদানীন্তন চেয়ারম্যান এন সি বসুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। শেষ পর্যন্ত ৩০ মে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা হলো। কথা হলো দীর্ঘ সময়। সব শুনে চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ট্রান্সফার অর্ডার বিকল করে সংশোধন করা হবে। দিন তিনেকের মধ্যেই চিঠি ইস্যু করা হবে।

কিন্তু তা আজও হল না। দেওয়া হল না বকেয়া মাইনে। অফিসেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ২৬ জুলাই ১৯৮২ দিব্যেন্দু ঘোষ লিখিত ভাবে বিষয়টি ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও জানান। রাজ্য সরকারের চীফ সেক্রেটারি রথীন সেনগুপ্তকেও তিনি ১২ অক্টোবর '৮৮ ঘটনার পুরো বিবরণ দিয়ে দীর্ঘ চিঠি দেন। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পাণ্ডের নজরেও বিষয়টি আনেন। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে সব কেমন ধামাচাপা পড়ে যায়। আর প্রতিকারের আশায় আজকের হা–হন্যে দিব্যেন্দু ঘোষ দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এরই মধ্যে ছেলের ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে মানসিক দুশ্চিন্তায় হঠাৎই মারা গেলেন দিব্যেন্দুবাবুর বাবা।

ডক্টর প্রফেসর নৃপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ৩০ জুন '৮৮তে এক জরুরী টেলেক্সে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে দিব্যেন্দু ঘোষ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে অবিলম্বে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন (টেলেক্স নং ০২১৩১৯০) যাতে মানসিক চাপ থেকে দিব্যেন্দুবাবুকে উদ্ধার করা যায়। কারণ মানসিক চাপের ফলে দিব্যেন্দুবাবুর ভয়াবহ শারীরিক অবনতি চলছিল। নৃপেন্দ্রবাবু জানান, এই মানসিক চাপ থেকে অব্যহতি না পেলে দিব্যেন্দুবাবুকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব নয়। এই প্রেসিডেন্সি সার্জেনের টেলেক্সের কোন উত্তর দেন নি জ্যোতিবাবু।

অভিযোগ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সব কিছু না শোনার ভান করে এড়িয়ে গেছেন এবং এর সঙ্গে অবশ্যই বিদ্যুৎ মন্ত্রীও জড়িত। অভিযোগ যদি মিথ্যেই হতো তবে কর্তৃপক্ষ কেন আইনগত পদক্ষেপ নেন নি? কেন কোনরকম শো–কজ লেটার দেন নি? রাষ্ট্রপতি থেকে রাজ্যপাল সব জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছেন প্রতিকারের প্রার্থনায় মহাকরণের দফতরে দফতরে ঘুরেছেন তারপরও বিদ্যুৎ পর্ষদ চুপ থাকেন কি করে? অভিযোগ যদি মিথ্যেই হয় তবে এ সবের জন্যেই তাঁকে সাসপেন্ড করতে পারতেন কর্তৃপক্ষ।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারস্ অ্যাসোসিয়েশনের যোগাসাজোস আর এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। অভিযোগ অ্যাসোসিয়েশনের তদানীন্তন

অ ন্ত র্ত দ ন্ত

সেক্রেটারি শ্যাম কৃষ্ণ রায় তাঁকে সামনাসামনি বলেছিলেন ওদের কথা মেনে নিতে। মেনে নিলে আর কিছু না হোক লাখ বিশেক টাকা পাওয়া যেত। চীফ ইঞ্জিনীয়ার সুন্দর নারায়ণ ব্যানার্জিও কথায় কথায় এই পরিমাণ অফার দিয়েছিলেন। তাঁদের কথামত নকশা তৈরি করলে বিদেশি সংস্থাকে ওই প্রজেক্টের টেণ্ডার পাইয়ে দিয়ে টেন পারসেন্ট কমিশন পাওয়ার আর কোন ঝামেলাই থাকত না। পরে তাই নকশার রদবদল ঘটিয়ে বিদেশি সংস্থাকেই টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে। অবশ্য খুব সামান্য টাকার যন্ত্রাংশ নেওয়া হয়েছে ভারতের হেভি ইলেকট্রনিক্স থেকে।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান এন সি বসু এখন অবশ্য সাংবাদিক দেখলে একশ গজ দূরে থাকেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চান নি। প্রতিবাদও করেননি। প্রশ্নগুলি ছিল, আন্তর্জাতিক মানের পেশাগত যোগ্যতা এবং কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও দিব্যেন্দু ঘোষকে কেন কোন কারণ ছাড়াই চাকরিতে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি? কেন অন্যায় ভাবে তাঁর এক বছরের মাইনে আটকে দেওয়া হয়? বিশ্বব্যাংকের ২২০ কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দে ১৩২ কে ভি লাইনের বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ৪০০ কে ভি প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকা কমিশনের যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত? নিজের কর্তব্যের প্রতি সততা এবং দেশের স্বার্থ মাথায় রেখে দিব্যেন্দুবাবু এই প্রজেক্টের যে নকশা তৈরি করেছিলেন তার পরিবর্তন করে বিদেশি সংস্থাকে টেণ্ডার পাইয়ে দেবার লিপ্সায় যে ক'জন ইঞ্জিনীয়ার চক্রান্ত চালিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কি অস্বীকার করছেন? চেয়ারম্যান হিসেবে নকশার পরিবর্তন সম্পর্কে আপনি কি কিছুই জানেন না? ২৩ জুলাই '৮২ তে দিব্যেন্দুবাবু প্রত্যক্ষভাবে কয়েকজন হাই র‍্যাংকিং অফিসার দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে যুক্ত বলে আপনাকে চিঠিতে জানান, তারপরও আপনি কেন কোনরকম স্টেপ নেন নি? এস.এ. ই ও ব্রাউন বোভেরিকে টেণ্ডার দেওয়ার পেছনে আসল রহস্য কি? আপনার মাধ্যমে দিব্যেন্দুবাবু ৯ অক্টোবর '৮২ তে রাজ্যপালের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা কি যথাস্থানে পৌঁছেছিল? রাজ্যপালের কাছে তাঁর অভিযোগ যদি মিথ্যা হয় তবে কেন আপনি দিব্যেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে কোন রকম স্টেপ নেন নি?—এর কোনটিরই উত্তর পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের তদানীন্তন চেয়ারম্যান এন সি বসু চীফ ইঞ্জিনীয়ার সুন্দরনারায়ণ ব্যানার্জি, রবীন গাঙ্গুলি, এ ব্যানার্জি, ডি কে নাথ প্রমুখ কয়েকজন প্রভাবশালী ইঞ্জিনীয়ারই এই দুর্নীতি চক্রের হতাকর্তা। অভিযোগ, এদের মদত দিয়েছেন অশোক বসু ও শঙ্কর গুপ্ত! এই কমিশনের পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকার মত। যার কিছু অংশ সি পিএম-এর পার্টি তহবিলেও নাকি জমা পড়েছে। আর সে জন্যই জ্যোতিবাবুও নাকি এ ব্যাপারে নীরব।
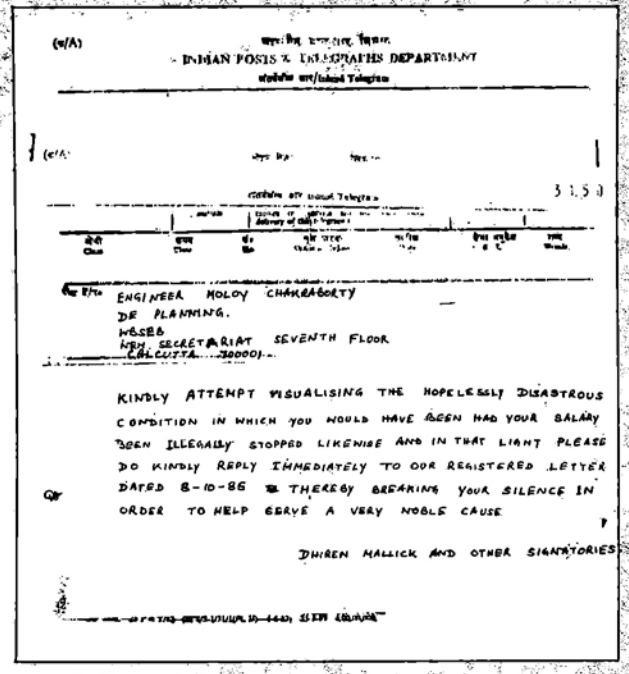
মাণিক ঘোষও দিব্যেন্দুবাবুকে উন্মাদ বলে ঠাট্টা করতে দ্বিধা করেন না। অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার নির্মলেন্দু দে, অমিয়ময় ব্যানার্জি প্রমুখ অন্যান্য মেম্বাররাও একই সুরে কথা বললেন।

(ক/A) INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT
Inland Telegram

3150

ENGINEER MOLOY CHAKRABORTY
DE PLANNING.
WBSEB
NEW SECRETARIAT SEVENTH FLOOR
CALCUTTA 700001.

KINDLY ATTEMPT VISUALISING THE HOPELESSLY DISASTROUS CONDITION IN WHICH YOU WOULD HAVE BEEN HAD YOUR SALARY BEEN ILLEGALLY STOPPED LIKEWISE AND IN THAT LIGHT PLEASE DO KINDLY REPLY IMMEDIATELY TO OUR REGISTERED LETTER DATED 8-10-86 THEREBY BREAKING YOUR SILENCE IN ORDER TO HELP SERVE A VERY NOBLE CAUSE

DHIREN MALLICK AND OTHER SIGNATORIES

৪ অক্টোবর '৮৫, দিব্যেন্দু ঘোষের প্রতি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইঞ্জিনীয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের অদ্ভুত নীরবতার সমালোচনা করে সেক্রেটারি মলয় কুমার চক্রবর্তীর কাছে ধীরেন্দ্র নাথ মল্লিক সমেত ১০০ জন ইঞ্জিনীয়ার একটি অভিযোগ পত্র দেন। চিঠিতে বলা হয়, কোনরকম কারণ না দেখিয়েই অন্যায় ভাবে দিব্যেন্দু ঘোষের মাইনে, বোনাস প্রভৃতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আটকে রেখেছে, ইঞ্জিনীয়ারস্ অ্যাসোসিয়েশন যেন তাঁর প্রাপ্য টাকা পাওয়ার জন্য সহযোগিতা করে। কারণ দিব্যেন্দু ঘোষ মানসিক চাপের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং শীঘ্র মীমাংসার মাধ্যমে তাঁকে যেন এই প্রচণ্ড মানসিক চাপ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ইঞ্জিনীয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এর পরও বিন্দুমাত্র সহযোগিতা পান নি দিব্যেন্দুবাবু। বরং যখনই এঁদের মুখোমুখি হয়েছেন তখনই কোনও না কোনও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সেক্রেটারি মাণিক ঘোষও দিব্যেন্দুবাবুকে উন্মাদ বলে ঠাট্টা করতে দ্বিধা করেন না। অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার নির্মলেন্দু দে, অমিয়ময় ব্যানার্জি প্রমুখ অন্যান্য মেম্বাররাও একই সুরে কথা বললেন। তবে তাঁরা সকলেই যে দিব্যেন্দুবাবুর ব্যাপারে কোনরকম উৎসাহী নন বরং তাঁর প্রসঙ্গটি এড়িয়ে থাকতে চান তা পরিষ্কার। অবশ্য ইঞ্জিনীয়ারদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানোর সাধুবাদ পাওয়ার দাবি করে এই ইঞ্জিনীয়ারস অ্যাসোসিয়েশন! এ ব্যাপারে ডি কে নাথও অদ্ভুত উদাসীন। বলছিলেন, 'আমি দিব্যেন্দর উপকার করতে গিয়েই তার টার্গেট হয়ে গেছি। আসলে সে মানসিক রোগী।'

দিব্যেন্দুবাবু বলছিলেন, 'এই কেসটি তদন্তের জন্য রাম জেঠমালানী বিশেষ ভাবে আগ্রহী।' এমন কি রাণী জেঠমালানী বারকেয়েক দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এগিয়ে এসেছেন কৃষ্ণা আয়ার। রাজ্য কংগ্রেসের পরিষদীয় দল নেতা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এই দুর্নীতির হেস্তনেস্ত করার কাজে নেমে পড়েছেন। তাই আগামী নির্বাচনে বিদ্যুৎ পর্ষদের এই দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ যে রাজনৈতিক ইস্যু হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষায় থাকে না।

প্রশ্ন হচ্ছে সব কিছু জেনেও জ্যোতিবাবু এমন নীরব কেন? কংগ্রেস মহলে আশু নির্বাচনী প্রচারে বেঙ্গল ল্যাম্প ও ট্রাম কেলেংকারির সঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের দুর্নীতি কতটা বিতর্কের দিকে গড়ায় তাই এখন দেখবার বিষয়। এ বিষয়ে জ্যোতিবাবু কতটা স্বীকার করবেন জানা নেই, তবে প্রমাণ করার মত যথেষ্ট তথ্য নিয়েই বলছি-রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এখন দুর্নীতির অন্যতম আড়ত। যে কারণেই বামফ্রন্ট সরকারের বারো বছর রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যর্থতার বিশ্বরেকর্ড গড়েছে!

তাপস মহাপাত্র

চমৎকার সবজি তো!

কিন্তু এর আসল স্বাদ পেতে হলে চাই
খাঁটি সরষের তেল **আরতি**

আজ রাঁধুন নবরত্ন পাতুরী

টাটকা সবজি ঘরে যখন এলোই, আর আরতি সরষের তেলও আছে, আসুন রাঁধা যাক নবরত্ন পাতুরী। আপনার লাগবে ঃ ২৫০ গ্রাম হলদে মিষ্টি কুমড়ো, ৬টি পটল, ৬টি ঝিঙ্গা, ৪টি সরু লম্বা বেগুন, দুটি মাঝারি মিষ্টি আলু, কাটোয়ার ডাঁটা, ১টি চিচিঙ্গা, ১/২ খানা নারকেল, কাঁচা লঙ্কা, ১০০ গ্রাম সরষে বাটা, হলুদ বাটা, ৬টি শুকনো লঙ্কা বাটা, চালবাটা অথবা ২ বড় চামচ ময়দা, নুন, সামান্য চিনি, ৪ খানা কলাপাতা ও ২০০ গ্রাম আরতি তেল।

প্রণালী ঃ তরকারি ২ ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি চওড়া করে কাটতে হবে। ডাঁটার ওপরের খোসা ছাড়িয়ে ঐ মাপে দুখণ্ড করে কাটতে হবে। তরকারি ধুয়ে ভাল করে জল ঝরিয়ে বড় পাত্রে নুন, মিষ্টি, হলুদ বাটা, লঙ্কা বাটা, সরষে ও নারকেল বাটা, পিটুলি অথবা ময়দা দিয়ে ভাল করে মাখুন। কাঁচালঙ্কা চিরে সাজিয়ে দিন। রুটি করার চাটুতে কলাপাতা ঐ মাপে কেটে নিয়ে তার ওপর তেল মাখিয়ে তরকারিগুলি রাখুন। এবার ওপরে একটি কলাপাতা ঢাকা দিন। চাটু গরম হয়ে একদিক সেঁকা হয়ে গেলে যখন পোড়া সুগন্ধ বেরোবে এবং তেল বেরিয়ে ভাজা ভাজা হবে তখন চাটুর মাপের একটি এ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনা দিয়ে চাটুটা উল্টে অপর দিকটাও উনুনে বসান। দুদিক সমানভাবে রান্না হয়ে গেলে কলাপাতাশুদ্ধ নামিয়ে নিন। এবার পরিষ্কার একটি কলাপাতার উপরে নারকেলকোরা সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
গরম ভাতের পাতে দারুণ খেতে!

গলানো সোনার মতই খাঁটি সরষের তেল আরতি। তাই এর বোতলে আছে ভেজাল প্রতিরোধে বিশেষ সীল। এত বিশুদ্ধ বলেই এই তেলে রান্নার এত স্বাদ।

ARATI
PURE MUSTARD OIL

গুজরাট কো-অপারেটিভ অয়েলসীড্স গ্রোয়ারস্
ফেডারেশন লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট অবদান।

TSAC-GROF-4 BEN

কলকাতার জ্যোতিষচক্র

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নস্ত্রাদামু, প্রভু জগৎবন্ধু ও আনন্দমূর্তিজীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ার ইঙ্গিত পাচ্ছে?

জ্যোতি বসু-র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষীদের বক্তব্য কি?

বাঙলার বিত্তবান পরিবারে রমরম করে বেড়ে চলা জ্যোতিষচর্চা কলকাতাকে হেডকোয়ার্টার করে ব্যক্তিগত ক্রান্তদর্শনের সঙ্গে দেশ ও দশের ভবিষ্যৎ দর্শনের দাবি করছে। কলকাতার প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিষবিদরা দাবি করেছেন তাঁরা ফরাসী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নস্ত্রাদামু, কৃষ্ণসাধক প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর এবং বিশ্বে নয়া আধ্যাত্মিক আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রী আনন্দমূর্তিজীর দেশ ও দশ সম্পর্কে কৃত ভবিষ্যৎবাণীগুলি সফল হওয়ার ইঙ্গিত পাচ্ছেন। ব্যক্তিফল বলতে গিয়ে তাঁরা রাজীব গান্ধী, জ্যোতি বসু, সত্যজিৎ রায়, বুটা সিং, অরুণ শৌরী, প্রিন্সেস ডায়না এবং রাষ্ট্রফল বলতে গিয়ে ভারত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রিয় সরকার ও আসন্ন বির্নাচন নিয়ে কি কি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন? সত্যি কি সুবাস ঘিসিং ও জ্যোতি বসু অপঘাত মৃত্যুর সম্মুখীন হবেন? ১৯৮৯ সত্যজিতের পক্ষে মারাত্মক কেন? রাশিয়া মার্কসবাদ ছেড়ে অধ্যাত্মবাদে আশ্রয় নেবে কোন কারণে? এইসব চাঞ্চল্যকর প্রশ্নের ভবিষ্যৎকথনের প্রেক্ষাপটে কলকাতা তথা বাংলার জ্যোতিষ-চক্রের স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যতের দিকে সাড়া জাগানো আলোকপাত।

৪ মে ১৯৮৯। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় উত্তর কলকাতার কম্বুলিটোলা লেনে এসে দাঁড়াল একটা ঝকমকে কনটেসা। কেতাদুরস্ত সোফার তড়িঘড়ি নেমে দাঁড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে ধরল। অল্প মাথাটি হেলিয়ে বাঁ পাটি বাড়িয়ে দিলেন মালকিন্, তারপর পরিপাটি মুখটি। বয়স বোধকরি ২৮। অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, মায়াময় যৌবন। তাঁর রূপ, সাজ আর আভিজাত্যের অহংকারের সেই পরম রমণীয় মুহূর্তটি কিন্তু বিষণ্ণ করেছিল ভদ্রমহিলার ম্লান ও বিষণ্ণ চাহনিটুকু।

কেন এই বিষণ্ণতা? বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অ্যাস্ট্রোলজার মানব রায়ের কাছে। সামনেকার ডেস্কে মাথা ঠেকিয়ে নিঃশব্দে হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন মহিলা।

জ্যোতিষী মানব রায় এরকম অনেক দেখেছেন। গ্রহপীড়িত মানুষ মানুষী কতবার চোখের জলে ভিজিয়েছে তাঁর ডেস্ক। কেউ বানিজের তীব্রতম যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। কেউ আবার কারণ জেনে নিয়ে প্রতিকারের আশায় বুক বেঁধে ফিরে গেছেন। এইভাবে এই ডেস্কের কাছে এর আগে এসে বসেছেন কত মানুষ। মহানায়ক উত্তমকুমার, কেন্দ্রিয়মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, অভিনেত্রী শতাব্দী রায়···। এছাড়াও শুনেছেন অভিজাত মহল্লার দুঃখের কথা আর সব

মহিলা জ্যোতিষী পারমিতা

যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ

বিশিষ্ট বাড়ির ইতিহাস। এদের কেউ মেনে নিয়েছেন ভবিতব্য কেউ লড়েছেন গ্রহদোষের বিরুদ্ধে। কেউ লড়ে রোগমুক্তি করেছেন, কেউ বা ভাগ্যের কাছে হার স্বীকার করে মুখ বুঁজে সয়ে নিয়েছেন।

আর না সয়েই বা যাবে কোথায়! ভাগ্যের মার ফেলে দেবার জায়গা কই? তাই এ ভদ্রমহিলাকেও সামলে নেবার সময় দিতে হবে!

নাম–শ্রীমতী কমলিকা রায়চৌধুরী। স্বামী-অপূর্ব রায়চৌধুরী। স্বামীর পেশা–সিনিয়র একজিকিউটিভ অব এ রেপুটেড প্রাইভেট কনসার্ন। যন্ত্রণাটা কিসের? –না, আবার মুখ ফ্যাকাশে, চোখ ছলছল করে ওঠে কমলিকাদেবীর।

সবই আছে তাঁর। স্বামী আছে সুখ নেই। সহাবস্থান আছে, সহবাস নেই। সংসার আছে, কিন্তু সন্তান নেই। আর এই অনেকখানি না থাকার জন্য ঘরে তাঁর অদেখা আগুন; ধিকি ধিকি পুড়িয়ে

মারছে। সদাসর্বদা এক মর্মান্তিক অভিশাপ তাড়া করে বেড়াচ্ছে কমলিকা আর তার পরিবারকে। ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, হোমিওপ্যাথি কোন কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। কেন? কোন জন্মের কর্মফল এটি?

মিলনে অ্যালার্জি আছে কমলিকার। অবশ্য এটা শুরু থেকেই নয়। সম্প্রতি বিয়ের পাঁচ বছর বাদে দেখা গেছে। সাইকিয়াট্রিস্টও এর কারণ খুঁজে পাননি। স্বামী সহবাস হলেই অ্যালার্জির বিষম এফেক্ট। তখন কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না কমলিকা। সামনের দিকে বেঁকে যায় পায়ের হাঁটু, হাত নেমে আসে মাটিতে। ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হয় তাঁকে। তখন সে এক অস্বাভাবিক যন্ত্রণা।

শুক্র ও মঙ্গলের এক অশুভ অথচ অভূতপূর্ব যোগাযোগে কমলিকা এই লজ্জাকর অভিশাপের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এই এফেক্ট থাকছে পরের ১৮ ঘন্টা। ডুকরে কেঁদে ওঠেন কমলিকা। আছড়ে পড়ে মানব রায়ের পায়ে। বাঁচান মানববাবু—যেমন করে পারেন, নতুবা আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর পথ নেই।

মানব রায় বিশ্বাস করেন জ্যোতিঃ দর্শন না হলে জ্যোতিষ দর্পণ পাওয়া যায় না, আর এ এত কঠিন ভাগ্যফল, যে শুধুমাত্র গ্রহরত্ন এই সমস্যার সব সমাধান করতে পারবে না। এর জন্য চাই মায়ের করুণা! তাই একদিন দিনক্ষণ দেখে মানব রায় কমলিকা ও তাঁর স্বামীকে নিয়ে তারাপীঠ যান।

কলকাতার জ্যোতিষজগৎ নিয়ে এ হেন মানব রায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। উচ্চশিক্ষিত মানব রায় ইচ্ছা করলেই আইনজীবী হতে পারতেন। হতে পারতেন কেন্দ্রিয় সরকারের দুঁদে অফিসারও। কিন্তু তা হন নি। আর হন নি একদিনকার এক অতিলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটে যাওয়ার জন্য। সেজন্যই সরকারি চাকরি ছেড়ে মানব রায় একদিন নেমে পড়লেন জ্যোতিষচর্চায়। এই চর্চা তাঁর নেশাও বটে, পেশাও বটে।

পেশার অবসরে যখন জ্যোতিষচর্চা মানব-বাবুর নেশার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে বেরিয়ে দেশ ও বিদেশের ভাগ্যচক্র নিয়ে বিচার করতে বসেন। ফরাসী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, ভারত তো অতি অবশ্যই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে। তবে শুধু নস্ত্রাদামু কেন এইরকম পূর্বাভাস তো আমাদের বাল্মিকী, প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর এমন কি হাল আমলের আনন্দমার্গীদের প্রধান শ্রী আনন্দমূর্তিজীও তো দিয়েছেন। আর এদের কাউকে কাউকে নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এরা সকলেই সন্ন্যাসী। সত্যদ্রষ্টা।

আনন্দমার্গের মহাসদবিপ্র আনন্দমূর্তিজী বলেছেন যে, আগামী দিনে যখন পারমাণবিক শক্তি সমানে সমানে টক্কর দেবে, তখন আধ্যাত্মিক অস্ত্রই হয়ে দাঁড়াবে মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। মানব রায় এ প্রসঙ্গে বললেন, এসব তো রামায়ণ মহাভারতের যুগে এই ভারতবর্ষেই হয়েছে। আবার একই ব্যাপার ঘটবে। কলি শেষ হলে আবার পরপর আসবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। সত্যযুগে আধ্যাত্মিক অস্ত্র ছাড়া কিই বা আর ব্যবহার করতে পারে মানুষ? মানুষ অমৃতস্য পুত্রাঃ! তাই যে কোন বিপর্যয়ে সে অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুহীনতার উপায় পেয়েই যাবে। আর তা দেবে এই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীরাই। তাই তো রাশিয়া ইসকনের কাছ থেকে কৃষ্ণনাম নিচ্ছে!

মানব রায় শুধু একাই নন, এই কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন পেশাদার-অপেশাদার প্রায় ১০ হাজার জ্যোতিষ। আর এদের নিয়েই কলকাতার রহস্যবিদ্যার জগৎ। আসলে চিরন্তন বাঙালি চিরকালই রহস্যবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ, মহাতান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপা, মাতৃসাধক রামপ্রসাদের মত অতিলৌকিক শক্তিধর মহামানবেরা তাঁদের অতিলৌকিক কাজকর্মের পরিচয় দিয়েছেন।

এই আধ্যাত্মবাদ তথা কর্মফলবাদের পথ ধরেই বাংলার জ্যোতিষের আবির্ভাব। শুধু কলকাতাই নয় কোষ্ঠীবিচার আর হস্তরেখা বিচারের চল এখন সারা বাংলা জুড়েই ব্যাপ্ত। বাঁকুড়ার অতীশ দীপংকর, মেদিনীপুরের রথীন ব্যানার্জি, হাওড়ার অরুণ ঘোষ, ২৪ পরগণার এল·ভি জয়রামণ, হুগলির নরোত্তম দাস—এর মত বিশিষ্ট মানুষেরাও জ্যোতিষচর্চায় ব্যাপক নাম করেছেন। এর মধ্যে নরোত্তম দাস এবং রথীন ব্যানার্জি উভয়েই মার্কসবাদী বলে পরিচিত। নদীয়ার বিখ্যাত নকশালকর্মী দেবপ্রসাদ লাহিড়ি যিনি একটি ইংরাজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক, তিনিও একজন নামকরা জ্যোতিষবিদ। এভাবেই শুধু কলকাতা নয় সারা বাংলাতেই রহস্যবিদ্যার জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তবে একথা খুবই সত্যি যে, কলকাতাই হল এই চর্চার প্রাণকেন্দ্র।

ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। যে ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে ইদানিং ভারতে সবচেয়ে আলোড়ন উঠেছে তা হল ভারত সম্পর্কে ফরাসী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নস্ত্রাদামুর ভবিষ্যৎবাণী: ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে—২০০৬ সালে। এ ধরনেই ভারতের ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন প্রভু জগৎবন্ধু সুন্দর। যা এর আগে ১৯৮৬—র 'আলোকপাত'—এ প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার জ্যোতিষচক্র নিয়ে আলোচনার সময় আমরা স্বনামধন্য জ্যোতিষীদের কাছে নস্ত্রাদামু এবং জগৎবন্ধু সুন্দরের ভবিষ্যৎবাণীগুলি সম্পর্কেও কৌতুহলী হয়েছিলাম। জ্যোতিষচক্রের হালকিকতের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্কে কলকাতার জ্যোতিষীদের ভাবনা চিন্তাগুলিও এই সঙ্গে পেশ করা হল।

জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে!

ফরাসী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নস্ত্রাদামু এবং প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভবিষ্যৎবাণী (আলোকপাত সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) গুলি সফল হওয়ার ইঙ্গিত পাচ্ছে কলকাতার জ্যোতিষচক্র। বর্তমান প্রতিবেদকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যোতিষবিদ্ অমিয়কুমার মিত্র জানালেন:

'জন কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল জাগতিক বা যোগ জ্যোতিষ। যার আলোকে আগামী যুগে পৃথিবীতে কি ঘটনা ঘটবে, তাতে থাকবে তারই ইঙ্গিত। জ্যোতিষ জগতের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সত্য হল, চারশো বছরের কিছু পূর্বে ফরাসী দেশের এক

দার্শনিক ও সত্যদ্রষ্টা নস্ত্রাদামু-এর এক হাজারটি ভবিষ্যৎবার্তা। যার মধ্যে সফল হয়েছে আটশোটি ভবিষ্যৎবাণী, আর বাকি আছে দু'শোটি। তার মধ্যে আছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামার ধ্বনি। এই যুদ্ধ শেষ হবে ২০০৬ খৃষ্টাব্দে। পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে। ২০০৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি। যুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীতে ভারতই প্রচার করবে প্রেমের এবং শান্তির ললিত বাণী।'

'মানব সভ্যতা কালের স্রোতে যেমন যুগের পর যুগ ধরে আবির্ভূত হয়ে উত্থানের নূতন নূতন রূপে দেখা দিয়েছে তেমন কালের নিষ্ঠুর কষাঘাতে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই বিলীনের মূলে আছে দুটো শক্তি। একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপরটা যুদ্ধ আদি যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যুদ্ধের দামামা বেজে আসছে। যুগের পরিবর্তনের সাথে যুদ্ধের কলা-কৌশল আরও উন্নত হয়েছে। কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব যুদ্ধের ক্ষেত্রে একইভাবে রাশিচক্রে গ্রহদের অবস্থানের মিল আছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের কারণ সমূহ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাচীন যুগে সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য, ধর্মের জন্য যুদ্ধ হত। পরবর্তীকালে ক্ষমতা ও সম্পদ লোভে রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠত। আর এখন বাণিজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধের আশঙ্কা জাগে। আগামী কালে যুদ্ধের কারণ হবে ইজম বিস্তারের জন্য।'

মানব রায়

'মহাভারতের যুগের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গ্রহের অবস্থান আর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিচক্রে গ্রহগণের অবস্থান অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়। আগামী ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে রাশিচক্রে গ্রহ সমূহের অবস্থান উক্ত যুদ্ধে রাশি-স্থিত গ্রহ সমূহের সহিত অনেকাংশ মিল থাকার জন্য সত্যদ্রষ্টা নস্ত্রাদামু এর ভবিষ্যৎবাণী এই সত্যের ইঙ্গিত বহন করে।'

'ভারতের রাশি মকর। শনি এই রাশির অধিপতি। শনি পরিপূর্ণ দুঃখ ও নৈরাশ্যের মূলে। আর রয়েছে মৃত্যুর বিভীষিকা ও দুঃখ বেদনায় ভরাক্রান্ত হৃদয়। তাই যুগে যুগে পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ যুগাবতারের আবির্ভাব এই ভারত-ভূমিতে। গীতায় উল্লেখযোগ্য শ্লোক স্মরণ করিয়ে দেয়—

'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

তাই দেখা যায়—মহাভারতের যুগে শ্রী শ্রী ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব, সজ্জন ও ধার্মিকদের রক্ষার নিমিত্তে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন, সনাতন হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য যুগাবতার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ভারত ভূমিতে অবতরণ। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নস্ত্রাদামু এর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হবে ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যয়ের পরে ভারতে আবির্ভাব হবেন এমনএক মহাপুরুষ যিনি বিমোহিত করবেন পৃথিবীবাসীকে প্রেমের ও শান্তির বাণীতে।'

মনিমালা মিত্র

'বর্তমান ভারতের সম্বন্ধে দার্শনিক নস্ত্রাদামুর একটি ভবিষ্যৎবাণী যা সম্পূর্ণ সত্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতের প্রধান শাসকের অনিবার্য মৃত্যুতে তাঁর আসনে যিনি আসবেন, তিনি হবেন স্বল্প অভিজ্ঞতা ও বয়সে নবীন এবং তাঁর প্রাণ হরণের অপচেষ্টা করা হবে।'

'ভারত তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক যাঁরা শাসন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহন করে সহসা আততায়ীর হস্তে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ বিসর্জন করেছেন। তাদের জন্মকালীন রাশিচক্রে মঙ্গল গ্রহরে প্রভাব অপরিসীম। মঙ্গল গ্রহের প্রভাবে যাঁরা ক্ষমতা শীর্ষে উঠেছিলেন, সেইসব রাষ্ট্রনেতাদের জন্মকালীন রাশিচক্রে লগ্নে অথবা দ্বিতীয়ে বা অষ্টমে মঙ্গল থাকলে সেইসব রাষ্ট্রনায়ক বা আততায়ীর হস্তে গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন·এফ· কেনেডি। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী ভারতের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মকালীন রাশিচক্রে অষ্টম, লগ্নে ও দ্বিতীয়ে মঙ্গলের অবস্থানের জন্য গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা প্রাণ নাশ হয়। বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মকালীন রাশিচক্রে মঙ্গলে অবস্থান অনুরূপ স্থানে থাকার জন্য তার প্রাণ হরণের অপ চেষ্টা কয়েক বার হয় এবং ভবিষ্যতে হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই তার দীর্ঘ জীবন। ভবিষ্যৎ বক্তা নাস্ত্রাদামু এর ভারত সম্বন্ধে কয়েকটি ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যরূপে প্রকাশ লাভ করেছে।'

'ভারতের লগ্ন কন্যা এবং তুলা। কিন্তু জাগতিক জ্যোতিষের মানচিত্রে দেখা যায় চররাশিস্থিত মেষে রবির অবস্থান থেকে মিথুন রাশি—এই ৯০ ডিগ্রির মধ্যে রবি, বৃহস্পতি ও মঙ্গলের অবস্থান এবং মিথুন রাশিস্থিত মঙ্গলের শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকার জন্য দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি, পূর্ব ও উত্তর ভারতে কয়েক মাস ধরে খরা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে ভারতের লগ্নের দ্বাদশে কেতু ও ষষ্ঠে রাহুর অবস্থান হেতু অশুভফল প্রদান করে।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার মুহূর্তে গ্রহ অবস্থান
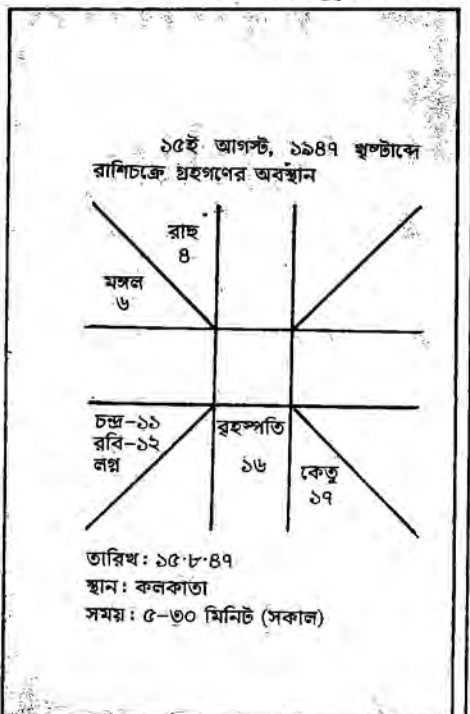
মনে রাখা প্রয়োজন সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে ভারতবর্ষের রাশি মকর এবং লগ্ন কন্যা ও তুলা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান—নব বাংলাদেশ স্রষ্টা—জন্মকালীন রাশিচক্র:
জন্ম তারিখ: ১৭ মার্চ ১৯২০
জন্ম স্থান: টুঙ্গি পাড়া, ফরিদপুর
জন্ম সময়: ৯টা ৯ মিনিট, পি·এম·
(স্থানীয় সময়)
কেতু-২ রবি-২৬ বুধ-২৬ শুক্র-২৩ বৃহস্পতি (বক্রি ৮ চন্দ্র-২৩ শনি (বক্রী) ১১ লগ্ন রাহু-১৬ মঙ্গল-১৪

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মকালীন রাশিচক্র: লগ্ন কন্যা; লগ্নে মঙ্গল ষষ্ঠে কেতু, একাদশে শনি দ্বাদশে রবি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি ও রাহু।

সাংবাদিক পার্থ মুখোপাধ্যায় পেশা না হলেও নেশাগত ভাবে অ্যাস্ট্রোলজার। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—'জ্যোতিঃ দর্শন না হলে জ্যোতিষী হয় না। যিনি জ্যোতির্ময় ঈশ্বরীয় সত্ত্বাকে দর্শন করেছেন, তিনিই প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। যিনি সত্য কথা বলেন, তাঁরই কেবল বাকসিদ্ধি আসে। ৪০০ বছর আগে ফ্রান্সের ভবিষ্যদ্বক্তা আলোকদর্শী নস্ত্রাদামু যা বলেছিলেন ৮০০টির মতন হুবহু ফলে গেছে।

ইন্দিরা হত্যার ভবিষ্যদ্বাণী ৪০০ বছর আগে করেছিলেন ভাবা যায়? ১৯৮২ সালে মিতেরঁ নস্ত্রাদামুর 'সেঞ্চুরিস' খুব মন দিয়ে পড়ে ৮০০টি ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়া দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।'

'সারা বিশ্বময় হরিনাম ছড়িয়ে পড়বে ২০০০ সালের পর। সোভিয়েত রাশিয়াও হরিনামের জোয়ারে ভেসে যাবে। নামের মধ্যেই তো নামী রয়েছেন। সূর্যের চেয়ে বড় কম্যুনিস্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কে আছে? সবাইকে সমানভাবে আলো দেয়। আমি মনে করি ১৯৯৯ সালটি বিশ্বের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষ্ণার্জুন যেভাবে খাণ্ডব দাহন করেছিলেন ঠিক সেইভাবে একমাত্র স্মরণাগত-রাই রক্ষা পাবে। সেই সময় এমন একজন বাঙালি মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে যাঁকে পেয়ে ভারতবাসী ধন্য হবে। ভারতের মূল শক্তি আধ্যাত্ম শক্তি!

লক্ষ লক্ষ সাধু, সন্ত, মুনি, ঋষি, যোগী মহাযোগী এই ভারতের মাটিতেই জন্মেছেন ভারতবর্ষই পৃথিবীর স্বর্গ।'

'সামনের দিন খুব ভয়াবহ। রোগ, ভোগ যুদ্ধ বিগ্রহে বহু লোকক্ষয় হবে। তারপর ২০০০ সালের পর আসবে নতুন যুগ—ধর্ম যুগ। ভারতবর্ষ যুগে যুগে মানুষদের ঈশ্বরমুখী করে এসেছে। রামায়ণ-মহাভারতই বড় প্রমাণ। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।'

দক্ষিণ কলকাতা সংলগ্ন সোনারপুরে জ্যোতিষচর্চা করেন সরকারি নথিভুক্ত জ্যোতিষী এল·ভি·জয়রামন। ডঃ হিরন্ময়ীপার লেখা গবেষণাকৃত 'দ্য হিন্দু ডেস্টিনী ইন নস্ত্রাদামু' বইটি তিনি বেশ মনোযোগ সহকারেই পড়েছেন। এবং পড়ার পর বিচারও করেছেন জ্যোতিষমতে।

জন এফ কেনেডি—আমেরিকার নিহত প্রেসিডেন্ট।
জন্মকালীন রাশিচক্র:

রবি—৪
বৃহস্পতি ৩
মঙ্গল-২
বুধ (বক্রী) ৩
শুক্র—৫
কেতু—৬
শনি—৮
চন্দ্র—১১
রাহু—২০
লগ্ন

জন্ম তারিখ: ২৯ মে ১৯১৭
জন্ম সময়: ৩টা ১৫ মিঃ ১৮ সেঃ
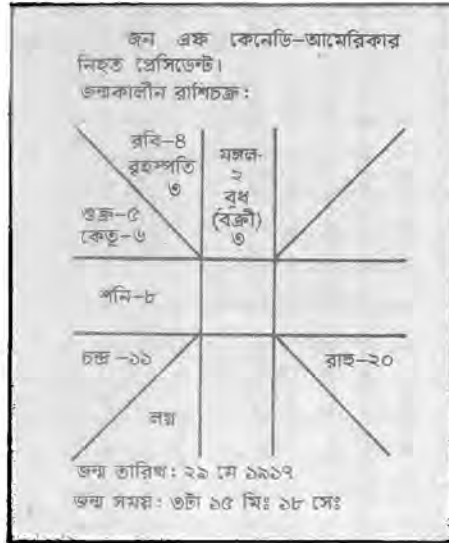
কেনেডির রাশিচক্র

বাংলার জ্যোতিষ জীবন নিয়ে একজন প্রবাসী জ্যোতিষী হিসাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় 'আলোকপাত' কিছু জরুরী প্রশ্ন রেখেছিল তাঁর কাছে। এখানে সেই প্রশ্নগুলি এবং সে প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত উত্তরগুলি হুবহু তুলে ধরা হল।

প্রঃ নস্ত্রাদামু রাজীব গান্ধীর ভবিষ্যৎ নিয়ে যা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা ফলবে কি?

উঃ প্রধানমন্ত্রীর রাশি সিংহ, লগ্ন-কন্যা। বর্তমানে রাহুর দশা চলছে। ব্যক্তিগত সময় অত্যন্ত অশুভ। এই রকম সময় ১০ বছর পর্যন্ত চলবে। আগামী ১০ বছর পর প্রধানমন্ত্রী ভারত তথা বিশ্বের রাজনীতিতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। স্বাধীনতার পর ভারতে যত ভাল প্রধানমন্ত্রী এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে রাজীব গান্ধী সফলতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তাঁর বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য।

প্রঃ লোকসভা নির্বাচনে ভারতের এবং বাংলার ভবিষ্যৎ কি?

উঃ লোকসভা নির্বাচনে বর্তমান রাজীব সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার সংখ্যা গরিষ্ঠতা অবশ্যই অর্জন করবে এবং আগামী ৫ বছর সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনা করবে। বর্তমান বাম সরকারও এই লোকসভা নির্বাচনে ভাল আসন পাবে এবং দলীয় কোন্দল সত্ত্বেও সরকার সুস্থভাবে চালাতে পারবে কেন্দ্রিয় সরকারের সহিত বহুলাংশে সদ্‌ভাব বজায় রেখে। এই বাম সরকারকে কেন্দ্রিয় সরকার কোনমতেই খারিজ করবে না।

প্রঃ কলকাতার ভবিষ্যৎ কি?

উঃ বাম সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আগামী

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির জ্যোতিষের বিরুদ্ধে জেহাদ

দিনগুলি কলকাতার ভাগ্যাকাশকে নানান সমস্যার দ্বারা আন্দোলিত করবে—বেকার সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিক ও মালিকের সঙ্গেও সংঘাত, মারাত্মক ভাবে খুন জখম ঐ সত্ত্বেও বর্তমান বাম সরকার অনুরূপ না হলেও বহু জনহিতকর কর্ম করতে চেষ্টা করবে। অতীতে কলকাতার অবস্থা যা ছিল তার চেয়ে আরো অবনতি হবে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে।

প্রঃ নস্ত্রাদামুর কথামত রাশিয়া মার্কসবাদ ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক বাদে আশ্রয় নেবে কি?

উঃ স্মরণাতীত কাল থেকে রাশিয়ার উপর শনি মহারাজের প্রখর দৃষ্টি আছে। শনি, ধ্যান ধারণা, দুঃখ, দারিদ্র, ধর্ম, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বাদের কারক। সুতরাং একজন জ্যোতিষী হিসাবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আগামী ১০ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রভাব কমবে। শনি মহারাজের কৃপায় রাশিয়াবাসী ধর্মের ও আধ্যাত্মিকের ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে বিশ্বের বহু মার্কসবাদী দেশকে এই ধর্মের পথ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করবে।

কলকাতার জ্যোতিষচর্চা

কলকাতার জ্যোতিষ শাস্ত্রচর্চার ইতিহাস কলকাতারই সমবয়স্ক। কলকাতার জন্ম থেকেই জ্যোতিষীরা ছিলেন। তাঁরা বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীদের কোষ্ঠি বিচার করে দিতেন। গ্রহশান্তির জন্য নানাধরনের যজ্ঞ-করতেন, কবচ তৈরি করে দিতেন।

প্রায় ৩০০ বছর আগের কলকাতার যে দুজন জ্যোতিষীর নাম আজও অনেকে স্মরণ করেন, তাঁরা হলেন জ্যোতিষ বাচস্পতি ও ফকিরচাঁদ দত্ত। কবচ তাঁরা তৈরি করে দিতেন বা তৈরির ব্যবস্থা করে দিতেন! প্রতিটি গ্রহের এবং ওই গ্রহদেবতার পুজো করতেন তাঁরা। রবির দেবতা মাতঙ্গী। রবির কবচের দক্ষিণা ছিল 'ধেনুমূল্য'। চন্দ্রের দেবতা কমলা। দক্ষিণা শংখ ও যথাসাধ্য রজতমুদ্রা। মঙ্গলের দেবতা বগলামুখী। দক্ষিণা 'বৃষমূল্য'। বুধের দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী। দক্ষিণা 'স্বর্ণমুদ্রা'। বৃহস্পতির দেবতা তারা। দক্ষিণা পীতাভ যুগলবস্ত্র'। শুক্রের দেবতা ভুবনেশ্বরী। দক্ষিণা 'অশ্বমূল্য'। শনির দেবতা দক্ষিণাকালী। দক্ষিণা 'কৃষ্ণবর্ণ গাভীমূল্য'। রাহুর দেবতা ছিন্নমস্তা। দক্ষিণা লৌহ। কেতুর দেবতা ধূমাবতী। দক্ষিণা 'ছাগমূল্য'।
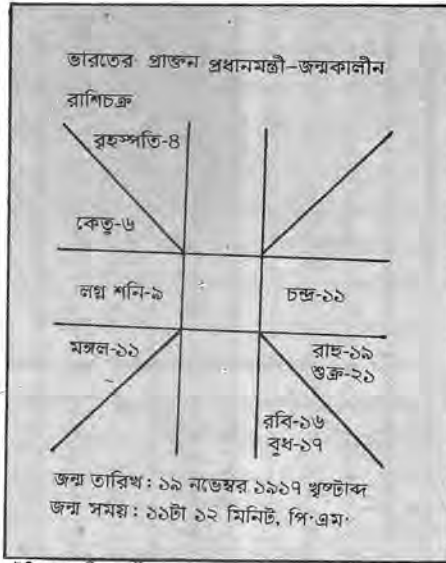
ইন্দিরা গান্ধীর রাশীচক্র

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজির সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত চ্যাটার্জি জ্যোতিষ বাচস্পতি ও ফকিরচাঁদ দত্তের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন, এঁরা প্রবাদপুরুষ। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ সময় পুঁথির প্রতিটি নিয়মনিষ্ঠা মেনে কবচ তৈরি করতেন। তারপর ঐ কবচ গঙ্গাজলপাত্রে ডুবিয়ে রেখে যে গ্রহের জন্য কবচ সেই গ্রহমন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যকবার জপ করতেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণে পূর্ণ জপ সংখ্যা ছাড়া কবচ তৈরি সম্পূর্ণ হয় না। আজ পঞ্জিকা খুললেই বা পত্রপত্রিকায় মাঝে মধ্যে নানা ধরনের শক্তিশালী, মহাশক্তিশালী কবচের বিজ্ঞাপন দেখবেন। এঁদের বেশিরভাগই কবচে কিছু আশীর্বাদ ফুল, বেলপাতা ভরে দেন। এত স্রেফ প্রতারণা। গ্রহশক্তির জন্য গ্রহরত্ন ধারণ করা অনেক সহজ। কারণ ভাল গ্রহরত্ন পাওয়া অনেক সহজ, কিন্তু খাঁটি, ঋষি তুল্য কবচ তৈরি করার মত মানুষ বিরল।

গ্রহের খারাপ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এবং জীবনে সাফল্য পেতে কবচের পরিবর্তে রত্নধারণের প্রচারকে সামনে রেখে জ্যোতিষ বিভাগ সহ রত্ন ব্যবসায়ে কলকাতায় যিনি প্রথম নেমে ছিলেন তাঁর নাম ফণিভূষণ রায়। এই ফণিবাবুই ১৯৪৫ সালে বিবেকানন্দ রোডে প্রতিষ্ঠা করলেন এম·পি· জুয়েলার্স। পত্র পত্রিকায় এম·পি·র বিজ্ঞাপনের সঙ্গী হলেন কাফি খাঁর অসাধারণ কার্টুন। এম·পি·কে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই কার্টুনগুলি বেশ বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম জ্যোতিষশাস্ত্র ছাত্রদের শেখানো শুরু করেন পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী। তাও এটা বিশ শতকের একেবারে গোড়ার কথা। এর আগে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষণকেন্দ্র বলতে বোঝাত কলকাতার গ্রে স্ট্রিট বা হাতিবাগানের টোলগুলি। এদের মতই হাওড়ার জ্ঞানবাড়িও সেকালে নাগরিক জ্যোতিষ চর্চার একটি নামজাদা কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হাতিবাগান বা গ্রে স্ট্রিটের শাস্ত্রী পরিবারেরই চার ছেলে কৈলাসচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও কাশীশ্বর ভাল জ্যোতিষী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর নামের পরে শাস্ত্রীর পরিবর্তে পুরোনো উপাধি ব্যবহার করতেন। রমেশচন্দ্র একটি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠির কৃপায় ব্যাপক প্রচার পেয়েছিলেন এবং পরিচিত হয়েছিলেন জ্যোতিষ সম্রাট হিসেবে। রমেশচন্দ্র বসবাস শুরু করেছিলেন মধ্যকলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে। বাসস্থানের লাগোয়া গড়ে তুলেছিলেন জ্যোতিষ চর্চা ও জ্যোতিষ শিক্ষণ কেন্দ্র। তবে এটা ছিল তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের ব্যাপার। নাম দিলেন অল ইন্ডিয়া অ্যাস্ট্রোলজিকাল অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমিকাল

সমরেন্দ্রনাথ দাস

সোসাইটি।

কলকাতার জ্যোতিষচর্চার এবং গ্রহরত্ন ব্যবসায়ের রমরমা শুরু এই শতকের ষাটের দশকে। ষাটের দশকের শুরুতে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হতে কলকাতার বহু সোনার দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ হয়েছিল। অনেক দোকানই রূপান্তরিত হয়েছিল শয্যাসামগ্রীর দোকান বা শাড়ি কাপড়ের দোকানে। বেশ কিছু দোকানের হাতবদলও হয়েছিল। অনেক স্বর্ণশিল্পী অর্থাভাবে আত্মহত্যাও করেছিলেন সেসময়। যে সব সোনার দোকান তখন তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল তারা প্রত্যেকেই সত্তর দশকের শুরুতে একে একে জ্যোতিষ বিভাগ খুলে গ্রহরত্ন বিক্রি করে ক্রেতাদের ভাগ্য ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যও ফেরাতে চাইল। প্রতিটি রত্ন-পাথর বিক্রিতে ১০০% থেকে ৫০০% পর্যন্ত লাভ। অতএব একই সঙ্গে জ্যোতিষীদের সঙ্গে অনেকেই কমিশনে রফা করলেন। নামী দামী জ্যোতিষীরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাপত্র দিতে লাগলেন। আইন-ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী, ডাক্তারদের হাতে তুলে দিতে লাগলেন হীরে, চুনি, পান্নার ব্যবস্থাপত্র। ব্যবসা জমে উঠতে লাগল। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের পালে আবার হাওয়া ফিরতে শুরু করল। জ্যোতিষ বিভাগে কার কতজন

পার্থ মুখোপাধ্যায়

নামী দামী জ্যোতিষী রয়েছে তার প্রচারে নেমে গেলেন ব্যবসায়ীরা। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গ্রহরত্ন ও ভাগ্য ফেরাবার হাতছানি এবং রমরমা শুরু হল। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হওয়ার আগে যেখানে কলকাতার জ্যোতিষ বিভাগসহ রত্ন ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল দশজন, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সেই সংখ্যা দাঁড়ায় আশির উপর। বর্তমানে অবশ্য এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। তখন প্রায় প্রতিটি সোনার দোকান মানেই জ্যোতিষ ও গ্রহরত্নের বিভাগ। স্বর্ণ ব্যবসায়ী নন, শুধুমাত্র গ্রহরত্ন বেচেন এমন দোকানের সংখ্যাও বর্তমানে কলকাতায় ত্রিশের বেশি। লালবাজারের দুপাশে ফুটপাতেও 'ডালা সাজান' একাধিক 'খাঁটি গ্রহরত্ন'–র দোকান গজিয়ে উঠেছে।

কলকাতায় বর্তমানে জ্যোতিষচর্চা কেন্দ্র এবং জ্যোতিষ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রধান পাঁচটি হল

১) অল ইণ্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি। ৮২/২ এ, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
কলকাতা–১৩

২) অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্ট ৭০, কৈলাস বসু স্ট্রিট
কলকাতা–৬

৩) হাউজ অফ অ্যাস্ট্রোলজি
৪৫ এ, এস পি মুখার্জি রোড
কলকাতা–২৬

রাশিফল: সত্যজিৎ রায়

লগ্নের অধিকর্তা মঙ্গল এবং রাশির অধিকর্তা–শনি। শনি হল চিন্তাশীল জগতের অধিকর্তা ও মঙ্গল হল জীবনের গতি প্রকৃতির অধিকর্তা। এই দুই–এর সংমিশ্রণে তার চলচ্চিত্র চিন্তাধারায় বিশেষ গভীরতা এনে দিয়েছে। আগামী ছয়মাস স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর নির্মিত 'গণশত্রু'র জন্য দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমাদৃত হবেন। কারণ বর্তমানে লগ্নের দ্বিতীয়ায় 'বৃহস্পতি' নবমে 'শনি' এবং একাদশে 'রাহুর' অবস্থান সেই ইঙ্গিতই দেয়। সত্যজিৎবাবুর জন্মকালীন রবির অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে তাঁর পরিচালনায় আগামী চলচ্চিত্রগুলিও আমৃত্যু স্বীকৃতি পাবে। হৃদ-গোলযোগের দ্বারা স্পাইনল কর্ডে কোন কষ্ট হলে কিংবা প্রস্রাব সংক্রান্ত কোনরূপ অসুবিধা হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের মতামত প্রয়োজন। পুত্র কারক গ্রহ 'রবি' পুত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে একটু বিলম্বে ফল দান করবে। বর্তমান লগ্নের সপ্তম ঘরে ও রাশির উপর রাহুর অবস্থান ও দৃষ্টি থাকায় স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়েও মানসিক উদ্বেগ আসতে পারে। শিল্প জগতের অধিকর্তা যেহেতু 'শুক্র' এবং জন্মকালীন যার সিংহাসনে অধিষ্ঠান হয়েছিল সেহেতু সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের নতুন চিন্তাধারার বুনিয়াদ হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের আগামী চলচ্চিত্র শুধু মাত্র গুণীজনের ক্ষেত্রে নয়, সাধারণ নাগরিকের অন্তরে বিশেষভাবে স্থান পাবে। বর্তমান গোচরে 'কেতুর' পঞ্চমে অবস্থান। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁর দীর্ঘজীবন দান করুন।

–মানব রায়।

ভবিষ্যৎবাণী—বুটা সিং

ক্ষমতাশীল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং দীর্ঘদিন ধরে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করছেন। কিন্তু হালফিল তাঁর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা যেন কিছুটা কমে গেছে। সাধারণ জনগণ কিংবা দলীয় সদস্যদের কাছে হয়তো তা এখনও স্পষ্টরূপে ধরা পড়েনি। আর এটা এমন কিছু নয় যে এই অবস্থা থেকে তিনি নিজেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। পরিচালনার ক্ষমতায় ইদানিং তাঁর যেন কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পরিবারের লোকেরাও তা বুঝেছেন। যে বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন তাতে দেওয়া-নেওয়ার ভুল-বোঝাবুঝিতে কিছু শত্রু আছে বৈকি। আগামী কয়েক মাসে সরকারি কাজে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার দরুন দৌড়ঝাঁপও করতে হবে। আর স্বাস্থ্যের পক্ষে তা হবে ক্ষতিকর। সুতরাং তাঁর সাম্প্রতিক কাজের ধারা ও নিয়মাবলী বদলানো প্রয়োজন। পনেরো দিন পরপর নিরাপত্তা কর্মী পাল্টানো দরকার যাতে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত হয়।

ভবিষ্যৎবাণী—রাজকুমারী ডায়না

রাজকুমার চার্লসের সঙ্গে রাজকুমারী ডায়নার বিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তুলেধরা হয়েছিল। এখন কিন্তু ডায়নার পর্দার আড়ালে সরে যাওয়া দরকার। যাতে পরিবারের আর পাঁচজন সুযোগ পায়।

ডায়না কিন্তু কিছুতেই নিজেকে লাইমলাইট থেকে সরাতে চান না। এরপর তাঁর পরিবার বাড়বে। তখন পারিবারিক চাহিদায় তাঁকে অনেক বেশি সময় দিতে হবে তাই ইংল্যাণ্ডের ফ্যাশন জগত থেকে তাঁর নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে। তাছাড়া কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ফ্যাশন জগতে নিজের একাধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ডায়নার বিবাহিত জীবনেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। বয়সের পার্থক্য তার একটি অন্যতম দিক। সাধারণ লোক জানার আগে তার অনেকটাই মিটে যাবে। একচ্ছত্র আধিপত্যের ধারা তাঁকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। কিন্তু তিনি নিজেকে এর হাত থেকে মুক্ত করতে চান।

ভবিষ্যৎবাণী—অরুণ শৌরি

'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস'–এর সম্পাদক অরুণ শৌরি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে অস্বস্তিপূর্ণ পরিবেশে নিয়ে গেলেও তিনি নিজে কিন্তু তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকার কঠোর হাতে তার স্বাধীনতা দমন করা থেকে এখনও বিরত হন নি। ঠক্কর কমিশনের রিপোর্ট ফাঁস করে দেওয়ায় হয়তো তাঁকে কিছু বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া এই সমস্ত ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে শরীরের ওপরেও চাপ পড়বে। কাজেই স্বাস্থ্যের দিক থেকেও বাধা আসতে পারে। ভগ্নস্বাস্থ্য তার পেশায় কিছুটা প্রভাব ফেলবে বইকি। পারিবারিক সংযোগ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইলে তাঁকে তাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে হবে। তা না হলে নিজের প্রয়োজনে তাদের সাহায্য, সহানুভূতি কোনটাই পাবেন না। সামাজিক দিকটিতেও তিনি সক্রিয় হ'তে চান। আগামী এক বছর উত্তেজনা ও অস্থিরতায় কাটাতে হবে।

৪) বিশ্ব জ্যোতির্বিদ সংঘ
২ আদিনাথ সাহা রোড
কলকাতা–৪৮

৫) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি
৭ এ, বিনয় বসু রোড
কলকাতা–২৫

এইসব সংস্থা থেকে যে সব উপাধি বিলি করা হয় সেগুলি হল, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষশাস্ত্রী, জ্যোতিষভূষণ, জ্যোতিষআচার্য ইত্যাদি। তবে আপাতত ডক্টরেট ডিগ্রি এইসব প্রতিষ্ঠানের কেউই দেন না। এখানে জ্যোতিষশাস্ত্রের বেশ কিছু ডক্টরেট আছেন যাঁরা ডিগ্রিগুলি পেয়েছেন লণ্ডন বা আমেরিকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

যোগাযোগ করে দেখা গেল, এইসব নামের কোনও সরকারি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ওইসব দেশে নেই। তবে বেসরকারি উদ্যোগে থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে পাগলাবাবা (বারাণসী) জানিয়ে ছিলেন, এঁদের কেউ কেউ লণ্ডন, আমেরিকায় না গিয়ে কলকাতায় বসেই এফিডেভিট করে আমেরিকার 'ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির' ডকটরেট বনে যান, স্বর্ণমূল্যে স্বর্ণপদক কেনেন। রাজজ্যোতিষী প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছিলেন, তাও ভারি মজার। বলেছিলেন, জেলের কয়েদিদের বা ফাঁসির আসামীদের প্রয়োজন মেটাতে নিয়োজিত

দীপজ্যোতি

পুরোহিতই সরকার বা রাজার নিয়োজিত হিসেবে নিজেকে রাজজ্যোতিষী বলে প্রচার করেন, পাগলাবাবা এসব কথা বলেছিলেন ১৯৮৫ সালে ১৮ এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের একটি অনুষ্ঠানে।

জ্যোতিষ সম্রাট উপাধি • ধারণকারীরাও স্ব-ঘোষিত সম্রাট ছাড়া কিছু নন। অনেক সময় অবশ্য দেশে-বিদেশে বেসরকারি উদ্যোগে গড়া জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠানই আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের হাতে সম্রাট উপাধি তুলে দেয়। আবার কখনও কখনও রত্ন ব্যবসায়ীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

জ্যোতিষ চর্চার বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রথম লড়াই

১৯৭৫–র জুলাই জ্যোতিষীদের তথা কলকাতার জ্যোতিষীদের কাছে কালা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই দিন রাত ৮টা থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত আকাশবাণী কলকাতার 'ক' কেন্দ্র থেকে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানটির নাম, 'জ্যোতিষ নিয়ে দুচার কথা'। অনুষ্ঠানটি শুনে এই বিষয়ে মতামত জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে চিঠি পাঠান বিজ্ঞান বিভাগের প্রযোজক। চিঠিতে অনুষ্ঠানটিকে 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে জ্যোতিষী বা ভাগ্যগণনাকারীদের পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন 'জ্যোতিষ সম্রাট' ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী, ভৃগু আচার্য ওরফে শুকদেব গোস্বামী, 'এ যুগের খনা' নামে পরিচিতা পারমিতা এবং পাগলাবাবা (বারাণসী)। বিজ্ঞানের পক্ষে বা জ্যোতিষীদের বিপক্ষে ছিলেন প্রবীর ঘোষ। তিনজন জ্যোতিষী আকাশবাণীর আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। তাঁরা হলেন, 'মানবী কম্পিউটার' নামে খ্যাতা শকুন্তলা দেবী, 'মেটাল ট্যাবলেট' খ্যাত অমৃতলাল এবং আচার্য গৌরাঙ্গ ভারতী।

আলোচনাটিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশে ছিল 'জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান, কি বিজ্ঞান নয়' এই নিয়ে বিতর্ক। দ্বিতীয় অংশে ছিল প্রবীর ঘোষের পরিচিত কয়েকজনের হাত ও ছক দেখে সাধারণ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, যেমন–তাদের আয়, শিক্ষাগত, বিবাহ, কি ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি।

রেকর্ডিং–এর মাস খানেক আগে শুকদেব গোস্বামীকে প্রবীর ঘোষ এবং প্রবীর ঘোষের দুই বন্ধু হাত দেখিয়েছিলেন। অসিত চক্রবর্তী ও পারমিতাকে দিয়েছিলেন প্রবীর ঘোষের চার পরিচিত ও বন্ধুর জন্ম সময়। এই দুই জ্যোতিষী গণনার সময় পেয়েছিলেন মাসখানেক। প্রতি জাতক পিছু অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল চারটি করে। প্রশ্নগুলি রাখার সময় জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলোচনা করেও নিয়েছিলেন। যে সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে জ্যোতিষীরা সামান্যতম অসুবিধের কথা বলেছেন, যে সব প্রশ্ন প্রবীর ঘোষ তৎক্ষণাৎ বাতিল করেছেন।

কলকাতায় জ্যোতিষ বিরোধী যুক্তিবাদী সমিতির নেতা প্রবীর ঘোষ আকাশবাণীর ওই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলেন– 'বিতর্কের অংশে জ্যোতিষীরা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত, পরাজিত ও নতজানু হয়েছিলেন। আলোচনার দ্বিতীয় অংশে শুকদেব গোস্বামীকে জাতক পিছু চারটি করে অর্থাৎ মোট ১২টি প্রশ্ন করেছিলাম। তার মধ্যে ১১টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন পুরোপুরি ভুল।

পারমিতা ও অসিত চক্রবর্তীকে জাতক পিছু চারটি করে অর্থাৎ ১৬টি প্রশ্ন করেছিলাম। এঁরা দুজন ১৬টি প্রশ্নেরই ভুল উত্তর দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুজনে একই জন্ম সময় নিয়ে গণনা করা সত্ত্বেও ১৬টি উত্তরের মধ্যে একটি মাত্র ক্ষেত্রে দুজনের উত্তরে মিল ছিল। উত্তর না মিললে জ্যোতিষীরা সঠিক জন্ম সময়ের কূট প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একই জন্ম সময় নিয়ে গণনা করা সত্ত্বেও দু'জনের দু'রকম উত্তরের কি অজুহাত তাঁরা দেবেন?

প্রচারিত অনুষ্ঠানটি জনমানসে এত বিপুল ভাবে নাড়া দিয়েছিল যে কৃষ্টি সংসদ (সোনারপুর) তাঁদের নাটক 'ভাগো ভূত ভগবান'–এ বেতার অনুষ্ঠানটিকে নিয়ে এসেছেন। এই বেতার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিষ সম্রাট ডঃ অসিত কুমার চক্রবর্তী একটি বই প্রকাশ করেছেন। নাম 'জ্যোতিষ বিজ্ঞান কথা'। বইটি মূলত প্রবীর ঘোষ–এর নেতৃত্বে বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিবাদী আন্দোলনকে আক্রমণ করেই লেখা। তিনি বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছেন, যে রাতে আকাশবাণী বেতার অনুষ্ঠানটি প্রচার করেছিলেন, 'জ্বালা প্রশমনের জন্য সে রাতেই দেবতা এগিয়ে দিল লেখনী।'

এই বইটির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রবীরবাবু বললেন, 'হায়, জ্যোতিষসম্রাট প্রমুখ অংশ গ্রহণকারী অন্য জ্যোতিষীরা, আপনারা এত লোকের ভাগ্য বলে দেন, ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেন, অথচ আপনাদের চূড়ান্ত অপমানের আগাম খবরটাই আপনারা জানতেন না!'

কলকাতার জ্যোতিষীরা ও গ্রহরত্নের ব্যবসায়ীরা দ্বিতীয় বড় আঘাত পেলেন, যখন 'মানবী কম্পিউটার' শকুন্তলাদেবী প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ সাড়া না দিয়ে কলকাতা ছাড়লেন। শকুন্তলাদেবী বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী। প্রথমবার আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে তিনি প্রবীর ঘোষের বিরুদ্ধে হাজির হন নি। জানতেন, হাজির না হওয়ার যে অপমান, তার চেয়ে বহুগুণ বড় মাপের অপমান তাঁর জীবনে নেমে আসবে, যদি হাজির হয়ে পরাজিত হন। দ্বিতীয় বারও প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জের মুখে তিনি অস্বাভাবিক নীরবতা দেখিয়েছেন।

৪ ফেব্রুয়ারি '৮৭ কলকাতার সান্ধ্য দৈনিক ইভিনিং ব্রিফ–এর প্রথম পাতা জুড়ে ' দ্য মিসটিক্যাল লেডি অব দ্য কমপিউটার' শীর্ষকে তথাকথিত 'হিউম্যান কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবীর ছবি ও সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। ওই সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় শকুন্তলা দেবী বলেছেন, 'অ্যাস্ট্রোলজি ইজ অলসো এ পার্ট অব ম্যাথামেটিকস। অন্যত্র বলেছেন, 'অ্যাসট্রোলজি ইজ্‌ দ্য কিং অব অ্যাপ্লায়ড সায়েন্স।'

শকুন্তলাদেবীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি কোনও অনুষ্ঠানে কখনও অংক কষায় ভুল করেছেন?

শকুন্তলাদেবীর তাৎক্ষণিক উত্তর 'আই হ্যাভ নেভার হ্যাড এনি স্লিপ আপস বিকজ আই অ্যাম টু কনফিডেন্স অব মাইসেলফ।'

মানবী কমপিউটার শকুন্তলা দেবী সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রবীরবাবু বললেন, 'মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল। সময়ে তাই অনেক কিছুরই বিস্মরণ ঘটে। কিন্তু, শকুন্তলাদেবীর স্মৃতিতো আজ কিংবদন্তী। গিনিজ বুক অব রেকর্ডস–এ তাঁর নাম জ্বলজ্বল করছে। এমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী মহিলাটিকে বিনীত ভাবে ১৯৭২ সালের একটি অনুষ্ঠানের কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দিনটি ছিল ২ আগস্ট। স্থান কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের করসপনডেন্স হল। শকুন্তলাদেবীকে ঘিরেই অনুষ্ঠান। তখনও শকুন্তলাদেবী পেশাদার জ্যোতিষী হয়ে ওঠেন নি, হয়ে ওঠেন নি ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজির সম্মানীয় পৃষ্ঠপোষক। সেদিনের অনুষ্ঠানে শকুন্তলাদেবী অংক কষতে গিয়ে বার বার পর্যুদস্ত হচ্ছিলেন, বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। এই অসাধারণ মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন পোস্ট মাস্টার জেনারেল সহ কয়েক শ'মানুষ।

শকুন্তলাদেবীর আগেও অনেকেই মুখে মুখে অংক কষার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রামানুজন এবং সোমেশ বসুর নাম তো অংকপ্রিয়দের প্রায় সকলেরই জানা। শকুন্তলাদেবী এবং অন্য যাঁরাই মুখে মুখে বিশেষ ধরনের কিছু অংক কষেন, তাঁরা সেগুলো কষেন অংকের কিছু সূত্রের সাহায্যে। এই সূত্রগুলি জানা থাকলে এবং কঠোর অনুশীলন করলে ক্লাস এইটের পিনাকীও 'হিউম্যান কম্পিউটার' হয়ে উঠতে পারে।

শকুন্তলাদেবীর সাক্ষাৎকারটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীর ঘোষ ইভনিং ব্রিফ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে শকুন্তলাদেবীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। বললেন, 'জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র এক নয়। জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, প্রকৃতি ইত্যাদি নিরুপণ করা, আর জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয় হল মানবদেহে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব নিরুপণ করা। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে কিন্তু বিজ্ঞান স্বীকার করে না। বিজ্ঞান স্বীকার করে মানুষের সুখ দুঃখের কারণ আকাশের গ্রহগুলোর মধ্যে নিহিত নেই, নিহিত রয়েছে সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার উপর। শকুন্তলাদেবী জ্যোতিষকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের রাজা এবং অংক শাস্ত্রের শাখা ইত্যাদি মিথ্যে ও উদ্দেশ্যমূলক কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, এবং বাড়াচ্ছেন নিজস্ব ব্যাংক ব্যালেন্স। শুধু শুকনো আলোচনা নয়, শকুন্তলা দেবীকে কয়েকজনের হাত, রাশিচক্র বা জন্ম সময় দেখে তাঁদের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো হবে খুবই সহজ সরল। জাতকের আয়ু, আয়, বিয়ে, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, এইসব প্রচলিত বিষয়েই তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখবেন প্রবীরবাবু। শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই তাঁকে প্রবীরবাবু ৫০,০০০ টাকা দেবেন। আর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হলে শকুন্তলাদেবীকে জমানত হিসেবে ৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে।'

চ্যালেঞ্জ জানানোর পর প্রবীর ঘোষ যাতে পিছিয়ে না আসতে পারেন তার জন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁকে দিয়েএকটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নেন। ওরা নিশ্চিত ছিলেন শকুন্তলাদেবী এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন।

৬ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি প্রথম পৃষ্ঠার চারদিকে বর্ডার দিয়ে বড় বড় হরফে লিখল 'শকুন্তলা দেবী চ্যালেঞ্জড্। ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলেই পত্রিকার তরফ থেকে শকুন্তলা দেবীকে সে দিনের পত্রিকাটি পৌঁছে দেওয়া হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় ইভিনিং ব্রিফ ও অন্যান্য কয়েকটি পত্র পত্রিকার তরফ থেকে কিছু সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে হাজির হন, চ্যালেঞ্জের মুখে শকুন্তলা দেবীর প্রতিক্রিয়া জানতে।

এক তলার রিসেপশন কাউন্টার থেকে সাংবাদিকদের বলা হয়, শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে হলে দয়া করে এখান থেকে তাঁকে ফোন করুন। ফোন করেন ইভিনিং ব্রিফএর প্রতিনিধি। শকুন্তলা দেবীর এক সহকারিণী জানান, শকুন্তলা দেবী চ্যালেঞ্জের খবরটা পেয়েছেন, কিন্তু ভালভাবে পড়ে উঠতে পারেন নি। এখন কাস্টমারদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছেন, পরে তিনি এ বিষয়ে মতামত জানাবেন।

নাছোড়বান্দা সাংবাদিকরা আরও কয়েকবার ফোন করে মাত্র দুটি মিনিট সময় চাইলেন। সময় মিলল না, এক সময় উত্তর মিলল, জরুরি ফোন পেয়ে শকুন্তলা দেবী এই মাত্র বেরিয়ে গেছেন।

কোথায়? কখন ফিরবেন?

সাংবাদিকদের এইসব প্রশ্নের উত্তরে সহকারিণী জানালেন, কিছুই বলতে পারছি না।

না, হোটেলের সামনের পথ ধরে শকুন্তলা দেবী বের হন নি। সাংবাদিকদের চোখ এড়িয়ে পিছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কলকাতার জ্যোতিষ মহল তৃতীয় বড় ধাক্কা খান, ৯ এপ্রিল '৮৮।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ৯ ও ১০ এপ্রিল দুদিন ব্যাপী এক জ্যোতিষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন 'অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্ট'। সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়া বাংলাদেশ, নেপাল ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশ থেকেও নাকি প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত দুই মন্ত্রী সরলদেব ও কিরণময় নন্দও ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলের রাজ্য মন্ত্রী সরল দেব ও হাইকোর্টের চার বিচারপতি। প্রথম দিন বক্তা হিসেবে ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্লাইড দিয়ে মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত করালেন। শেষে বললেন, যিনি জ্যোতিষী তাঁর জ্যোতিষচর্চার জন্য সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের মহাকাশের নিখুঁত অবস্থান পাওয়ার জন্য পঞ্জিকার তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারতে দুধরনের পঞ্জিকা প্রচলিত। বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র খুললে দেখতে পাওয়া যাবে দিন পঞ্জিকার তিথি, নক্ষত্র, সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের সময় দুরকম দেওয়া আছে—'দৃকসিদ্ধ মতে' এবং অন্য' পঞ্জিকা মতে'। অর্থাৎ দুটি পঞ্জিকা মতে গ্রহ অবস্থান দুরকমের। এবারে বিজ্ঞানভিত্তিক পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। সারা বিশ্বে আটটি দেশ থেকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রামাণিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এফিম্যারিস' প্রকাশিত হয়, ভারত এই আটটি দেশের অন্যতম। এই গ্রন্থে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী অনুসারে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে গণনা করা হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে যত মান মন্দির আছে সেইসব মান মন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতিষ্কদের গণিত অবস্থান মিলিয়ে দেখা হয়। তারপর একই সূত্রাবলী প্রয়োগ করে এফিম্যারিস তৈরি করা হয়।

এরপর অমলেন্দুবাবু জ্যোতিষীদের প্রতি আহ্বান জানান আপনারা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে চাইলে এফিম্যারিসের সাহায্য নিন।

অমলেন্দুবাবু বক্তব্যের সূত্র ধরেই সেদিন প্রবীর ঘোষ অমলেন্দুবাবুর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন 'এফিম্যারিস দেখে গ্রহ অবস্থান নির্ণয় করলেই কি প্রমাণ করা যাবে, গ্রহরাই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত? এই সম্মেলনে বহু নামী দামী জ্যোতিষীরা উপস্থিত রয়েছেন। এঁদের অনেকেই গ্রহ অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এইফম্যারিসেরই সাহায্য নেন। তাঁরা কেউ কি প্রমাণ করতে পারবেন, জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞান?

যে কোনও প্রশ্ন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে নামী দামী জ্যোতিষীরা করতে পারেন, এরপর ওই সভায় প্রবীরবাবু ঘোষণা করেন এবং তিনি আশা রাখেন তাঁর প্রশ্নের উত্তরও তিনি দেবেন। সেইসঙ্গে একথাও তিনি ঘোষণা করছেন, উপস্থিত কোনও জ্যোতিষী যদি তাঁর দেওয়া কয়েকটি জন্ম সময় বা হাত দেখে জাতকদের অতীত ও বর্তমান বিষয়ে কিছু প্রশ্নের শতকরা ৮০ ভাগের নির্ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হন, তাহলে তাঁকে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা। তবে প্রবীর ঘোষের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে জ্যোতিষী বা জ্যোতিষীদের দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা।

প্রবীর ঘোষের বক্তব্য শুনতে এবং এই ধরনের 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' আলোচনা শুনতে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেকটের ছাত্রছাত্রীরা যদিও অতিমাত্রায় উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু ব্যবস্থাপকদের তীব্র বিরোধিতায় এবং অসহযোগিতায় তাঁদের সে আশা ফলপ্রসূ হয় নি।

পরের দিন আনন্দবাজারের একটি সংবাদ তিনি দেখেন।অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, তাঁরা প্রবীর ঘোষের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। এই থেকেই সংবাদপত্র শুরু হয়ে গেল প্রবীর সমর্থক এবং জ্যোতিষ সমর্থকদের লেখ্য কাজিয়া। এরপর 'বলপ্রয়োগ করে প্রবীর ঘোষকে বক্তব্য থেকে বিরত করার জন্য' এই পত্রিকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান সংস্থা ও ব্যক্তিদের মতামত এবং চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। তারপর জ্যোতিষ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীর ঘোষ আনন্দবাজারে একটি চিঠি দেন। তাতে তিনি জানান, উদ্যোক্তারা বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পর নির্ধাতির কোন একটি দিনে তিনি মৌলালী যুবকেন্দ্রে উৎসাহী শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত হতে পারেন। 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করার দায়িত্ব নিতে তাঁদের 'পশ্চিমবঙ্গ' বিজ্ঞানমঞ্চ প্রস্তুত। চিঠিটি ২৯ এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

সে চ্যালেঞ্জও কেউ গ্রহণ করেননি, প্রবীর ঘোষের লড়াইও থেমে যায়নি। এখন জ্যোতিষ ও অলৌকিকবাদীদের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় ২৩৭টি সহায়ক সংস্থা গড়ে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ'—এর ব্যানারে প্রবীর ঘোষ তার অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

—রমাপ্রসাদ ঘোষাল।

জ্যোতিষীকে বিখ্যাত করে তুলতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হয়। বিনিময়ে সংস্থা ওই জ্যোতিষ ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানের জ্যোতিষীকে সংবর্ধনা জানায়।

সত্তর দশক থেকেই বিভিন্ন জ্যোতিষ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ফি বছর জ্যোতিষ সম্মেলন, আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলন ইত্যাদি করছেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যাপকতর প্রচারের জন্য এখন শুধুমাত্র জ্যোতিষ নিয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় চারটি পত্রিকা—১) জ্যোতির্বাণী, ২) জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, ৩) রাজ জ্যোতিষী, ৪) বিদ্যা জ্যোতি।

কলকাতায় পেশাদার জ্যোতিষীর সংখ্যা কত? এই বিষয়ে পরিসংখ্যান নিতে বিভিন্ন জ্যোতিষী, জ্যোতিষ শিক্ষা কেন্দ্র এবং রত্ন ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়েছিলাম। এই বিষয়ে তাঁরা কেউই ঠিক মত আলোকপাত করতে পারলেন না। মনে হয়, পেশাদার জ্যোতিষীর সংখ্যা কলকাতায় প্রায় তিনশ।

কলকাতায় প্রথম নামী মহিলা জ্যোতিষী পারমিতা, তারপর এসেছেন অঞ্জলি দেবী, প্রিয়াংকা, কৃষ্ণা, কল্যাণী মুখার্জি, লোপামুদ্রা, মণিমালা আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে ডিগ্রিধারণের দিক থেকে অঞ্জলি দেবীই সম্ভবতঃ সবচেয়ে শিক্ষিতা, এম·এ·বি·এড।

বিজ্ঞাপনের দৌলতে এবং গণনার সফলতায় ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী, পন্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সমরেন্দ্র দাস, শ্রী রবি শাস্ত্রী, ডঃ সন্দীপন চৌধুরী, পারমিতা, শুকদেব গোস্বামী ওরফে ভৃগু আচার্য এবং অমৃতলাল।

অমৃতলাল এক বিষয়ে সবার চেয়ে আলাদা। তিনি রত্ন ধারণের ব্যবস্থাপত্র দেন না। পরিবর্তে দেন মেটাল ট্যাবলেট।

অপেশাদার বা অন্য পেশায় নিযুক্ত থাকলেও কলকাতায় এমন কিছু জ্যোতিষী আছেন যাঁদের কাছে প্রতি নিয়ত ভাগ্যবিশ্বাসী মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। এঁদের দুজন হলেন অতীন ঘোষ, কর্মস্থল কলকাতা হাইকোর্ট। দ্বিতীয় জন গৌরলাল মুখার্জি কাজ করেন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে।

বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মানুষও জ্যোতিষ চর্চায় এগিয়ে এসেছেন। আছেন বিজ্ঞানী অনাদিনাথ দাঁ, সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়, সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুখদেব রায়চৌধুরী, শিক্ষাবিদ ডঃ রমা চৌধুরী, খেলোয়াড় শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, পি·কে· ব্যানার্জি, জাদুকর পি সি সরকার, অভিনেতা দীপংকর দে ও তরুণকুমার, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও পূর্ণেন্দু পত্রী, রাজনীতিবিদ ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ, অজিত পাঁজা, যতীন চক্রবর্তী, নির্মল বসু ইত্যাদি।

ইন্টার ন্যাশনল ফেডারেশন অব অ্যাস্ট্রোলজারর্স–এর সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ দাসকে রাজজ্যোতিষী বললেই ঠিক বলা হয়। রাজ্য ও কেন্দ্রের বিশিষ্ট মন্ত্রীরা তাঁর কাছে প্রায়শই জ্যোতিষ বিচারের জন্য আসেন। রাজ্যের বামপন্থীদের মধ্যে মৎসমন্ত্রী কিরণময় নন্দ, প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এবং একদল মার্কসবাদী নেতা, কেন্দ্রিয় মন্ত্রীদের মধ্যে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, অজিত পাঁজা এবং বেশ কিছু প্রাক্তনমন্ত্রী প্রায়শই নাকি সমরেন্দ্রবাবুর কাছে আসেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী পত্নী কমল বসু এবং বিশ্ববন্দিতা অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের ছকও তিনি নিয়মিত দেখে থাকেন। রাজ্য পর্যায়ের বা সর্বভারতীয় রাজনীতি ও সংস্কৃতি জগতের নেতৃস্থানীয়দের ব্যক্তিগত জ্যোতিষী হওয়ার সুবাদে তাকে নিশ্চয় রাজজ্যোতিষী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তবে তিনি নথিভুক্তভাবে উপাধি লাভ করেছেন দুটি–জ্যোতিষরত্ন এবং জ্যোতিষমণি। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জি ব্যবসায়িক জ্যোতিষ চক্রের সম্পর্কে একটি তির্যক মন্তব্য করলে সমরেন্দ্র দাস তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানান এই বলে–'সুব্রত মুখার্জি জ্যোতিষকে মিথ্যা ও ভুয়া বলে আখ্যা দিয়েছেন বলে কাগজে খবর বেরিয়েছে দেখলাম। তা আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এই বলে যে, উনি যদি ১২ রতি নিখুঁত রক্তমুখী নীলা ৩ মাস ব্যবহার করতে পারেন তাহলেই উনি জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে উপযুক্ত সত্যতা ও জ্ঞান পেয়ে যাবেন।'

আলোকপাতের সঙ্গে আলোচনা কালে সমরেন্দ্রবাবু ১) বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ২) জ্যোতি বসুর ভবিষ্যৎ এবং ৩) জ্যোতি বসুর জ্যোতিষ ছকের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর জ্যোতিষ ছকের মিল থাকার দরুন তারও অপঘাতে মৃত্যু হতে পারে কিনা এই তিনটি চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে সমরেন্দ্রবাবুর মতামত হল, 'যে লগ্নে জ্যোতি বসু তথা বামফ্রন্ট সরকার এটি হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন সে অনুপাতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এটির হওয়া নিশ্চিত।' হঠাৎ বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে তিনি গণনা করতে গেলেন কেন? –এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন–তুলনামূলক ভাবে আমি বামপন্থী নেতাদেরই হরস্কোপ বেশি দেখে থাকি। অবশ্য শুধুমাত্র যে তাঁদেরই দেখি তা নয়–সকলেরই দেখি। তবে তাঁরা বেশি করে আসেন। তাই তাঁদের অনেকেরই হরস্কোপ আমার মুখস্থ আছে বলতে পারেন। তাছাড়া জ্যোতিবাবুরও জ্যোতিষী আমি। তাঁর পত্নী তো আমার কাছে এসে ছক করিয়ে নিয়ে গেছেন। আর যেহেতু বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুতর পরিকল্পনা জ্যোতিবাবুর এবং মূল উদ্যোগ ওনারই, সেহেতু ওনার হরস্কোপ দেখেই

কলকাতার জ্যোতিষচক্র দিন দিন রমরম করে বেড়ে চলেছে। আর এই বেড়ে চলা এগিয়ে চলেছে বিত্তবান পরিবারগুলির দিকেই। কারণ অস্তিত্বের সংকটে জ্যোতিষমুখী হওয়ার চেয়ে বিত্তবান মানুষদের লাখ লাখ টাকা উড়ছে পদ, প্রতিষ্ঠা এবং স্ট্যাটাসের দৌড়ে টিকে থাকা যাবে কি যাবে না এই প্রশ্নেই।

বলছি যে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হবেই।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভবিষ্যৎ বলতে গিয়ে তাঁর ছক নিয়ে সমরেন্দ্র দাস বললেন, 'রাজনৈতিক দিক থেকে জ্যোতিবাবুর কোনভাবেই কোন ক্ষতি হতে পারে না। চূড়ান্ত পরাজয় তো নয়ই। এখন সম্প্রতি বিভিন্ন কাগজে জ্যোতি বসু ও তাঁর পরিবারবর্গের কারো কারো বিরুদ্ধে যে পরপর দুর্নীতির অভিযোগ ছাপা হল, সেগুলিও জ্যোতিবাবুর তিলমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বরং যতদিন যাবে তত তাঁর পপুলারিটি বাড়বে। জ্যোতি বসুর দ্বাদশে কেতু আছে, এই কেতুর প্রভাবেই ওসব অপপ্রচার। ওনার দশমে শনি থাকার জন্য শত্রুতা যতই বাড়ুক; তাতে ওনার পতনের কোন ভয় নেই। শনি গ্রহ হল জ্যোতিবাবুর রাশিপতি। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে জ্যোতি বাবুর বেশ কিছু ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রগত মিল আছে। যেমন রাশির ক্ষেত্রে; এখানে ইন্দিরাজী ও জ্যোতিবাবু উভয়ের রাশি হল মকর। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও মিল আছে। এজন্যই অনেকে প্রশ্ন করেন–এত যখন মিল তখন কি ইন্দিরা গান্ধীর মত উনিও আততায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হবেন? না, এখন আর সেরকম যোগ নেই। তবে আমি আগেও ব এবং পরেও ফলেছে যে তাঁকে পাটনায় অ হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছে। জ্যোতি বসু শনি এবং একাদশে লগ্নপতি বুধ ভাগ্যপ যুক্ত হয়ে বসে আছে। আর এরই শুভ ফ কোন অপঘাত মৃত্যু নেই। তবে ওনার ছক এটুকুই বলতে পারি যে, আগামী ১৯৯১ স দিকে শরীরের ক্ষেত্রে বিশেষ গোলযোগ সম্ভাবনা। এজন্য আমি তাঁকে পরামর্শ দি থেকে ১৪ রতির রক্তমুখী পলা পরতে। অ মঙ্গল দ্বাদশে কেতুযুক্ত এবং রাহু শনিদ্বা রক্তমুখী পলা পরলে শারীরিক দিক থে শুভ ফল পাবেন।

কলকাতার জ্যোতিষচক্র দিন দি করে বেড়ে চলেছে। আর এই বেড়ে চল চলেছে বিত্তবান পরিবারগুলির দিকেই অস্তিত্বের সংকটে জ্যোতিষমুখী হওয় বিত্তবান মানুষদের লাখ লাখ টাকা উ প্রতিষ্ঠা এবং স্ট্যাটাসের দৌড়ে টিকে থাক যাবে না এই প্রশ্নেই। আর কলকাতার জ্যো এন্তার সেসব জনকৌতুহলের মীমাং যাচ্ছেন। তবে জ্যোতিষীদের মধ্যেও এসে কেউ কেউ হাঁটছেন। সাধারণ মা জ্যোতিষবিচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দে বিশিষ্ট মানুষদের ভবিষ্যৎ গণনা করে এটা নিছক টাকা রোজগারের জন্য নয় ব তাগিদে; অন্তরের তাগিদে করতে বাধ্য এরকমই দুজন জ্যোতিষবিদ হলেন ঘোষ মণিমালাদেবী এবং জ্যোতিষ মহলের যোগজীবন।

মণিমালাদেবী আগামী লোকসভা রাজীব গান্ধীর পরিণতি এবং ব্রহ্মচারি যে দার্জিলিং–এর গোর্খাফ্রন্ট নেতা সুবাস ঘি সম্পর্কে দুটি চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যৎবাণী মণিমালা বলেছেন–আগামী নির্বাচনে রা বেশ ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ব্রহ্মচারি যোগজীবন বলেছেন–আগামী দি ঘিসিং–এর প্রাণ যাবে কোন দুর্ঘটনা দুজনেই লিখিতভাবে এই ফলাফল করেছেন। তা আলোকপাতের কাছে রইল। যোগজীবন–এর সঙ্গে বিশ্ববন্দিত রায় সম্পর্কে বলেছেন–১৯৮৯ সালের মাস এবং ১৯৯০ সালের প্রথম ৬ মা ওনার মৃত্যুযোগ বা ঐচ্ছিক কর্মত্যাগ ফলাফল সফল হোক বা না হোক জ্যো বক্তব্যগুলি লিখিত ভাবেই আমাদের কা

–রমাপ্রসাদ

ছবি: বিক
গোপাল দেবনাথ, সুস্মিতা চৌধুরী,লক্ষ্মীন্দ্রকু

তথ্য:
নাগরিক স

রকমারী ! পছন্দসই নানা রঙ !
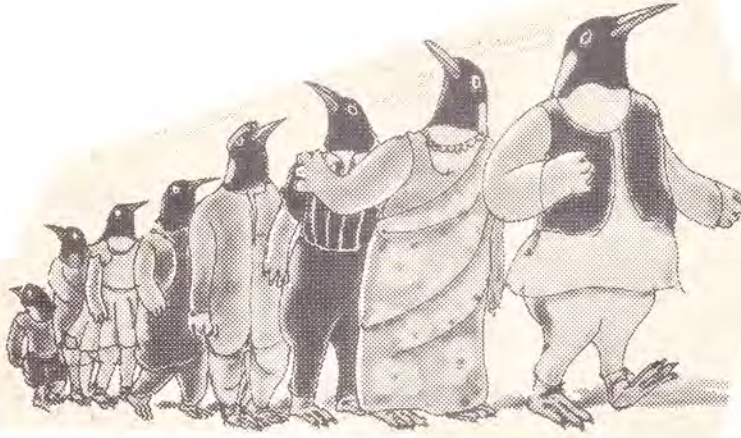
বিভিন্ন সুবিধাজনক সাইজের মনোজ্ঞ বিন্যাস। পছন্দেইস সুন্দর সুন্দর রঙ থেকে বেছে নিতেই যা দেরী। এত রকমারী রেফ্রিজারেটর পাওয়া শক্ত। নানারকমের প্রয়োজন মেটায়। নানারকমের সুবিধার উপযুক্ত। কিন্তু সবগুলির মধ্যেই যেটা অভিন্ন তা হল কেলভিনেটর দক্ষতা 'বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী' কম্প্রেসারের রূপে। এটি ঠাণ্ডা করে তাড়াতাড়ি, বরফ জমায় আরো তাড়াতাড়ি। তা বাইরে দিনের তাপমাত্রা যাই হোক না কেন। ন্যূনতম বিদ্যুৎ খরচ করে নিজের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে এটি কাজ করে যায়। ভোল্টেজের ওঠানামায় এর সুষ্ঠু কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

আপনি আরও আশ্চর্য হবেন দেখে যে, কী প্রচুর পরিমাণ জিনিসপত্র এতে আঁটে। কারণ অনেক ভেবেচিন্তে কোণা খামচি বাদ দিয়ে এটি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, ভেতরটা পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়।

শক্ত, পুরোটা স্টীলের তৈরী এবং পোক্ত এবিএস লাইনার থাকায় এটি বাইরে ও ভেতরে দুদিক থেকেই দারুণ মজবুত। একে দিয়েছে দীর্ঘজীবন।

সুতরাং পছন্দের যে সুযোগ আপনি এতে পাচ্ছেন, তাতে কেলভিনেটরই পছন্দ করুন।

ডি জি এস এণ্ড ডি হারের কনট্রাক্টে ২৮৬ লিটার ও ১৬৫ লিটারের মডেলে পাওয়া যাচ্ছে।

বিক্রেতা ও সার্ভিস দিচ্ছে :
এক্সপো মেশিনারি লিমিটেড
প্রগতি টাওয়ার, ২৬ রাজেন্দ্র প্লেস,
নিউ দিল্লী-১১০০০৮

ভবিষ্যৎবাণী

কুমারশ্রী মিত্র

চল্লিশের দশকের কথা। দেরাদুনের একটি বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র আমি। ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার কাজ করত। কোন ব্যাপারে আগাম কাউকে কিছু বলে দিলে তা ভবিষ্যৎবাণীর মত লেগে যেত। আমি কোনদিন অ্যাসট্রোলজির চর্চা করিনি। জ্যোতির্বিদ্যা কি তা আমি জানতাম না কোনকালেই। আসলে আমার ভেতরে কাজ করত অদ্ভুত একটা ইনটিউশন। আর সেই আমাকে আগাম কিছু বলিয়ে নিত। আমার ভেতরকার সেই শক্তি আমাকে ক্রমশই ভবিষ্যৎবক্তা করে তুলেছিল। আর লোকজনও বিরক্ত করতে শুরু করল।

জুনিয়র কেমব্রিজ কোর্সে ছিল 'জুলিয়াস সিজার'। পড়াতেন মিঃ ম্যাকেনটশ। ঐ নাটকে একটা চরিত্র আছে সুথসেয়ারের। আমি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতাম বলে মি· ম্যাকেনটশ ঐ চরিত্রটির নামে আমার নামকরণ করেছিলেন, সুথসেয়ার–অর্থাৎ ভবিষ্যৎবক্তা। সামান্য কোনও কিছু হলেই তামাশা করে তিনি বলতেন, তুমি কি বল হে সুথসেয়ার।

স্কুলে লাগল বিভ্রাট। কারো কিছু হলেই তারা আমাকে বিরক্ত করত ফোরকাস্টের জন্যে। তাছাড়া আর এক উৎপাত, আমার হাতের লেখাটা ছিল ভাল। তাই কোন ইনভিটেশন কার্ড, স্কুলের মেরিট সার্টিফিকেট, স্পোর্টস সার্টিফিকেট ইত্যাদিও আমাকে লিখে দিতে হত। এ জন্যে অনেকে আমাকে আবার 'মুন্সি' নামেও ডাকতে শুরু করল।

স্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ। আমাকে ফোরকাস্ট করতে হবে বৃষ্টি হবে কি না। স্কুলের পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসবে তাই নিয়ে তো পাগল করে তুলত সবাই। তবে একটা ব্যাপার ছিল লক্ষ্য করার মত। নিজের ইচ্ছায় যা বলতাম অবিকল তাই তাই ঘটে যেত। আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ জোর করে কিছু বলালে আবোল তাবোল বকে যেতাম।

সিনিয়ার কেমব্রিজ পরীক্ষায় ছেলেরা ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ পেপারটিকে যমের মত ভয় পেত। এই পেপারটিতে ফেল করলে গোটা পরীক্ষাতেই ফেল। কারণ, তখন নিয়ম ছিল, অন্য পেপারে ফার্স্ট ক্লাস পেলেও কেউ যদি ইংলিশ ল্যাংগোয়েজে ফেল করে তবে তাকে ফেল বলেই ধরা হবে।

এই পরীক্ষাটির আগের রাতে এক জেনারেল চিমনির ছেলে সুরিন্দর এসে আমার হাতে পায়ে ধরে বলল, কাল কি 'এসে' আসছে বলে দাও ভাই।

আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম। তারপর বললাম, ব্রিজ–এর ওপর আসছে। তবে সাবধান, ক্লাসে ব্রিজ–এর ওপর যে মডেল 'এসে' দিয়েছে সে মুখস্ত করে লিখতে যেও না, নির্ঘাত ফেল করবে

তখন ল্যাংগোয়েজে মুখস্ত লিখলে একেবারে নম্বর দেওয়া হত না। ল্যাংগোয়েজে প্রচুর প্র থাকত, পুরোপুরিই লিখতে হত নিজের ভাষায় সুরিন্দরকে আমি এই জন্যেই সাবধান কর দিয়েছিলাম। কারণ, আমি জানতাম, সুরিন্দ ল্যাংগোয়েজে ছিল খুব কাঁচা।

পরদিন পরীক্ষার হলে কোয়েশ্চেন পেপা হাতে পেতেই দেখলাম আমার ভবিষ্যৎবাণী মি গেছে। সুরিন্দরের দিকে তাকাতেই সে খুশি ডগমগ হয়ে হাসিমুখে মাটিতে হাত রেখে প্রণা করল। আমি হাত নেড়ে তাকে আবার বার করলাম। তা সত্ত্বেও ও মুখস্ত বিদ্যা ফলাতে গে এবং যথারীতি ফেল করল। ওর বাবা আমাকে বললেন, তুমিই আমার ছেলেকে মিস ডায়রেক করেছ···। সত্যিই আমার নিজেকে খালি দোষী মনে হতে লাগল। এই রকম কোন কোন ফোরকাস্টে জন্যে আমাকে পরে অনুতপ্ত হতে হয়েছে।

পরে পরে এই ফোরকাস্ট করার ব্যাপারট আমার মধ্যে ডেভেলাপ করে আরো বেশি রকমের কারো বাড়িতে হয়ত বসে আছি। টেলিফোনের রি শুনেই বলে ফেলতাম–আমার ফোন কিনা পরিচিতদের বাড়িতে তো বটেই, অপরিচিতদে বাড়িতেও এটা ঘটত।

ষাটের দশকের কথা। আমি আছি গ্র্যা হোটেলে। সেদিন জাপান এয়ারলাইনসের একট ফ্লাইট ছিল। ঐ ফ্লাইটে আমার এক বন্ধু ক্যালকাটা থেকে বোম্বে যাওয়ার কথা। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাকে বললাম আমার মন কু গাইছে, তুমি ঐ ফ্লাইটে যেও না···

সে হেসে বলল, দূর। তা ছাড়া ঐ ফ্লাইটে ন গেলে আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

আমি তখন আর কিছু বললাম না। কিন্তু তাকে লাঞ্চে ডেকে এত দেরি করিয়ে দিলাম যে তড়িঘড়ি এয়ারপোর্টে গিয়েও সে প্লেন ধরতে পারল না। এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে সে কি গালাগালি! আমি মুখ বুজে হজম করলাম। পরদিন কাগজে পড়লাম ঐ প্লেনটিই পুনার কাছে এক জায়গায় ক্র্যাশ করেছে। খবর পড়ে বন্ধুটি আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আমি তখন শুধু মিটিমিটি হেসেছিলাম।

এইভাবে কার অ্যাকসিডেন্ট, বাস অ্যাকসিডেন্ট, পিকনিক ট্র্যাজেডি ইত্যাদি কতবার ঘটেছে। সে সব ডিটেলে না বলে বরং একটা মজার ঘটনা বলি। ১৯৬০–এর ডিসেম্বরে দিল্লিতে আমি

গিয়ে উঠেছিলাম হোটেল জনপথ—এ। সেদিন একটা ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল। ট্যাকসির অপেক্ষায় আছি—হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বন্ধু রাণা গজেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে। প্রায় চোদ্দ বছর পরে দেখা। হোশিয়ারপুর জেলার মানসওয়ালে ওদের খুব বড় জমিদারী ছিল। আশ্চর্য, এতকাল পরেও তার চেহারাটি একেবারেই বদলায়নি।

তার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিল। গজেন্দ্র আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, আমার স্ত্রী। তারপর বলল, কাম—লেটস হ্যাভ এ ড্রিংক।

গজেন্দ্রও জনপথে উঠেছিল। জমিয়ে আড্ডা হল ওর ঘরে। পুরোনো বন্ধুদের খবরাখবর। কে কোথায় আছে। কেমন আছে। কি করছে। এরকম হাজার কথা হতে হতে এক সময় গজেন্দ্র তার স্ত্রীকে বলল, বুঝলে, স্কুলে ও ভাল ফোরকাস্ট করতে পারত। ওকে একবার হাত দেখাবে নাকি?

ভদ্রমহিলা হিমাচল প্রদেশের মেয়ে। একস্ট্রা অর্ডিনারী সুন্দরী। নম্রভাবে আমাকে বললেন, আপনি কি আমার হাত দেখবেন?

আমি হেসে বললাম, অফ কোর্স। হোয়াই নট। তবে আগে গজেন্দ্রর হাতটা একবার দেখি···।

গজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে বললাম, আরে গজেন্দ্র···তোর তো তিনটে বিয়ে···

শুনেই ভদ্রমহিলা তো হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমি বললাম, হাসছেন যে। এটা তো আপনার পক্ষে হাসির নয়। বরং শক পাওয়া উচিত ছিল···

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি যে রকম উদ্ভট কথা বলছেন···

আমি বললাম, ওর হাতে আছে তিনটে বিয়ে। আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। একমাত্র তৃতীয় বৌটিরই সন্তান হবে। তিন বৌ-ই সেই সন্তান শেয়ার করবে। এবং এও বলে রাখছি, যে, তৃতীয় বৌ—ই বিশাল সম্পত্তি আনবে।

এবার ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে একেবারে কার্পেটে লুটিয়ে পড়লেন।

আমি ভদ্রমহিলার এই হাসি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে কি ভদ্রমহিলা আমার কথায় কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

হাসি থামিয়ে ভদ্রমহিলা কৌতুক করেই বললেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাকে···কি রকম দেখতে···কোত্থেকে সম্পত্তি নিয়ে আসবে?

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও হেসেই জবাব দিলাম, হতে পারে আপনার মতই অর্থাৎ আপনার মতই সুন্দরী। আর, সম্পত্তি কোথা থেকে আসবে জানিনা তবে বিশাল ধন—সম্পদ নিয়ে আসবে, এটা নিশ্চিত।

গজেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, আর আমার হাতে কিচ্ছু নেই?

বললাম, আছে, তুমি জমি থেকে কিছু ধন পাবে।

দাদার অবস্থার জন্যে ললিত যখন আকারে ইঙ্গিতে আমাকেই দোষারোপ করছিল তখন ললিতের বৌ হাত দেখাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

তারপর বেশ কিছু কাল কেটে গেল। ১৯৮১—র শেষের দিকে আমাদের শহরে গজেন্দ্রর ছোট ভাই ললিত এল সেনাবিভাগের এরিয়া কমাণ্ডার হয়ে। '৪৭ সালের পর থেকে আমার সঙ্গে তাদের আর দেখা হয়নি। আমি শুধু এটুকুই জানতাম যে, ললিত আর্মিতে ঢুকেছে। স্বাভাবিকভাবে ললিতও আমার কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পার্টিতে দেখা। ও আর ওর বৌ। দুজনকে নেকস্‌ট উইক এণ্ডে আমার বাড়িতে খেতে ডাকলাম।

প্রসঙ্গতই গজেন্দ্রর কথা উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, খবর কি?

ললিতের গলায় উষ্মা ফুটে উঠল। বলল, আর খবর। তুমি না কি বলেছিলে, জমি থেকে ধন পাবে···তাই তিনটি বছর ধরে আমাদের মানসওয়ালের সমস্ত জমি জায়গা এবং বিশাল রাজবাড়ি খুঁড়িয়েছে পূর্বপুরুষের লুকোনো গুপ্তধনের সন্ধানে। সে জন্যেই আমাদের অমন রাজবাড়ি শুধুমাত্র ভগ্ন পাথরের স্তূপ ছাড়া এখন আর কিছুই নয়।

বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু সে আছে কেমন? করছেটা কি?

ললিত বলল, বহাল তবিয়তেই আছে। তারই ইলাকা থেকে একটা স্টোন কোয়ারিস—পাথরের খনি পাওয়া গেছে। তা থেকেই মাসে তার আয় এখন লাখ দুয়েক টাকা···।

আরে, আমি তো সেই কথাই বলেছিলাম।

সে তুমি যাই বল। আমরা কিন্তু সবাই প্রাসাদ নষ্ট হওয়ার জন্যে প্রায় কুড়ি বছর ধরে তোমাকেই গালাগাল দিচ্ছি।

আর খবর?

তোমার বলার দরুনই তিনটে বিয়ে করেছে। আর সেই আঘাতে বাবা মারা গেছেন।

ছেলেপুলে···

হয়েছে হয়েছে, তৃতীয় বৌয়েরই ছেলে হয়েছে।

দাদার অবস্থার জন্যে ললিত যখন আকারে ইঙ্গিতে আমাকেই দোষারোপ করছিল তখন ললিতের বৌ হাত দেখাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমি দেখলাম। তারপরে তারা যতদিন শহরে ছিল ললিতের সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম, বউকে দেখাশোনা কর। ওর শরীর খুবই খারাপ। এ·আই·এম·এস—এ কোন স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়ে চেক্ আপ করাও।

ললিতের দুই মেয়ে। একজন গ্র্যাজুয়েট অন্যজন পড়াশুনা করছে। দুজনেই ফুটফুটে সুন্দরী। প্রথম মেয়েটির বিয়ে হওয়ার পর ললিতের বৌ হার্ট ফেল করে মারা গেল। এ খবর পেয়ে গজেন্দ্র তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে এসে হাজির হল। শ্রাদ্ধাদি পর্ব শেষ হবার পর একদিন সবাই বসে গজেন্দ্রর প্রেডিকশনের বিষয় নিয়েই কথাবার্তা বলছিলাম। গজেন্দ্রর স্ত্রী এক সময় আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। ভেতরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীকে যে ঘটনা শুনিয়েছিল গজেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী পরে তা আমি শুনেছিলাম আমার স্ত্রীর কাছেই। ব্যাপারটা হল এই—হোটেল জনপথে যখন গজেন্দ্রর হাত দেখে প্রেডিকশন করি তখন যে ভদ্রমহিলাকে দেখি আসলে তিনি তখনও গজেন্দ্রর স্ত্রী হননি। পরবর্তীকালে ঐ মহিলাই গজেন্দ্রর তৃতীয় স্ত্রী। সেসময় তাঁরা মাঝে মাঝে লুকিয়ে দিল্লিতে মিট করতেন। যাই হোক, ভদ্রমহিলা হেসে লুটিয়ে পড়েছিলেন কারণ, সত্যিই তাঁর নিজের কোন সম্পত্তি ছিল না। তাঁর এক মামা আমেরিকায় থাকতেন। এদের বিয়ের পরেই তিনি মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না। ফলে তাঁর বিশাল সম্পত্তির মালিকানা পান ভদ্রমহিলা।

ললিত এরপর একসটেনসন নিয়ে আমাদের শহরেই থাকতো। ওর স্ত্রীর শ্রাদ্ধের পর বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি আর ছোট মেয়ে সিমলায় বোর্ডিংয়ে চলে গিয়েছিল। মাস ছয়েক পরে একদিন হঠাৎ আমার ললিতের হাত দেখার ইচ্ছা হল। হাত দেখে বললাম, তোমার তো শিগগির আর একটা

বিয়ে হে! প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও। সময় কিন্তু বেশি নেই।

শুনে সে এমন ক্ষেপে উঠল যে আমি কি করব ভেবে পেলাম না। সদ্য বৌ মরেছে তার। এখন সে ভাবতেই পারে না যে আবার বিয়ে করবে। আমি তবু ওকে বোঝালাম, ললিত তুমি তোমার মেয়েদের বোঝাও যে তোমার একটা বিয়ে করা দরকার। কারণ, তুমি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছ।

ও বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ। এই বাহান্ন–তিপ্পান্ন বছর বয়েসে আবার বিয়ে করব!

এরপর আর কথা এগোয় না। তখনকার মত সব ধামাচাপা পড়ে যায়।

আমার এক জানাশোনা ভাল ছেলে ছিল। ললিতের ছোট মেয়ের জন্যে আমি সম্বন্ধ করলাম এবং তাড়াহুড়ো করে বিয়েও হয়ে গেল।

একজনের বিয়ে হয়েছিল কলকাতায় আর একজনের দিল্লিতে। কার্যসূত্রে দুটো জায়গাতেই যাতায়াত ছিল আমার, এবং মেয়েদুটির সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল। আমি দুজনেরই ব্রেন ওয়াশিং শুরু করলাম। বললাম, দেখ, তোমাদের বাবা বড় একা হয়ে গেছে। বয়েস এমন কি আর হয়েছে! তোমরা তাকে আবার বিয়ে করতে বল।

প্রথম প্রথম দুই মেয়েই ভীষণ চটে যেত।বলত, ইউ আর এ ভেরি ব্যাড, আঙ্কল। এই বয়েসে আমাদের নতুন মা আনতে চাও। লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে।

আমি জামাইদেরও বোঝাই। তারাও ব্যাপারটাকে ঠিক ভালভাবে নেয় না।

ইতিমধ্যে ললিতের পোস্টিং হল দিল্লিতে। মাঝে মাঝে আমাকে হাত দেখিয়ে বলে, আর কোন প্রমোশন আছে আমার?

আমি বলি, আগে বিয়ে, পরে প্রমোশন।

ও বলে, ফের বাজে কথা!

কিন্তু কথাটা যে বাজে নয় তা প্রমাণিত হল মাস ছয়েক পরে। শুনলাম, ললিত বিয়ে করেছে। আর তার পরেই ও পেয়েছে নেক্স্ট প্রমোশন।

ললিতের বিয়ে তা প্রায় বছর চারেক হয়ে গেছে। বিয়ের পর থেকে ললিত আমার সঙ্গে দেখা করেনি। কি জানি কেন, সুযোগ হলেও এড়িয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে দিল্লির নিউ ফ্রেন্ডস কলোনীতে আমার এক ক্লাস ফ্রেন্ড এবং এক্স আর্মি অফিসার রাজেন্দ্রর বাড়িতে একটা পার্টি ছিল। সেই পার্টিতে ললিতের প্রেডিকশনের ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল। হঠাৎ এক হ্যান্ডসাম কর্ণেল প্রায় জোর করে লন থেকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর হাত দেখে দিতে হবে। আমি বোঝালাম, দেখুন, আমি হাত দেখি নিজের ইচ্ছায়। উনি তবু নাছোড়বান্দা। বললাম, আমি চশমাটা আনতে ভুলেছি। উনি জোর করতে লাগলেন। নিরূপায় হয়ে হাত দেখে বললাম, কর্ণেল, এ কি করছেন! আপনি এ বয়েসে এক অষ্টাদশীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছেন! ব্যাপারটা

কপট গাম্ভীর্যে বললাম, ছেলেমেয়ে যখন পাঁচটাই হয়েছে, তখন হাত না দেখেই বলে দিচ্ছি, তোমার ভবিষ্যৎ এবার অন্ধকার!

কিন্তু ভাল নয়। শুনেই বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে উঠে কর্ণেল হাত ছিনিয়ে নিলেন।

এরপর আমি টয়লেটে যাই। ফিরে আসতে আমার হোস্ট রাজেন্দ্র আমাকে লনে জিজ্ঞেস করল, কর্ণেল কোথায়?

আমি বললাম, ঠিক জানিনা।

রাজেন্দ্রর মেয়ে বিবাহিতা। সে কাছেই ছিল। বলল, কর্ণেল পিছন দিক দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

রাজেন্দ্র আমাকে বলল, তুমি কর্ণেলের হাত দেখে কি বলেছ বলত?

আমি রাজেন্দ্রকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব বললাম। তার মেয়ে কিন্তু ঠিক শুনে ফেলেছিল। বলল, আঙ্কল ঠিকই বলেছেন। কেউ না জানুক, অন্তত আমি জানি, উনি মহা অসভ্য লোক। ওনাকে পার্টিতে ডাকতেই আমার আপত্তি ছিল।

আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে অনেকেই জেনারেল হয়েছে। তাদের একজনকে আমি বলেছিলাম, তোমার পুজো আর্চায় এত ঝোঁক হয়ে যাবে যে বিয়ে করার ফুরসৎ পাবে না। সে আজও অবিবাহিত। আর একজনকে বলেছিলাম, তুমি ভারতীয় সৈন্য নিয়ে অন্য দেশে লড়তে যাবে। তাও সত্যি হয়েছে।

এবারে আমাদের পাড়ার ফণীর কথা বলি। সে বেশি লেখাপড়া করেনি। রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকেছিল।

সে একদিন এসে বলল, তুমি নাকি হাত দেখটেক–বলতো, আমার কিছু হবে টবে জীবনে?

হবে ফণী হবে।

কি হবে?

তুমি কুলি হয়ে ঢুকেছো তো। একদিন তুমি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পাস পাবে।

আর?

ভাল বৌ হবে–সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট।

ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি এইট পাশ আর আমার বৌ হবে গ্র্যাজুয়েট!

দেখে নিও, হবে। তবে সাবধান, পাঁচটি পুত্র-কন্যা যোগ আছে কিন্তু। সেটা যেন না হয়।

বছর ষোল বাদে সে হঠাৎ এসে হাজির। তার যে হাত দেখেছিলাম আমার মনেই ছিল না। সে বলল, যা যা বলেছিলে সব অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। সত্যি ভাই। কিছু ক্ষমতা ধর তুমি।

আবার হাত দেখিয়ে ফণী বলল, এবার কি হবে, বল দেখি?

কপট গাম্ভীর্যে বললাম, ছেলেমেয়ে যখন পাঁচটাই হয়েছে, তখন হাত না দেখেই বলে দিচ্ছি, তোমার ভবিষ্যৎ এবার অন্ধকার!

এমনি আরো কত ঘটনা। বলে শেষ করা যাবে না। একবার বোম্বের তাজ হোটেলে আমাদের প্রিয় যাদুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উনি একটি মালটি ন্যাশন্যাল কোম্পানির ডিরেকটর। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী মালিনী। হোটেলের ঘরে বসে বিয়ার খাচ্ছি। মালিনী টেনে হিঁচড়ে বেডরুমে নিয়ে গেলেন। –আপনাকে হাত দেখে দিতে হবে।

আমি হাত দেখে বললাম, আপনাদের তো ছাড়াছাড়ির কথা···আমাকে শেষ করতে না দিয়েই উনি হাতটা টেনে নিলেন। পরে শুনি, ওঁদের দাম্পত্য জীবনে এমনিতেই খিটিমিটি চলছিল। ওঁদের এক আত্মীয় ব্যাপারটা জানতেন। তাই ওঁর সন্দেহ হয়েছিল আমি নিশ্চয়ই সেখান থেকে জেনেছি। উনি আমার পুরো প্রেডিকশন শুনতে চাননি। আমার বক্তব্য ছিল, ছাড়াছাড়ির কথা কিন্তু ছাড়াছাড়ি হবে না।

আর একটি অন্য ব্যাপার ঘটেছিল শিল্পপতি ইন্দ্রজিতের ক্ষেত্রে। দিল্লির কাছে মজফফর নগরে থাকে। তার ঠিকুজিতে নাকি বিদেশ যাত্রা নেই। এ তো মহাবিপদ···।

সে হাত দেখিয়ে বেড়ায় চতুর্দিকে। আমি একদিন হাত আর ঠিকুজি দেখে বললাম, কে

৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

চিরতরুণ অশোককুমার

স্থান: বোম্বে টকিজের এডিটিং রুম। সৌম্যদর্শন এক তরুণকে দেখা গেল এডিটিং টেবিলের তন্ময় হয়ে ফিল্ম এডিট করার কাজ দেখছেন। প্রবেশ করল কোম্পানীর বেয়ারা। সে যুবককে বলল, সাব, আপকো হিমাংশু রায় সাহাবনে বুলায়া। শুনতেই যুবকের যেন চেহারা পাল্টে গেল। কপালে চিবুকে ঘাম জমে উঠল। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, ঠিক বলছ তো? আমাকে ডেকেছেন? হ্যাঁ সাব।

আকাশ–পাতাল ভাবতে ভাবতে যুবক হিমাংশু রায়ের কামরায় এসে ঢুকলেন। কামরায় তখন বসে কথা বলছিলেন বোম্বে টকিজের মালকিন দেবিকারাণী রায়, হিমাংশু রায় আর এক জার্মান ডাইরেক্টর ফ্রান্জ অস্টিন।

যুবককে দেখে, হিমাংশু রায় ইশারায় বসতে বললেন। তবে যুবকের বসার সাহস হল না। দুরু দুরু বুক নিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। নিজেদের মধ্যে কথা বলা শেষ করে হিমাংশু রায় যুবকের দিকে তাকালেন এবং একবার দেবিকারাণীর মুখের দিকে চেয়ে যুবককে বললেন–

শোন, আমাদের ছবির হিরো–মানে যে হিরোর কাজ করছিল, সে ফিল্ম ছেড়ে চলে গেছে। ওর জায়গায় তোমাকে হিরোর রোল করতে হবে। যেন বাজ পড়ল। ভীষণ চমকে গিয়ে যুবক বলল: আমি হিরো। কি বলছেন স্যার?

যুবকের কোনও আপত্তি শুনলেন না। হিমাংশু রায়। তাঁর নির্দেশ, ঐ যুবককেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

চিরতরুণ অশোককুমার

অশোককুমার আর শোভা, বিয়ের দিনটিতে

সম্প্রতি দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন তিন প্রজন্মের চিত্রাভিনেতা অশোককুমার। চিরতরুণ অভিনেতা আর মানুষ অশোককুমারকে নিয়ে এক অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন।

অশোককুমার, পারিবারিক পরিবেশে

ছবি: রথাজিৎ ঘটক

আপনার বাচ্চার বয়স যদি ২ থেকে ১০ বছরের

আপনার আদরের ছোট ছোট বাচ্চারা। এই বয়সে ওদের আপনার স্নেহ-ভালবাসার যেমন দরকার থাকে, তেমনি দরকার থাকে যথাযথ পুষ্টিরও। আজ সঠিকভাবে পুষ্টিতে ভরিয়ে তুললে ওদের আগামীকালও সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে।

বাচ্চারা ২ বছরের হলে, ওদের তখনকার ওজন জন্মের সময়কার ওজনের চেয়ে ৩·৩ গুণ বেশী হওয়া উচিত। তাই, তখন ওদের একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় দ্বিগুণ (তাদের নিজেদের শরীরের অনুপাত হিসাবে) প্রোটিন দরকার। মানে, উঁচুমাত্রার প্রোটিনযুক্ত আহার তখন ওদের সবচেয়ে বেশী দরকার। তাই, আহারের পরিপূরক হিসাবে ওদের খাওয়ান ক্যাডবেরিস্ নতুন এনরিচ, এক সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আহার। এনরিচ সহজে হজম হয়, স্বাদেও দারুণ মুখরোচক। কাপ পিছু ৩ চামচ এনরিচ গুলে, দিনে এক কাপ ক'রে ওদের খাওয়ান। দুধ মেশাতে হবে না, শুধু গরম জল ঢেলে নেড়ে দিন। এনরিচ থেকে ওরা ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ওদের আয়রন ও ক্যালসিয়ামের সম্পূর্ণ সুপারিশকৃত দৈনিক অনুমোদন (আর ডি এ) তো পাবেই, ওদের প্রোটিন ও ভিটামিনের ১/৩ ভাগ প্রয়োজনেরও পূরণ হবে।

বাড়বৃদ্ধির বছরগুলি (৪-৬)

আপনার বাচ্চারা তরতরিয়ে বাড়ছে, কাজে কর্মে ওদের দারুণ তৎপর থাকতে হচ্ছে। এই সময়ই ওদের অনেক বেশী পুষ্টির দরকার থাকে ব'লে এক কাপের জায়গায় দিনে দু কাপ এনরিচ খাওয়ালে শুধু ঐটিই ওদের ৩০০ ক্যালোরি যোগাবে। এনরিচ-এ ভিটামিন এ (চোখের জন্যে), ভিটামিন ডি (হাড় শক্ত করতে), জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম ও মলিবডেনাম (শরীরের এনজাইম প্রক্রিয়ার জন্যে অত্যাবশ্যক) সমেত ২৬টি অত্যাবশ্যক পুষ্টিকর উপাদান থাকে।

এই বয়সেই আহারের পরিপূরক হিসাবে ওদের ৩ কাপ ক'রে এনরিচ খাওয়ান (১০ বছর পার করলে ৪ কাপ ক'রে খাওয়ান)। এনরিচ ওদের শরীরের ঐ চরমভাবে নিঃশেষ হতে থাকা জীবনী-শক্তির পূরণ করবে এবং পুষ্টির যাতে

বাড়বৃদ্ধিকে

মধ্যে হয় তাহলে, এই বিজ্ঞাপনের প্রতিটি অক্ষর পড়ুন

এতটুকু "ঘাটতি"
না থাকে তাও
সুনিশ্চিত করবে।

"নতুন" এ নরিচ

বাড়বৃদ্ধির জন্যে পুষ্টিগুণে
ভরপুর এ পানীয়-আহার

নিবেদন করছে ক্যাডবেরিস্‌,
গত ১০০ বছরের ওপর ধরে
যাদের, পানীয়-আহার তৈরীতে
বিশেষজ্ঞ বলা হয়।

এ হজম হয় সহজে, মুখরোচক
স্বাদে। ২৬টি অত্যাবশ্যক
পুষ্টিতে ভরপুর। পাবেন দুটি
স্বাদগন্ধে :
চকলেট
ও ভ্যানিলা
এবং দুরকম প্যাক সাইজে :
২০০ গ্রাম ও ৫০০ গ্রাম।
এনরিচ গরম জলে
খুব সহজে গুলে যায়,
তাইতো এ তৈরী করা যায়
এক্কেবারে. . .ঝট্‌ করে।
সুতরাং মমতাময়ী মা হিসাবে
এই তিনটি শব্দ সবসময় মনে

পাওয়া যায় চকলেট
মজাদার স্বাদে ভ্যানিলা

দুধ মেশানোর দরকার নেই

রাখবেন, যা আপনার বাচ্চাদের
মধ্যে ঘটাবে বিরাট পার্থক্য :
দেখাশোনা, বাড়বৃদ্ধি, এনরিচ।

পুনঃ –
**"আজকের
শিশুদের . . .
প্রয়োজনীয়
পুষ্টি"-র ওপর**
লেখা বিনামূল্যের
পুস্তিকার জন্যে
এখানে লিখুন : ক্যাডবেরিস্‌
চাইল্ড নিউট্রিশন সেল"
হিন্দুস্থান কোকো প্রডাক্টস, লিমিটেড,
১৯, বি.দেশাই রোড, বোম্বাই-৪০০০২৬.

বিকশিত করে, যখন সবচেয়ে বেশী দরকার পড়ে।

LINTAS HCP EN 2 2540 BG

মুখ্য দপ্তর এখন কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায়

আনন্দমার্গ : হেডকোয়ার্টার পরিবর্তনের নেপথ্যে

সংগঠনী শক্তিকে আরও সংহত করার উদ্দেশ্যে

রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলির আক্রমণ ও পুলিশ-প্রশাসনের দমনপীড়নের হাত থেকে বাঁচতেই কি কলকাতা সংলগ্ন তিলজলা থেকে পুরুলিয়ার ৮৪ তন্ত্রপীঠে আনন্দমার্গীদের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরকরণ? একটি তথ্যনির্ভর আলোকপাত।

মড়ার খুলি এবং জ্যান্ত সাপ নিয়ে 'তাণ্ডবনৃত্য' প্রভৃতি উদ্ভট কার্যকলাপ এবং অনুশাসন যে আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীকুলকে জনসাধারণের কাছে সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে বিতর্কিত সেই আনন্দ-মার্গীরা সম্প্রতি স্থির করেছেন তিলজলা থেকে তাঁদের আন্তর্জাতিক হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যাবেন পুরুলিয়াতে। মূলত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে রয়েছে দুটি উদ্দেশ্য—প্রথমত পুলিশ এবং বর্তমান মার্কসবাদী রাজ্য প্রশাসনের ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচার থেকে সংগঠনকে আড়ালে রাখা, দ্বিতীয়ত পুরুলিয়ার অপেক্ষাকৃত কম সি পি এম সমর্থিত আদিবাসী মহল্লায় নিজেদের সংগঠনকে বাড়িয়ে তোলা।

তিলজলার হেড কোয়ার্টারকে পুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার কাজে আনন্দমার্গীরা ইতিমধ্যেই অনেক-খানি এগিয়ে গেছেন। পুরুলিয়া শহর থেকে ৫০ কি. মি. দূরে প্রায় ৫৩ একর জায়গা নিয়ে আন্তর্জাতিক হেড কোয়ার্টার তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজও শুরু হয়ে গেছে। যত দ্রুত সম্ভব মার্গীরা এই স্থানান্ত-করণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অন্যদিকে আনন্দমার্গীদের হেড কোয়ার্টার পুরুলিয়া নিয়ে যাওয়ার খবরে মার্কসবাদীরা নড়েচড়ে বসেছেন। টনক নড়েছে পুলিশ প্রশাসনেরও। তাঁরা এখন বিশেষভাবে তদন্ত করে দেখছেন আনন্দমার্গীদের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে মূল উদ্দেশ্য কি?

আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, আগে আনন্দমার্গীদের প্রধান কার্যালয় কিন্তু ছিল পুরুলিয়াতেই। পরে প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে আসে কসবা-তিলজলায়। মূলত সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে নজর রেখেই পুরুলিয়া থেকে হেড কোয়ার্টার সরিয়ে আনা হয় তিলজলায়। পুনরায় সেই পুরুলিয়াতেই হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া বিষয়ে খুব স্বাভাবিক কারণেই পুলিশ, রাজ্য প্রশাসন তথা জনসাধারণের আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের ধারণা, প্রধানত আনন্দমার্গীদের সি. পি.এম. এবং পুলিশের চোখের আড়াল করতে হেড কোয়ার্টার পুরুলিয়ার্তে নিয়ে যাওয়ার পরি-কল্পনা করা হলেও আরেকটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকাও মোটেই অসম্ভব নয়। অন্যান্য জেলাগুলির সঙ্গে পুরুলিয়াতেও যেখানে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন

দানা বাঁধছে, সেখানে ঝাড়খণ্ডীদের বিশেষভাবে সাহায্য দানের জন্য আনন্দমার্গীরা হেড কোয়ার্টার পুরুলিয়া সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে কারো কারো অনুমান। পুলিশের আশঙ্কা আনন্দমার্গীরা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে সাহায্য করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই আশঙ্কার পেছনে রয়েছে সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। সম্প্রতি পুরুলিয়া বনবিভাগের অফিসাররা হানা দিয়ে কয়েকজন আনন্দমার্গীর কাছ থেকে লেজার গান, ইউনাইটেড স্টেটসে তৈরি দুটি রাইফেল এবং প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেন। আনন্দমার্গীদের এইসব অস্ত্র ঝাড়খণ্ডীদেরকে যোগান দেবার আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিৎ নয় বলে পুলিশ মহলের ধারণা। এই পুলিশী তথ্য আনন্দমার্গীরা মিথ্যা এবং সাজানো বলে উল্লেখ করেছেন।

তিলজলা থেকে পুরুলিয়াতে হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যাবার পেছনে জড়িয়ে আছে আনন্দমার্গীদের একটি গভীর কষ্টবোধ এবং ক্ষোভ। কসবা তিলজলা হেড কোয়ার্টারের কাছে ১৯৮১ সালের ৩০ এপ্রিল বিজন সেতুর উপর ১৭ জন আনন্দমার্গীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় সি.পি.এম. এবং মার্গীদের মধ্যে প্রবল বিদ্বেষের জন্ম হয় সেই বিদ্বেষ ধীরে ধীরে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। মার্কসবাদীরাও আনন্দমার্গীদের মধ্যে অহিনকুল সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হয় পুলিশের অত্যাচার। আনন্দমার্গীদের প্রকাশ্যে অপমানিত হতে হয়। অনুশাসন অনুযায়ী মার্গীদের মড়ার খুলি এবং জ্যান্ত সাপ নিয়ে তাণ্ডব নাচ যেখানে অবশ্যকর্তব্য সেখানে পুলিশ আনন্দমার্গীদের এই তাণ্ডব নৃত্যে প্রবল বাধা দেয়। মার্গীরা সুষ্ঠুভাবে নিজেদের সাধনক্রিয়া করতে গিয়ে বাধা পান তো বটেই, গোয়েন্দা পুলিশ অষ্টপ্রহর এঁদের ধর্মীয় কার্যকলাপে আপত্তি তোলেন। সর্বভারতীয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দ্য উইক'–এ আনন্দমার্গীদের দীর্ঘদিন অত্যাচারিত হবার রিপোর্ট বের হয়। সেখানে আনন্দমার্গীদের হেড কোয়ার্টার বদল করার সিদ্ধান্ত বিষয়েও কিছু আগাম ইঙ্গিত ছিল। তার উপর ১৯৮৭ সালে দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডের একটি কবরস্থান থেকে তিন আনন্দমার্গীকে গ্রেপ্তার করা হয়, কারণ হিসেবে দেখান হয়, তাণ্ডব নৃত্যের জন্য তাঁরা মড়ার খুলির সন্ধান করছিলেন। আনন্দমার্গীদের ধারণা, শুধু পুলিশ বা সি পি এমই নয়, বহু সাধারণ মানুষও আনন্দমার্গীদের বিষয়ে বিরূপ ধারণা পোষণ করছেন স্রেফ অপপ্রচারের কারণে। আর এই ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছে মূলত পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসনের তরফে আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে লাগাতার ক্রমবর্দ্ধমান অপপ্রচার। স্বাভাবিক কারণেই আনন্দমার্গীদের অধ্যাত্মমূলক সাংগঠনিক কাজকর্ম তিলজলা থেকে সুসম্পন্ন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আনন্দমূর্তিজী : আনন্দমার্গপ্রধান

আনন্দমার্গীদের ধারণা, শুধু পুলিশ বা সি পি এমই নয়, বহু সাধারণ মানুষও আনন্দমার্গীদের বিষয়ে বিরূপ ধারণা পোষণ করছেন স্রেফ অপপ্রচারের কারণে।

এদিকে আনন্দমার্গীদের প্রধান কার্যালয় কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করা হলেও, আনন্দমার্গের প্রতিষ্ঠাতা প্রভাত রঞ্জন সরকার (আনন্দমূর্তিজী)–এর বাসভবন লেক–গার্ডেন্স থেকে পুরুলিয়ায় যাচ্ছে না। এ ঘটনার মধ্যেও কেউ কেউ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন। গোয়েন্দা দপ্তরের ধারণা, পুরুলিয়ার হেড কোয়ার্টার আনন্দমূর্তিজীর নির্দেশে এখান থেকেই চলবে।

আনন্দমার্গী নামের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু বাংলা বা ভারতের নয়, আজ সারা বিশ্বের প্রায় ৪০ লাখ মানুষ এই ধর্মীয় সাধনায় সামিল হয়েছেন। শুধু বিপুল ভক্ত সংখ্যাতেই শেষ নয় সন্যাস, রাজনীতি আর গোপনীয়তার যে বিতর্কিত দলিলটি পড়তে গেলে শুধু হত্যা, রক্ত ও বলিদানের পর্ব চোখে পড়ে তা হল আনন্দমার্গ। পৃথিবীর ২৭১টি দেশে হাতে মড়ার খুলি, জ্যান্ত সাপ ও ধারালো ছোরা নিয়ে যে গেরুয়াধারীর দল নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য নাচতে নাচতে এক নয়া আধ্যাত্মিক রাজত্বের কথা বলে তাঁরাই আজকের দুনিয়ার সব থেকে বিতর্কিত সন্ন্যাসী বাহিনী আনন্দমার্গী। কেউ বলে সি.আই.এ.র দালাল, কেউ বলে গোপন সশস্ত্র মিলিশিয়া, কারোর গুজব ছেলেধরা, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি.বি.আই. এর মতে রাষ্ট্রদ্রোহীর দল নয়া শাসন ও নয়া তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় গেরুয়া পোশাকের আড়ালে জঙ্গী রাজনৈতিক বাহিনী। অথচ এদের সামনাসামনি দেখলে নিয়মনিষ্ঠ একদল সমাজসেবী সন্ন্যাসী ছাড়া আর কিছুই মনে হয়না।

ভারতবর্ষে ২৫ লক্ষ সক্রিয় আনন্দমার্গী থাকা সত্ত্বেও যাদের দেখে সাধারণ মানুষ ভয় ও দূরত্বের পাহাড় তৈরি করে, একাংশ প্রকাশ্য দিনের আলোয় বাংলার রাজধানীতে ১৯ জন সন্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মারে, উত্তেজনায় আক্রমণ করে সাধনক্ষেত্র। তাঁদের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি এবং কৌতুহলোদ্দীপক জীবন যাপনের সরজমিন খবর নিতে চলে গিয়েছিলাম আনন্দমার্গের প্রথম কেন্দ্রিয় দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার আনন্দনগরে।

পূবে গোমা–মুরি রেলপথ ও পশ্চিমে ভাগুদি লাইনের মাঝে বিহারের সীমান্ত ছুঁয়ে ১,৩০০ একরের আনন্দনগর। একদিকে ৫ হাজার আদিবাসীর পাহাড়ী গ্রাম 'চিতম্' ও অন্যদিকে গোয়াই নদীর তীরে বাগলতার পাশে আনন্দমার্গীদের প্রধান তীর্থক্ষেত্রটি ২৫ বছরের ঐতিহ্য বহন করে আছে।

আনন্দনগরে কথিত, গড় জয়পুরের রাজা স্বর্গত রঘুনন্দন সিং এর পত্নী রানী প্রফুল্ল কুমারী দেবী এই তন্ত্রাশ্রম তৈরি করতে আনন্দমর্গের মহাসদ বিপ্র শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজীকে ওই ১,০০০ একর জমি দান করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সেটলমেন্ট রেকর্ড ও পরচা মতে দান করা জমি মাত্র ১৭০ একর বাকি ৮৩০ একর জমি সরকারি খাস এবং জবরদখল করা।

৪২টি ইউনিট, ২৭টি বিল্ডিং এবং ১টি কলেজ নিয়ে এই কেন্দ্রিয় দপ্তরটি কাজ শুরু করে ১৯৬৭ সালে। পুন্দাগ রেলওয়ে স্টেশনের ১ মাইল দূরে স্কুল, কলেজ, শিশুনিকেতন, বৃদ্ধাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, হসপিটাল, ধ্যানমন্দির, তন্ত্রক্ষেত্র ইত্যাদি ৪০টি কর্মকাণ্ডের সুশৃঙ্খল নিয়মবদ্ধ চলাফেরা একটি সুসংবদ্ধ কর্মযজ্ঞের রূপ নিয়েছে 'বাবা নাম' কেবলম্' মহামন্ত্রে। পৃথিবীর আনন্দমার্গীদের এই সেন্ট্রাল মাস্টার ইউনিটের বর্তমান পরিচালনভার রয়েছে রেক্টর–মাস্টার সুনীতানন্দ অবধূতের হাতে।

মার্গগুরু আনন্দমূর্তি বলেছেন, 'এককালে এই জায়গাই ছিল বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দুদের তন্ত্রসাধন পীঠ। এখানে ৮৪টি সিদ্ধ তন্ত্রপীঠ আছে। সাধু

কপিলের নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম কপিল-পাহাড়।' তাই আনন্দমার্গের মূল ও প্রধান ব্যক্তি-লক্ষ্য 'মানসিক, ও আধ্যাত্মিক-শক্তিসক্ষম মানুষ' গড়ে তুলতে বেছে নেওয়া হয় এই নিরিবিলি তপস্যাক্ষেত্রটি

৪৩ জন সন্ন্যাসী, ১৯ জন কর্মচারী ও ৫০০ ছাত্রছাত্রী আনন্দনগরের স্থায়ী বাসিন্দা। তারা আনন্দ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বরূপানন্দ অবধূত এবং সংস্কৃতি পত্রিকা 'আনন্দরেখা'র সম্পাদক কীর্তানন্দ অবধূতের মতই বিশ্বাস করে– 'আনন্দ-মার্গ বিশ্বের তন্ত্রসাধনার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় সেবা প্রতিষ্ঠান'।

ঋষি পতঞ্জলির যোগদর্শন অনুসারি আনন্দ-মার্গের জন্ম ১৯৫৫ সালের শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে স্রষ্টা বিহারের জামালপুরের প্রাক্তন রেলকর্মচারী শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার ওরফে 'বাবা' তথা 'আনন্দ-মূর্তিজী'। ১৯৫৪ সালের ৭ নভেম্বর তিনি আত্মোন্নতি ও মুক্তিলাভের জন্যে তন্ত্র নির্দিষ্ট পথে যাওয়ার মতবাদ প্রচারে 'আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ' তৈরি করেন

আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের ১০৮ দফা অনুশাসন এবং গৃহী ভক্তিমার্গীদের ১৬ দফা নিয়মকানন মেনে চলতে হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে আবার ২ রকম ভাগ। তন্ত্রদীক্ষিত আচার্যদের ৩২ রকমের নিয়ম ও তন্ত্রস্বীকৃত অবধূতদের ৩৬ দফা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। প্রত্যেককে সারা-দিনে ৪ বার সাধনায় বসতে হয়। দিনরাতে ৪ বার খাওয়াদাওয়া, ৪টি আইটেম এমনকি মাসিক নিয়মবদ্ধ উপবাসও ৪ দিন এটিই 'আনন্দ-সাধনা'র বৈশিষ্ট্য। গৃহী ভক্ত, সমর্থক ও ভক্তি প্রধানদের ব্যক্তিগত আয়ের ২ শতাংশ দান হিসাবে সংঘে দান করতে হয়।

আনন্দমার্গ সাংগঠনিক নিয়মে পৃথিবীকে ৯টি সেক্টরে ভাগ করেছে। দিল্লি, কায়রো, নাইরোবি, বারলিন, ওয়াশিংটন, জরজটাউন ম্যানিলা, হংকং ও সিডনি (সুবা) এই ৯টি সেক্টরে আনন্দমার্গের স্বনাম, বেনামে ৮০টি সংগঠন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে কাজকর্ম করে। ভারতবর্ষ দিল্লি সেক্টরের অধীন। ভারতে ১৬টি মুখ্য সংগঠন ছাড়াও প্রদেশভিত্তিক ৪২টি সমাজ আছে। (আমরা বাঙালি, ভোজপুরী সমাজ, কন্নড় সমাজ, আসাম বোরো সমাজ, অসি পাঞ্জাবী সমাজ ইত্যাদি)। একমাত্র পি.বি.আই.ও তার অধীন ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক ফেডারেশনগুলি ও ৪২ টি সমাজ ছাড়া বাকি সবই সেবামূলক

আনন্দমার্গ পরোপুরি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান কিন্তু স্রষ্টা আনন্দমূর্তিজী ওরফে পি.আর. সরকার আনন্দমার্গ সৃষ্টির ৫ বছরের মধ্যে বিশ্বের অর্থ-নৈতিক মুক্তির তাগিদে 'প্রাউট-ফিলসফি'র জন্ম দেন খালি পেটে খিদে নিয়ে ধর্ম হয় না। তাই 'ধনতন্ত্র মানুষকে করে ভিক্ষুক, আর মার্কসবাদ করে পশু' এই তত্ত্বের ভিত্তিতে 'অধ্যাত্মভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ' তৈরির স্বপ্নে প্রচার করা হয়

আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের ১০৮ দফা অনুশাসন এবং গৃহী ভক্তিমার্গীদের ১৬ দফা নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে আবার ২ রকম ভাগ। তন্ত্রদীক্ষিত আচার্যদের ৩২ রকমের নিয়ম ও তন্ত্রস্বীকৃত অবধূতদের ৩৬ দফা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়।

প্রাউট তত্ত্ব এবং তৈরি করা হয় প্রাউটিস্ট। যার হেড কোয়ার্টার এখন ভারতবর্ষের বাইরে কোপেন-হেগেন-এ

মার্কসবাদের 'প্রলেতারিয়েত-ডিকটেটরসিপ' এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের 'কালেকটিভ-লীডার-সিপ' এর পরিবর্তে প্রাউটিস্ট ব্লক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অধ্যুষিত সদবিপ্র বোর্ডের বেনিয়াভোলেন ডিকটে-টর সিপ' এর কথা বলে। তাদের বক্তব্য 'রাজনীতি অধার্মিকের জন্য নয়, বরং একমাত্র ধার্মিকরাই তাকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে'। তাই প্রাউটের মতে, সর্বহারার পরিবর্তে সর্বত্যাগীরাই সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিবিকাশ ও রাষ্ট্রবিকাশ এর সমঝোতার অর্থনীতির রূপরেখায় সদবিপ্র সমাজ পরিচালিত করবে তন্ত্র, তপস্যা এবং তিতিক্ষা সেই সন্ন্যাসীদের রক্ষা করবে মদ, মোহ, মাৎসর্য ও মাংসলোভ থেকে ভারতে প্রাউটিস্ট ব্লকের নাম-পি.বি.আই (প্রাউটিস্ট ব্লক অব ইন্ডিয়া)।

যদিও আনন্দমার্গ আইনগত কারণে প্রাউটিস্ট-দের সঙ্গে যোগাযোগ স্বীকার করে না। তবু এই দু'টি তত্ত্বেরই উদ্গাতা হলেন আনন্দমূর্তি। আবার প্রাউটিস্টরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রদেশ-ভিত্তিক আপাত বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক হাতিয়ার ৪২টি সমাজকে স্বীকার করে না তবু ১৯৭৯ সালের ২৩ নভেম্বর নয়াদিল্লির রাম-লীলা ময়দানে ওই ৪২টি সমাজের যৌথ প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১০ লক্ষ মানুষের সেই সভায় সকলেই নেতৃত্বে ও প্রাউট তত্ত্বে তাদের আস্থার কথা ঘোষণা করেন। তৈরি হয় 'প্রাউটিস্ট সর্বসমাজ সমিতি'

সংগঠনগুলির প্রতিটি স্তরের সক্রিয় নেতৃত্ব যে সব আচার্য বা অবধূত সন্ন্যাসীদের হাতে থাকে তাদের তৈরি করা হয় দুটি স্তরে। প্রাথমিক স্তর-এর প্রশিক্ষণ হয় পশ্চিমবঙ্গের আনন্দনগরে যেখানে দেওয়া হয় তন্ত্রের দীক্ষা, বীজমন্ত্র, শিক্ষা সেবাজ্ঞান ইত্যাদি। এই স্তর উত্তীর্ণ হলে দ্বিতীয়ভাগে পাঠানো হয় উত্তর প্রদেশের 'বেনারস সন্ন্যাসী ট্রেনিং সেন্টার'-এ। এখানে 'সেবাধর্ম মিশন'-এর হেড কোয়ার্টার। এই সেন্টারে ভিক্ষা, ব্রহ্মচর্য যোগের ১৭টি প্রসেসে পরীক্ষার পর প্রতি বছর গড়ে ৫০ জন সন্ন্যাসী তৈরি হয়

প্রতিটি সন্ন্যাসী নারীকে ভগ্নী অর্থাৎ 'ভগ-নি' (অর্থাৎ যাদের ভগ বা যোনি ভোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) ভাবে দেখতে হয় পালন করতে হয় কঠোর যম-নিয়ম ও ব্রহ্মচর্য। প্রতিদিন তন্ত্র ও যোগ অভ্যাস করতে হয়। ভিক্ষাবৃত্তিতে 'নিরহংকার মানসিকতা' তৈরির জন্য ৭ বছর জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তবে দিনে ৪ মুষ্টির বেশি ভিক্ষা করা চলে না, ভিক্ষালব্ধ অন্ন পরের দিনের জন্য জমা রাখা যায় না। প্রতিদিন নাচতে হয় তাণ্ডব, কৌষিকী ও ললিত মার্মিক।

মড়ার খুলি, জ্যান্ত সাপ ও খোলা ছোরা হাতে নটরাজের ভঙ্গীতে নাচকেই বলা হয় তাণ্ডব নৃত্য। ১৯৭৮ সালে 'ভীতিপ্রদ, সামাজিকতা বিরোধী ও জনজীবনে বিরক্তিকর এবং উত্তেজনাপ্রদ' বলে সরকার প্রকাশ্য স্থানে এই নাচ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। আনন্দমার্গীরা অবশ্য এই নিষেধাজ্ঞা মানেন না। আচার্য বিজয়ানন্দ অবধূত এবং আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত এক প্রশ্নের উত্তরে জানান 'আনন্দমার্গে ৩টি বিশেষ নৃত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে-তাণ্ডব, 'কৌষিকী, ললিত মার্মিক। তাণ্ডব হচ্ছে এক প্রতীকী নৃত্য। সংস্কৃত 'তণ্ডু' শব্দ থেকে তাণ্ডব-উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে লাফানো। ৭,০০০ বছর আগে শিব জনকল্যাণের নিমিত্ত এই নাচ উদ্ভাবন করেন। শুক্রবাহী গ্রন্থি সতেজ হওয়া সমেত ১০টি শারীরিক সুফল এতে ফলে। কৌষিকী নৃত্যে নারীর সুপ্রসব সমেত ২২টি রোগ সারে ললিত মার্মিকে মানসিক ক্লেদ দূর হয় প্রতি আনন্দমার্গীর পক্ষে এই নাচগুলি অবশ্যকর্তব্য

আনন্দমূর্তি তত্ত্ব দেন। আর সেই দার্শনিক

তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেন ৭ জন শিষ্য অবধূতের বোর্ড। এদের মধ্যে বিজয়ানন্দ, কৃষ্ণার্জুনানন্দ, সত্যকামানন্দ (তদগতানন্দ বর্তমানে আনন্দমার্গ ছেড়েছেন) অগ্রগণ্য। এরাই আনন্দমূর্তির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পি.ইউ.পি. তত্ত্বের বিশ্লেষক। এই তত্ত্বের উপরই আনন্দমার্গের রাজনৈতিক দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। পি ইউ পি মানে হল নাথিং পার্মানেন্ট, নাথিং ইউনিভারসেল, নাথিং পারফেক্ট। এই 'সংস্কার ধ্বংস ও নয়া কুষ্টির' তত্ত্বেই ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে আনন্দমার্গে মতবিরোধ হয় এবং আনন্দমূর্তির পত্নী উমাদেবী (যাঁকে আনন্দমার্গীরা মা বলতেন) ও সেক্রেটারি বিশোকানন্দ অবধূত তৈরি করেন। দল ছাড়েন সুধানন্দ, সুস্মিতানন্দ ও মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ। শেষোক্ত ৩ জনকেই কে বা কারা ১৯৭০ সালের ৩ আগস্ট সিংভূমের জঙ্গলে হত্যা করে। কেন্দ্রীয় পুলিশ দায় বর্তায় আনন্দমূর্তির মাথায়। অবশ্য কোর্ট তাঁকে 'বেকসুর খালাস' ঘোষণা করেন। গুরুর প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে সারা বিশ্বে ৮ জন প্রকাশ্য দিনের আলোয় আত্মাহুতি দেন অগ্নিকুণ্ডে।

সারা দেশে আনন্দমার্গীরা ২,০০০টি প্রাইমারি স্কুল চালাচ্ছেন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪৫০টি, উত্তরপ্রদেশে ২০০টি এবং বিহারে ৩৫০টি। ১,০০০ চিকিৎসাকেন্দ্র, ৭০০ প্রচারকেন্দ্র, ১টি কলেজ, ৭৮টি স্কুল আনন্দমার্গের ৪০০ আচার্য এবং ৩০০ জন অবধূত পরিচালনা করেন। ভারতে মার্গের মহিলা সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ১২৫ জন।

আনন্দমার্গের যে সংগঠনকে বিভিন্ন সরকার এবং জনগণের অংশবিশেষ খুবই সন্দেহের চোখে দেখে তা হল ভি.এস. এ। এর সর্বাধিনায়ক হলেন অমিতাভানন্দ অবধূত। রাজনৈতিক মহলের মতে এটিই নাকি প্রাইভেট আরমড মিলিশিয়া।

১৯৮২ সালের ২৮ এপ্রিল কলকাতার ডাঃ জি.এস. বসু রোডে বিজন সেতুর কাছে ১৭ জন সন্ন্যাসীদের একদল উত্তেজিত জনতা পুড়িয়ে মারে পুলিশের সামনে। অভিযোগ ওঠে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। আনন্দমার্গ খোলাখুলি অভিযোগ করে সি পি আই (এম) এর উপর। ওই তারিখে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে ভি এস.এস. এর মিটিং ছিল। ছেলেধরার গুজব ছড়িয়ে আসল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল নাকি ভি.এস.এস. কর্মীরা।

আনন্দমার্গ এখন ক্ষুধার বিরুদ্ধে প্রাউট তত্ত্ব দিয়ে লড়াই–এর কথা বলে। এবং সেই ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধের জন্য তারা তৈরি করতে চায় এমন মানুষ যারা 'ফিজিক্যালি ফিট, মেন্টালি স্ট্রং, এবং স্পিরিচুয়ালি ডেভলাপড্।'

প্রতি মাসের পূর্ণিমার দিনটি আনন্দমার্গের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এই দিনগুলিতেই আনন্দমূর্তি জন্ম দিয়েছেন সংগঠনগুলির কিংবা তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন এই দিনেই। এরকম শুভ দিনেই আনন্দমার্গের আলোচনাসভা ডি এম সি বা ধর্মমহাচক্র বসে, কাজকর্মের পর্যালোচনা হয়।
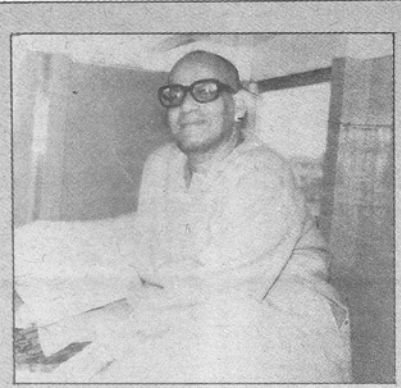
আনন্দমার্গের যে সংগঠনকে বিভিন্ন সরকার এবং জনগণের অংশবিশেষে খুবই সন্দেহের চোখে দেখে তা হল ভি.এস.এ। এর সর্বাধিনায়ক হলেন অমিতাভানন্দ অবধূত। রাজনৈতিক মহলের মতে এটিই নাকি প্রাইভেট আরমড মিলিশিয়া।

এত মৃত্যু, এত হত্যা, এত আঘাত সত্ত্বেও আনন্দমার্গের বিশ্বাস অটল। তাঁরা বিশ্বাস করেন 'বাবা আনন্দমূর্তি' জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠা করে যাবেন সদবিপ্র সমাজ অর্থাৎ সৎ মানুষের সমাজ। যেখানে শোষণ থাকবে না। তাই প্রতিটি মৃত্যুকে তাঁরা যীশু খৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মত বলে মনে করেন।

আনন্দমার্গীরা মার্গের তাত্ত্বিক নেতা আচার্য যুগতানন্দের ভাষায়, বিশ্বাস করেন :'আনন্দমার্গের ইতিহাস সরকার ও এক শ্রেণীর বিরোধিতার ইতিহাস। তবু আমরা নৈরাশ্যবাদে বিশ্বাস করি না। অমানিশার অন্ধতমসার পরে অরুণোজ্জ্বল প্রভাতের আগমন অবশ্যম্ভাবী। আমরা জানি, আজকের শত–লক্ষ ধিক্কার–লাঞ্ছনার পরেও একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আসবেই। ধর্মের নামে জড়তা ও মিথ্যার বেসাতির বিরুদ্ধে, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদের আকাশচুম্বী ইমারত গঠনের বিরুদ্ধে এবং অলীক সাম্যবাদের নামে কমিউনিজমের স্বপ্নসৌধ–ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গড়ে তুলব ইতিহাসের নির্মল অধ্যায়; প্রতিষ্ঠা করব অধ্যাত্ম-ভিত্তিক শোষণমুক্ত মানব সমাজ।

মার্গগুরু পি. আর. সরকারের চিন্তাধারায় পুরুলিয়ার শুরু হয়েছিল আনন্দমার্গের ধর্মসাধনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরুলিয়ায় কেন্দ্রিয় দপ্তর চালান আনন্দমার্গীদের পক্ষে অসুবিধেজনক হয়েছিল মূলত সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে। আর এ জন্যই পুরুলিয়া থেকে আনন্দমার্গের কার্যালয় চলে এসেছিল তিলজলায়, কিন্তু ক্রমে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিলজালায় সাংগঠনিক কাজকর্ম করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রের সংবাদ অনুযায়ী 'আনন্দমার্গীরা নিজেদের অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ ও ঠিকমত পাচ্ছে না। জনসংখ্যা যেখানে কম মোটামুটিভাবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিলজলা–কসবায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হলেও এখন ইস্টার্ণ বাইপাস চালু হবার পর জনবসতি ক্রমবর্দ্ধমান। তাই আনন্দমার্গীদের নাকি অস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি অনেক উদ্দেশ্য পূরণে অসুবিধে হচ্ছে। পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ জঙ্গলময় পাহাড়ী এলাকায় এসব অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে না। এক বছরে পুরুলিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থাও সামান্য উন্নত হয়েছে।' পুলিশের কাছে গোপনসূত্রের খবর–'সি পি এম যেমন আনন্দ-মার্গীদের অসুবিধের ফেলেছে, পুলিশ তাদের নাজে-হাল করেছে, এইসবের প্রতিবাদে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেবার জন্য মার্গীরা ঝাড়খণ্ডকে মদত দিচ্ছে বিদেশী অস্ত্র পাইয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে। বিশ্বের মোট প্রায় ৪০ লাখ আনন্দমার্গ যদি ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে সমর্থন এবং সাহায্য করে তাহলে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে তা সামাল দেওয়া অসুবিধেজনক হয়ে দাঁড়াবে। আর 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে' উসকে দেবার জন্য কেন্দ্রিয় দপ্তর পুরুলিয়াতে নিয়ে যাওয়াই সাংগঠনিক দিক থেকে আনন্দমার্গীদের পক্ষে সুবিধেজনক।' যদিও আনন্দ-মার্গের তরফে এই সমস্ত পুলিশী বক্তব্যকে মিথ্যা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত এবং অপপ্রচার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আনন্দমার্গ একটি আধ্যাত্মিক সংস্থা, অস্ত্রের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগই নেই।

আকস্মিকভাবে আনন্দমার্গীদের প্রধান কার্যা-লয় পরিবর্তনের ঘোষণা রীতিমত অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে প্রশাসনের মনে। গোয়েন্দা পুলিশের সংবাদ যদি সত্যি হয়, তাহলে আনন্দমার্গীদের স্থানান্তর-করণের সিদ্ধান্ত রাজ্যপ্রশাসনের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। আনন্দমার্গীদের গোপন কাজকর্ম বিষয়ে কড়া নজর রাখতে রাজ্যসরকার ইতিমধ্যেই তাই গোয়েন্দা দপ্তরকে বিশেষ নির্দেশ জারি করেছেন।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি ও অমিতবিক্রম রাণা

৩৭ পৃষ্ঠার পর

এরপর, একটি দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। ছবির দৃশ্যে রয়েছেন সেই যুবক আর দেবিকারাণী।

লাইটস অন। স্টার্ট সাউন্ড, ক্যামেরা। সায়লেন্স। শট টেকিং। সঙ্গে সঙ্গে সেটের সমস্ত লাইট জ্বলে উঠল। দৃশ্য গ্রহণ শুরু করলেন ক্যামেরাম্যান। যুবক সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে, যথাসম্ভব আত্মপ্রত্যয় গড়ে তুলে সংলাপ আউড়ে নায়িকাকে বললেন ...দেখ, জীবনে এরকম ঝামেলা সবারই আসে। তার জন্যে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? হিম্মত রাখতে হবে। তাছাড়া আমি তো তোমার পাশেই আছি।

সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টর প্রবল চিৎকার করে বলে উঠলেন কাট। কাট। রেগে আগুন হয়ে যুবকের কাছে এসে বললেন—হোয়াটস রঙ্ উইথ ইউ? করছটা কি? এভাবে সিন কি করে হবে? জান, এই নিয়ে ক'বার রিটেক হল? শুনেছ? ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন যুবক। কপালে, চিবুকে ঘাম জমে উঠল।

ডাইরেক্টর যুবকের কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে দেবিকারাণীকে দেখিয়ে এবার শান্ত কণ্ঠে বুঝিয়ে বললেন, দেখ, এই মুহূর্তে এই ছবির সেটে এই ভদ্রমহিলা এই কোম্পানীর মালকিন নন। সি ইজ ইউর ওয়াইফ। তোমার স্ত্রী। স্ত্রীর সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে? তাই কাছে যাও। আদরের গলায় বেশ নরম করে ডায়লগ বল। বৌ–এর সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হও।

যুবকের সারা শরীরে যেন এক ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল। গলা শুকিয়ে গেল ডাইরেক্টরের নির্দেশ শুনে। ঢোক গিলে বললেন, বলছেন কি। ওঁর গায়ে হাত দেব? কাছে টানব—চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবেন যে।

দেবিকারাণী এবার যুবকের কাছে এসে বললেন তুমি যদি এবার সিনটা ঠিকমত না করতে পার তাহলেই তোমাকে তাড়িয়ে দেব।

ক্যামেরাম্যান আবার দৃশ্য গ্রহণের জন্য তৈরি হলেন।

ঘটনার পাঁচ বছর পর। লাহোরের রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অগণিত মানুষের ভীড়। প্ল্যাটফর্মে মাছি বসার পর্যন্ত জায়গা নেই। ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো সব বয়সের লোকেরা এসে সমবেত হয়েছেন। এসেছে স্কুল কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রীও। স্টেশনের বাইরেও লোকে লোকারণ্য। সবাই এসেছেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে। তাঁকে স্বাগত জানাতে। একসময়ে দিল্লী থেকে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে থামল। উত্তাল হয়ে উঠল জন-সমুদ্র। সেই একই যুবককে এবার দেখা গেল গাড়ি থেকে নামতে। অপেক্ষমান জনতা জলজ্যান্ত নায়ককে সামনে দেখে ওঁর কাছে যাওয়ার জন্য উত্তাল ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ল। পুলিশ সে ঢেউ আর আটকাতে পারছে না।

এই দৃশ্যগুলিতে উল্লেখিত যুবক হলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রেরচিরতরুণ অভিনেতা অশোককুমার, যিনি এখন সবার প্রিয় দাদামণি। ভারত সরকার অশোককুমারকে এই বছর ভারতীয় সিনেমার তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে দাদা-সাহেব ফালকে পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। তবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশ লোকের মতে এই সর্বোচ্চ পুরস্কার দাদামণিকে অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশিষ্ট এই অভিনেতার অবদান অনন্য। ভারতীয় ফিল্মকে প্রথম আন্তঃরাষ্ট্রীয় জনপ্রিয়তা দিয়েছেন তিনিই। ভারতীয় ছবিকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রতিভায়।

একাকীত্বের মুহূর্তটিতে

ছবি : রথীজিৎ ঘটক

অশোককুমার চলচ্চিত্রে আসেন ১৯৩৫ সালে। সেদিন পৃথ্বিরাজ কাপুর, মাস্টার নিসার, গজানন জায়গীরদার, জন কাবাস, সোরাব মোদি, জয়রাজ, রফিক গজনাবীর স্টারদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই অশোককুমারকে নিজের জায়গা করে নিতে হয়েছিল।

অশোককুমার, অর্থাৎ মুকুন্দলাল গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১১ সালের ১৩ অকটোবর, ওঁর দিদিমার বাড়িতে বিহারের ভাগলপুরে। ওঁর ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দিকপাল শশধর মুখার্জীর সঙ্গে। মেজ ভাই অনুপ কুমার ওঁর চেয়ে ১৫ বছরের ছোট। কিশোরকুমার ছোট ২০ বছরের। অশোককুমারের বাবা আর কাকা দুজনেই ছিলেন নামকরা উকিল। ওঁরা থাকতেন মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায়। বাবা ওকালতি করে সফল হয়েছিলেন বলেই, চাইতেন বড় ছেলেও আইনেরই ব্যবসা করুক। আর ঠিক তার জন্যেই খাণ্ডোয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্যে অশোককুমারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল জব্বলপুরে। তবে অশোককুমারের ওকালতির প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। ভালও লাগত না। তাই সাইন্স নিয়ে কলেজে পড়াশুনো শুরু করেন। সেই ছাত্রাবস্থায় আগামী দিনের এতবড় অভিনেতার অভিনয়ের ব্যাপারে কিন্তু বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না। তবে হ্যাঁ, সিনেমার নেশা ছিল দারুণ। হোস্টেল থেকে বেরিয়ে প্রায়ই সিনেমা দেখতেন।

বাবা যখন শুনলেন, ছেলে জব্বলপুরে সাইন্স নিয়ে পড়ছে, উকিল হবে না, তখন জোর করে পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতায়। ঠিক আছে, উকিল না হতে চাও অফিসার হও। তবে আইন পড়তেই হবে। কোলকাতার ল' কলেজে এসে ভর্তি হলেন অশোককুমার। মন বসছিল না কিছুতেই। তাই একদিন নিয়ে ফেললেন জীবনের সেই অবিস্মরণীয় সিদ্ধান্ত। কলেজের ফী দেবার জন্যে পকেটে তখন ছিল মাত্র ৩২ টাকা। হঠাৎ মনে হল এসব করে কি হবে? ওকালতি নয়, সরকারি চাকরিও নয়। অন্য কিছু করতে হবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ফিল্ম টেকনিসিয়ান হবেন। পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন এক গ্যাবাডিনের প্যান্ট আর চোদ্দ আনা দিয়ে একটি চেক–শার্ট। তারপর সোজা হাওড়া স্টেশনে এসে ১৯ টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন বোম্বাইয়ের এক টিকিটে। পৌঁছে গেলেন চলচ্চিত্রের পীঠস্থানে।

শহরতলী মালাডে একটা ছোট কামরা ভাড়া নিয়ে সেখানেই থাকতে শুরু করলেন। আর্থিক অবস্থা বড় সঙ্গীন তখন। একখানা চেক শার্টই ধুয়ে ইসতিরি করে পরতে হত। গ্যাবাডিনের প্যান্টটা দশদিনে একবার ধোওয়া হত কিনা সন্দেহ। এই অবস্থায় একদিন চলে এলেন বোম্বে টকিজের কর্ণধার হিমাংশু রায়ের কাছে। বললেন, আমি বিদেশে গিয়ে ফিল্ম তৈরির টেকনিক শিখতে চাই। আপনি কাইণ্ডলি আমার নামটা রেকমেণ্ড করুন।

সুদর্শন যুবকের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে হিমাংশু রায় বললেন, এর জন্যে বিদেশে যাওয়ার কি দরকার? তুমি যদি চাও এখানেই তা শিখতে পার।

এভাবেই অশোককুমার ঢুকেছিলেন বোম্বে টকিজে। এক ফিল্ম টেকনিসিয়ান হবেন সেদিন ছিল এই ধ্রুব লক্ষ্য। ফিল্ম তৈরির সমস্ত বিভাগে ঘুরে ঘুরে কাজ শিখতে শুরু করলেন। স্টুডিওর কাজ, ক্যামেরার কাজ, সাউণ্ড রেকর্ডিং—এর কাজ, লাইট দেওয়ার সমস্ত কৌশল। এক কথায় চলচ্চিত্র তৈরির সমস্ত কাজের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠলেন অশোককুমার। অন্য সব বিভাগের কাজ জানার পর চলে এলেন এডিটিং বিভাগে। এখানেই কাজ শেখার সময় একদিন হঠাৎ হিমাংশু রায় ডেকে বললেন, তোমাকে হিরোর রোলে অভিনয় করতে হবে। এরপর অশোককুমার রচনা করলেন অন্য ইতিহাস।

১৯৩৬ সালের মধ্যেই তাঁর তিনটি ছবি রিলিজ হয়ে গেল। 'অচ্ছুৎকন্যা' 'জীবন নাইয়া', 'বন্ধন'। সেই যুগে একটা ছবি ২–৩ সপ্তাহের বেশি চলত না। কিন্তু 'অচ্ছুৎকন্যা' চলল ৮ সপ্তাহ। সেদিনের এ এক রেকর্ড।

ছবিতে হিরোর কাজ করে সে সময়ে অশোককুমার বেতন পেতেন মাত্র ১৫০ টাকা। এখন অকল্পনীয়! তবে সেদিন ১৫০ টাকাই কিন্তু স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

তবে অশোককুমার বললেন, সেদিন ঐ টাকাটা নিয়েই তাঁর চিন্তার শেষ ছিলনা। কোথায় রাখবেন এতগুলো টাকা। বালিশের মধ্যে ভরে সারারাত তার ওপর মাথা চেপে পড়ে রইলেন। ভাল করে ঘুম হল না। পরের দিন ভোরে ডাকঘর খুলতেই সোজা এসে মনিঅর্ডারে ১০০ টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হলেন। বাকি রইল ৫০ টাকা। সেই টাকাই সেদিন একজন মানুষের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

ওদিকে ছেলের জন্যে মায়ের দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ছেলে ফিল্মে নেমেছে। পাল্লায় পড়ে খারাপ না হয়ে যায়। তাই ছেলের বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। বিয়ে দিয়ে বউ আনলেই ঠিক থাকবে। কোলকাতা, দিল্লি, খাণ্ডোয়া—তিন জায়গায় ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান শুরু হল। একদিন এল এক জরুরী টেলিগ্রাম। তাতে লেখা—'এক্ষুনি বাড়ি চলে এস।'

অশোককুমার ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে ছুটলেন বাড়িতে। কিন্তু ভাগলপুরে পৌঁছে দেখেন কারো কিছু হয়নি। সবাই ভাল আছেন। শুধু মা ওঁর বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ছেলে যাতে আপত্তি না করতে পারে, এরজন্যে মা বিয়ের দিনক্ষণ সব স্থির করেই ছেলেকে জরুরী তলব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সব শুনে অশোককুমার রেগে মাকে বললেন, এত তাড়াতাড়ি করার কি ছিল? তোমাকে না বলেছিলাম এখন আমি ৩৫০ টাকা বেতন পাই। যেদিন বেতন ৫০০ টাকা হবে সেদিন বিয়ে করব? তবে কোন আপত্তি কোন অজুহাতই টিকল না। মায়ের আদেশ শেষ পর্যন্ত শিরোধার্য করতেই হল। ছাদনাতলায় বসতে অবশেষে রাজি

'ভীম ভবানী'তে অশোককুমার

ছবি : পি ডি জগতাপ

হলেন অশোককুমার। বিয়ের তারিখ প্রথমে ঠিক হয়েছিল শুক্রবার, ১লা মে, ১৯৩৮। পুরোহিত এসে বললেন, ছেলের জন্মদিনও তো শুক্রবার। তাই বিয়ে শুক্রবারে কি করে হবে? এই তিথি চলবে না। তাই শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল পরের দিন, অর্থাৎ শনিবার ২ মে, ১৯৩৮। বরযাত্রী ছিলেন মাত্র পাঁচজন। জরুরী তলব পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেবেন বলে, জাঁকজমক করারও তেমন সময় ছিল না।

মা জানতেন, তার পছন্দ করা বৌমাকে বোম্বাইতে গিয়ে বড় বড় লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। তাই তিনি মিস অ্যানী নামে এক ইংরেজ মহিলাকে টিউটর রেখে নতুন বউ শোভাকে ইংরেজী শেখাতে শুরু করেন। এক মাসের মধ্যেই শোভা এত সুন্দর ইংরেজী বলা শিখেছিলেন যে বোম্বাইতে পৌঁছে স্বামীর পরিচিত বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে ওঁর কোন অসুবিধা হয়নি।

শোভা স্বামীর ঘর করতে এসে উঠেছিলেন মালাডের এক ভাড়া বাড়িতে। আগেই বলেছি অশোককুমার তখন বেতন পেতেন ৩৫০ টাকা। তবে সেই টাকাতেই স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন তখন সম্ভব ছিল। একটা গাড়িও ছিল। বিয়ের পর বছর ঘুরতেই জন্ম নিল বড় মেয়ে ভারতী (যিনি আজকের অভিনেত্রী অনুরাধা প্যাটেলের মা)। ঘরে এল লক্ষ্মী। অশোককুমারের বেতন বেড়ে হল ৫০০ টাকা।

এর মধ্যেই, লাহোরের চীফ জাস্টিস অশোককুমারের এক ফিল্মের প্রিমিয়ার শোতে হাজির হবার জন্যে শিল্পীকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে সেই বিপুল সম্বর্ধনার বিবরণ এই লেখায় দেওয়া হয়েছে আগেই, সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে গিয়ে দেবানন্দ বলেছেন, তখন আমি লাহোরে পড়াশুনো করতাম। দাদামণি যেদিন লাহোর পৌঁছোবেন সেদিন পাবলিক হলিডে ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকার জানতেন, সবাই অশোককুমারকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে গিয়ে ভীড় করবে। অফিস কাছারিতে কেউ আসবে না। সারা লাহোর শহরে সেদিন দাদামণির ফিল্মের পোস্টার লাগানো হয়েছিল। পোস্টারে ছিল শুধু দাদামণির বিগ ক্লোজাপ ছবি। ওই পোস্টারে সেই ফিল্মের অন্য কোন আর্টিস্টের ছবি ছিল না। পরে এই দেবানন্দ যখন ফিল্মে কাজ করার জন্যে বোম্বাই পৌঁছোন, অশোককুমার তখন বোম্বে টকিজের টেকনিসিয়ান থেকে একজিকিউটিভ প্রডিউসার হয়ে গেছেন। অশোককুমারই বোম্বে টকিজের 'জিদ্দি' ছবিতে দেবানন্দকে হিরোর রোল করার সুযোগ দিয়েছিলেন। গোড়াতে ঐই রোল অশোককুমারের নিজেরই করার কথা ছিল। তবে দেবানন্দ ওকে যখন বললেন, আমি ফিল্মে আসার জন্যে স্ট্র্যাগল করছি, আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন, তখন এক শিল্পীর যন্ত্রণা উপলব্ধি করে সানন্দে অশোককুমার সেই রোল দিয়ে দেন। প্রসঙ্গত সেই 'জিদ্দি' ছবিতেই অশোককুমার ওঁর ছোট ভাই কিশোরকুমারকে দিয়ে প্রথম প্লেব্যাক করিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই ছবিতে কিশোর ছোট এক ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন। সেই থেকেই শুরু হয়েছিল কিশোরকুমারের চাঞ্চল্যকর ফিল্ম—জীবনের জয়যাত্রা। লাহোরে অশোককুমার পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা। আর তার প্রতিক্রিয়া ঘটল বোম্বাইয়ের বোম্বে টকিজে। রাতারাতি ওঁর বেতন ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হল ১২০০ টাকায়। ঠিক তার পরের বছর বেতন বাড়ল আরও তিনগুণ। সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন পেতেন এমন লোক ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে তো বটেই অন্য কোন বৃত্তিতেও সে সময় কমই ছিলেন। রাজার হালে জীবন কাটাতে শুরু করলেন অশোককুমার। সময়টা তখন ১৯৪০ সাল।

অশোককুমারের জন্যে বোম্বে টকিজের অফিসে এক স্পেশ্যাল প্রজেকসন—রুম তৈরি করা হয়েছিল। এখানে বসে অশোককুমার ওঁর প্রিয় দেশি বিদেশি ছবি দেখতেন। বোম্বে টকিজের মোট ৭টি ছবিতে অশোককুমার নায়কের কাজ করেছিলেন। আর

এই ৭টি ছবিই ছিল সুপার হিট, যে রেকর্ড ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতাহাসে ছিল প্রথম।

হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভগ্নিপতি শশধর মুখার্জী বোম্বে টকিজের দায়িত্বভার তুলে নেন। তবে দেবিকারাণীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ার দরুন শশধর মুখার্জী অশোককুমারকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বে টকিজ থেকে আলাদা হয়ে যান এবং গড়ে তোলেন 'ফিল্মিস্তান'। এরপরেই অশোককুমার বাইরের নানান প্রডিউসারের ছবিতেও কাজ শুরু করেন। যার মধ্যে স্বর্গীয় মেহবুবের 'হুমায়ুন', 'নজমা' প্রভৃতি ছবিও ছিল। ফ্রিল্যান্স অ্যাকটর হিসাবে কাজ করার যে ধারা তিনি তৈরি করলেন, তা-ই এখনও হিন্দি চলচ্চিত্রে চলছে। নানান প্রডিউসারের কাছে অশোককুমার হয়ে উঠলেন সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এভাবেই জনবন্দিত অভিনেতা হয়ে উঠলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম সুপারস্টার।

একেবারে প্রথম অধ্যায়ে অশোককুমারের বিপরীতে নায়িকা ছিলেন দেবিকারাণী, লীলা চিটনিস, মমতাজ শান্তি। এঁরা প্রায় দশবছর নানান ছবিতে অশোককুমারের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পরে এরাই যখন বয়সের ভারে আক্রান্ত হয়ে মা-মাসির রোলে অভিনয় করা শুরু করেন, তখনও অশোককুমার হিরোর রোল করছেন- পরবর্তী নায়িকা নার্গিস, সুরাইয়া, কামিনী কৌশল, নলিনী জয়ন্ত, মীনা কুমারী, নিরূপা রায় এর সঙ্গে। এসব অভিনেত্রীদের বয়স তখন ছিল-অশোককুমারের বয়সের অর্ধেক। এঁরাই ছেলেবেলায় ছিলেন ওঁর ফ্যান। নার্গিস আর সুরাইয়া ক্লাস কামাই করে তাঁদের প্রিয় অভিনেতা অশোককুমারের অটোগ্রাফ নেবার জন্যে স্টুডিওতে গিয়ে বসে থাকতেন। নার্গিসের মা জদ্দন বাঈ, যিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী, পরে ফিল্ম প্রয়োজনাও করেছেন, তিনিও ছিলেন অশোককুমারের এক পরম ভক্ত। একদিন, জদ্দন বাঈ অশোককুমারকে ওঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। মেয়ে নার্গিস অনেকবার ডাকাডাকি করার পর সামনে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল ওর প্রিয় স্টারকে। কাছে আসতে জদ্দন বাঈ বললেন-'এই আমার মেয়ে নার্গিস। আপনার বহু ছবি অ্যালবামে লাগিয়ে রেখেছে!' এই নার্গিস পরে অশোককুমারের সঙ্গে অনেক ছবিতে হিরোইনের কাজ করেছেন। যেমন, 'নজমা', 'দিদার', 'বেওয়াফা' ইত্যাদি।

মীনাকুমারীও ছোটবেলা থাকতেই ছিলেন অশোককুমারের গুণমুগ্ধ এক পরম ভক্ত। অশোককুমারের যে-কোন ছবির প্রথম শো না দেখে থাকতে পারতেন না। একবার নাকি পয়সা না থাকায় হলের দরজায় যে বড় বড় পর্দা ঝোলানো থাকে তারই আড়ালে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা ছবি দেখে ফেলেছিলেন।

তবে একটা ব্যাপারে আর সবাইকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন একমাত্র নলিনী জয়ন্ত। ছেলেবেলা থেকেই আর দশটি মেয়ের মত নলিনীও ছিলেন অশোককুমারের পরম ভক্ত। যৌবনে পৌঁছে সংগ্রাম প্রভৃতি ছবিতে যখন অশোককুমারের হিরোইন হয়ে কাজ শুরু করলেন তখন এই সুদর্শন অভিনেতার সঙ্গে রোমান্সের নেশাও জেগে উঠল। ওঁর এই চিত্ত বৈকল্যের দরুন নিজের জীবনেও ঝড় উঠেছিল। এমন ঝড়, যে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর্যায়ে এসে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যায়। অশোককুমার-নলিনী জয়ন্তর এই সম্পর্ক নিয়ে সেদিন ছড়িয়েছিল নানান গুজব। ফিল্ম আর্টিস্টদের নিয়ে গসিপ বা গুজব ছড়ানোর যে ধারা পরে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে দাদামণির নামই উঠে আছে সবার আগে। তিনিই ছিলেন এরকম গুজবের প্রথম শিকার। এখানকার ফিল্ম জার্নালগুলোয় চিত্রতারকাদের নিয়ে গসিপের কলমগুলোই পাঠকদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ধারা ফিল্ম ম্যাগাজিন অশোককুমার আর নলিনী জয়ন্তকে নিয়ে প্রথম চালু করেছিলেন সেযুগের প্রখ্যাত ফিল্ম জার্নালিস্ট বাবুরাও প্যাটেল।

অভিনেত্রীরা ছবির পর্দায় এসেছেন। তারপর একদিন বয়স বাড়তেই পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে সরে গেছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে সেই সময়ও আসতে খুব দেরি হয়নি কারো জীবনেই। তবে অশোককুমার এভারগ্রীণ রয়ে গেছেন চিরতরুণ দীর্ঘদিন। একমাত্র এই নায়কই চার প্রজন্মের অভিনেত্রীদের সঙ্গে নায়কের ভূমিকায় কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন।

আর পঞ্চম প্রজন্মের অভিনেত্রী সোনাম পর্যন্ত সেদিন বললেন, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা অশোককুমারের সঙ্গে হিরোইন হয়ে রোমান্টিক সিন করার।

'অনুরোধ' ছবিতে অশোককুমার তাঁর পুরোনো দিনের হিরোইন নিরূপা রায়ের শ্বশুর হয়েও কাজ করছেন। ছবিতে তাঁকে বেটি বলে ডাকছেন। 'মমতা' ছবিতে কাজ করার জন্যে অসিত সেন যখন সুচিত্রা সেনকে এসে বললেন, হিরোর রোল কাজ করার জন্যে অশোককুমার রাজী হয়ে সই করেছেন, তখন সুচিত্রা সেন সাগ্রহে সেই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় কাজ করার জন্যে রাজি হয়ে যান। ওঁরই মেয়ে মুনমুন সেন দাদামণির সঙ্গে হিরোইন হিসাবে কাজ করতে এখনও উৎসুক।

লীলা চিটনিস ঠিকই বলেছিলেন 'আপনার বয়স আর বাড়ছেনা'।

তবে বর্তমান নায়কদের মত পারিবারিক জীবন কিন্তু বিক্ষিপ্ত ছিলনা অশোককুমারের। সবাইকে নিয়ে হৈ-হল্লা করে থাকতেই চেয়েছেন সবসময়। সেই দিক থেকে অত্যন্ত ঘরোয়া এক মানুষ অশোককুমার। কিছুদিন আগে পর্যন্তও নিয়ম ছিল: মাসে একবার অন্তত সব ভাইয়েরা তাঁদের বউ আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে, আর মেয়েরা তাদের স্বামী আর বাচ্চাদের নিয়ে দাদামণির বাড়িতে আসবেন। নিজের নিয়ম, সন্ধ্যা সাড়ে ছটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবেন। সারা দিন, তিনি আর দশজনের। সন্ধ্যার পর, তিনি তাঁর পরিবারবর্গের। হাতে যখন কাজ থাকেনা তখন কখনও ছবি আঁকেন, কখনও ফটোগ্রাফি নিয়ে মাতেন, কখনও চর্চা শুরু হয় এ্যাস্ট্রোলজির আর হোমিওপ্যাথির, হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক হিসাবে ওঁর বেশ সুখ্যাতিও আছে। এমন কি বকসিংও মন দিয়েই শিখেছেন কিছুদিন।

অশোককুমার ভাল গৃহস্বামী, অত্যন্ত প্রতিভাশালী অভিনেতা। কিন্তু ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে একেবারেই কাঁচা। একটা সময় ছিল যখন ওঁকে ফ্রিল্ম লাইনের সবচেয়ে সম্পদশালী লোক বলে মনে করা হত। তবে ওঁর অর্ধেকেরও বেশি পয়সাই আদায় হয়নি। বেশির ভাগ প্রডিউসারই চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী ইনস্টলমেন্টের টাকা আর দেন নি। লোকেরা ওঁর কাছ থেকে নানান প্রয়োজনে এবং আরও অনেক অজুহাতে কত যে টাকা ধার নিয়েছেন তার কোন হিসাব নেই, অধিকাংশ টাকাই আর ফেরত আসেনি।

কি খেয়াল হতে, অশোককুমার একসময়ে এক ফিল্ম কোম্পানীও শুরু করেছিলেন। নাম ছিল অশোককুমার প্রডাকসন্স। 'অধিকার', 'আশু বন গ্যায়া ফুল' ইত্যাদি ছবি এই ব্যানারে তৈরি হয়েছিল। তবে সব ছবিই ফ্লপ। যে-বিশ্বাস নিয়ে টাকা লাগিয়েছিলেন, সেভাবে সে-সব ছবির কাজও হয়নি। প্রথম ছবি 'সমাজ' যখন তৈরি করেন তখন এত ঋণ হয়ে গিয়েছিল যে, নিজের অ্যাকটিং কেরিয়ারই প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। আর ওর সেই সুযোগে ইন্ডাস্ট্রিতে হিরো হিসাবে আসর জাঁকিয়ে বসে ছিলেন দিলীপকুমার, রাজকাপুর, দেবানন্দ আর রাজেন্দ্রকুমার। তবে 'অফসানা' (বীনা রায়), 'দিদার' (নার্গিস, দিলীপ, নিম্মি), 'সংগ্রাম' (নলিনী জয়ন্ত), 'মহল' (মধুবালা) প্রভৃতি সুপারহিট ফিল্ম সেই সময়েই রিলিজ হয়েছিল।

বাঙলা ছবিতে অশোককুমার প্রথম কাজ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে। শৈবলিনীর ভূমিকায় এই ছবিতে নায়িকা ছিলেন কাননদেবী। পরিচালক ছিলেন দেবকী বসু।

অশোককুমারের সাবলীল পারিবারিক জীবনের পিছনে ছিল তাঁর স্ত্রী শোভার অবদান। সম্প্রতি মারা গেছেন শোভাদেবী, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে কাটানোর পর প্রিয় ভাই কিশোরও হঠাৎ চলে গেলেন। আজ তাই অশোককুমার বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ এই সঙ্গপ্রিয় মানুষটি। কাজের পর বাড়ি ফিরে এসে বিশাল বাড়িতে চুপচাপ বসে অতীতের স্মৃতি মন্থন করতেই বেশি ভালবাসেন। মাঝে মাঝে মেয়েদের টেলিফোন আসে।

সব মিলিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের এক মহীরুহের মত তাঁর অস্তিত্ব।

রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব, দিব্যেন্দু গুহ
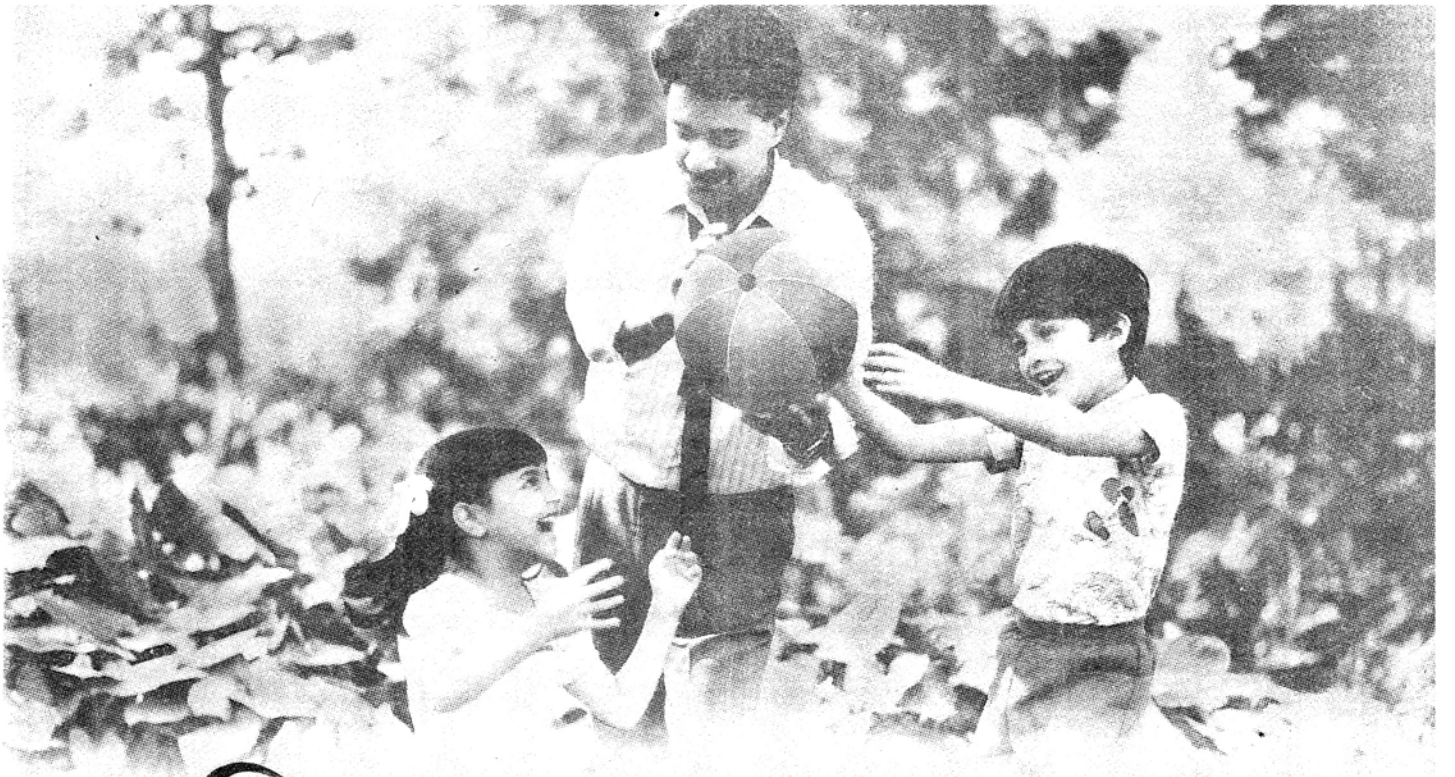
দিনের মধুরতম সময়ের জন্যে সে সদা তৈরী।

সারাদিন অফিসের ব্যস্ততা আর প্রচন্ড কাজের চাপ। অথচ ওকে দেখে কিন্ত তা মনে হয় না। বাচ্চাদের মতই অদম্য ওর প্রাণশক্তি।

আপনার বিচক্ষণতার প্রশংসা করতেই হয়। সারাদিনের অফুরন্ত শক্তি ও প্রাণস্ফূর্ত্তির জন্য আপনি যে ওকে দেন পুষ্টিগুণে ভরপুর হরলিক্স।
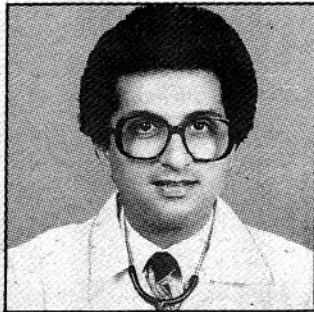
"শক্তি, ও সুস্বাস্হ্যের জন্য হরলিকসে আছে অতি প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান – প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও কার্বোহাইড্রেট। তাই তো, হরলিকসের পুষ্টিগুণ অদ্বিতীয়। সারাদিনের স্বাস্হ্যোজ্জ্বল এক চিত্র।"

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HTA 6224 BEN

আমার পরিবার আমার সংসার

"আমার পরিবারই আমার সংসার। আমাদের কাছে জীবিকা পালনের মত জমি আছে, ক্ষেত খামার আছে, মাথার ওপর ছাদ আছে। কিন্তু কালকের কথাও ভাবতে হবেতো! যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, তখন কি হবে?"

হ্যাঁ ঠিক বলেছেন! একজন সমঝদার ব্যক্তির চিন্তাধারার মতোই হলো এই মনোভাব। দুর্ঘটনা হওয়া না হওয়া কারও হাতে নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য ভাবা সব দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্তব্য।

কৃষাণ, গ্রামীণ ভাই তথা জনসাধারণের জন্য ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স দ্বারা কিছু বিশেষ পলিসি চালু হয়েছে, যথা —

১) জনতা ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা পলিসি এবং

২) গ্রামীণ দুর্ঘটনা বীমা পলিসি।

এই বীমা পলিসির উদ্দেশ্য হলো — বিপদের সময় কাজে লাগা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে অথবা আজীবন শারীরিক দিক থেকে অক্ষম হয়ে পড়লে সন্তপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

বীমা	বার্ষিক প্রিমিয়াম হার	
মহিষ/গরু	আই. আর. ডি. পি. ২ টাকা ২৫ পয়সা	(অন্য) ৪.০০ টাকা
জনতা ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা	১২ টাকা প্রতি ব্যক্তি	বীমার পরিমান ১৫,০০০ টাঃ
গ্রামীণ দুর্ঘটনা বীমা	৫ টাকা প্রতি ব্যক্তি	বীমার পরিমান ৬,০০০ টাঃ
ক্ষেত-খামার পাম্প সেট		
(১) বিদ্যুৎ চালিত	৫০ থেকে ১৯০ টাকা (হর্স পাওয়ার অনুসারে)	
(২) ডিজেল চালিত	৭০ থেকে ২৩০ টাকা (হর্স পাওয়ার অনুসারে)	
ডিম দেবার মুর্গী	আই.আর.ডি.পি. ৮০ পয়সা প্রতি মুর্গী (১ দিন থেকে ৭২ সপ্তাহ)	(অন্য) ১.২০ থেকে ১.৫০ টাকা প্রতি মুর্গী বাচ্ছা (বয়স হিসেবে)
ব্রয়লার	২৫ পয়সা প্রতি মুর্গী বাচ্ছা (১ দিন থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত)	

দি ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

(ভারতীয় সাধারণ বীমা নিগমের সহায়ক কোম্পানী)

ওরিয়েন্টাল হাউস, এ-২৫/২৭, আসফ আলী রোড, নিউ দিল্লী-১১০০০২

Advtg. Integrated/OIC-Ben/8189

ভারতে বাড়ছে কমপিউটারের ব্যবহার

কম্প্যুটার ভাইরাস!

কম্প্যুটারের ব্যবহার এখন ক্রমশ সর্বজনীন হয়ে উঠছে। অফিস-কাছারি থেকে স্কুল-কলেজ অবধি। ভারতে কম্প্যুটার-প্রযুক্তি এখনো ব্যাপকতা লাভ করেনি। অথচ, এখানেও হঠাৎ হঠাৎ হানা দিচ্ছে ভয়াবহ ভাইরাস…!

বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুটের ছাত্রেরা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাদের মাইক্রো-কম্প্যুটারে (পি·সি·) সংরক্ষিত সমস্ত ডেটা বেমালুম অদৃশ্য। তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতে ঘটে যাওয়া কোনরকম দোষত্রুটির ব্যাপারও খুঁজে পেলেন না। পরে জানা গেল, পি·সি·-টি 'কম্প্যুটার এইডস' নামক রোগে আক্রান্ত। ঠিক এভাবেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন-এর দুজন ছাত্র, জসজিৎ সিংহ ও পরাগ শ্রীবাস্তব লক্ষ্য করলেন তাদের কয়েকটি ডেটা ফাইলের লেবেল 'অ্যাশার' নামক কম্প্যুটার ভাইরাসে আক্রান্ত। সংরক্ষিত ডেটাগুলিতে বড়সড় ক্ষতি হওয়ার আগেই তা সংশোধন করা সম্ভব হয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরের অ্যাপল লিজিং অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ সংস্থার ইনফরমেশন ডিভিসনের কর্মী শ্রীমতী লেখা শ্রীবাস্তব হঠাৎ দেখলেন, তাঁর কম্প্যুটারের ভল্যুম লেবেল কি কারণে যেন 'সি জোন' লেবেলে চলে এসেছে। ত্রুটিটা ঠিক করতে লেগে গেল তিনদিন।

ভারতবর্ষে কম্প্যুটারের ব্যবহার এখনো শুরুর পর্যায়ে, অথচ পশ্চিমী দেশগুলোর মত এখানেও ভয়াবহ সমস্যার মত প্রবেশ করছে কম্প্যুটার ভাইরাসের সংক্রমণ। সম্প্রতি দিল্লির আই আই টি-তে তাদের কম্প্যুটারে সযত্নে সংরক্ষিত ডেটাগুলি অজ্ঞাত কারণে মুছে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সফটওয়ার এজেন্সিকে খবর দেওয়া হল, ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলেও ত্রুটি দূর করতে পুরো একসপ্তাহ সময় লেগেছিল। কম্প্যুটার প্রযুক্তির কাছে আর একটি নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে—কম্প্যুটার ঘাতক ভীতি। সেকথা আলোচিত হচ্ছে পরে। আমাদের দেশে এই ঘাতক কৃত ক্ষয়ক্ষতি এখনো নগণ্য। সম্প্রতি শোনা গেছে, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে তাদের জনৈক কম্প্যুটার-বিশেষজ্ঞের ইচ্ছাকৃত ত্রুটিতে প্রায় দু-তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছে।

'ব্রেইন' বা 'অ্যাশার' নামক একটি ভাইরাস বর্তমানে ভারতবর্ষের কম্প্যুটার ব্যবস্থায় তার কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। আমজাদ এবং বসিৎ ফারুক আলভিয়া নামক দুই পাকিস্তানী ভাই উক্ত ভাইরাসের স্রষ্টা। আন্দাজ করা হয়, সারা পৃথিবীতে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি 'ফ্লপি' ঐ ভাইরাস সংক্রমণে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। শোনা যায়, সফটওয়ার পাইরেসি থামানোর জন্যই নাকি তারা ঐ ভাইরাসটি তৈরি করেছিল। কেউ কেউ বলেন, আসলে দুজনের উদ্দেশ্য ছিল, সমস্যা তৈরি করে তার সমাধানের জন্য এগিয়ে আসা এবং এভাবে জমিয়ে ব্যবসা করা।

ভাইরাসটি পর্দায় ফুটিয়ে তোলে, 'সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এই কথাকটি। দিল্লি আই·আই· টি-র শ্রী আর·কে· অরোরার মতে, 'আমার মনে হয় না কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এই ভাইরাস তৈরি করা হয়েছে।' কিন্তু বহু বিশেষজ্ঞ সাবোতাজ-এর ধারণাটি একেবারে উড়িয়ে দিতে চান না। সম্প্রতি জানা গেছে, আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি, সংক্ষেপে এন·এস·এ এবং সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সি আই এ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির কম্প্যুটার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য নিয়মিতভাবে ভাইরাস প্রেরণের চেষ্টা চালিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে, আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তরের বেশিরভাগ সফটওয়ার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে আমদানিকৃত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডেটা বিভাগের জনৈক মুখপাত্রের বক্তব্য, আমেরিকার ভাইরাসের ভয় আমাদের নেই। তবে, ভবিষ্যতে কি হবে সেসম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননি।

বেশিরভাগ সফটওয়ার নির্মাতাই তাদের সফটওয়ারগুলি এমনভাবে প্রোগ্রাম করে রাখেন যাতে ওগুলির বেআইনী অনুকরণের চেষ্টা ঘটামাত্র একটি ভাইরাস স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে। আর, ভারতবর্ষে শতকরা ৯০ ভাগ সফটওয়ারই স্বত্ব অপহৃত অর্থাৎ পাইরেটেড-সেক্ষেত্রে ক্ষতির বহর কি হতে পারে সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও বিদেশে মেশিনকে ভাইরাস মুক্ত করতে যেসব অত্যাধুনিক এবং দ্রুত ব্যবস্থা গৃহীত হয় আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সেসব কল্পনাও করা যায় না।

কোন সংস্থার অসন্তুষ্ট কর্মী প্রতিশোধ হিসেবেও মেশিনটিকে ব্যবহার করতে পারে। ডোনাল্ড বার্লসন নামে জনৈক মার্কিন সিকিউরিটি সংস্থার কর্মী ছাঁটাই হওয়ার পর রেগে গিয়ে সংস্থাটির কম্প্যুটার সিস্টেমে এমন একটি প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দিলেন যে সংস্থাটির ১,৬৮,০০০ নথি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, ভাইরাসটি নিষ্ক্রিয় করতে দুদিন সময় লেগে যায়।

আমাদের দেশে কম্প্যুটার সিস্টেমে ভাইরাস আক্রমণ এখনো ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি, কিন্তু সরকারীস্তরে কম্প্যুটার যোগাযোগের জন্য টেলিকম্যুনিকেশন লাইনের যে বিশাল প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রয়েছে, সেখানে ভাইরাস ঢুকলে তো সমূহ সর্বনাশ! এধরনের একটি নেটওয়ার্ক ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে, ন্যাশনাল ইনফরমেটিকস সেন্টার বা নিকনেট পরিচালিত

'হ্যাকার'!

কম্প্যুটারের ব্যবহার এখন সর্বজনীন। বৃহৎ পরিসর থেকে অতিক্ষুদ্র পরিসর অবধি তার ব্যাপ্তি। এবং যথারীতি, আবির্ভাব ঘটেছে একদল অন্তর্ঘাতকারীর যাদের ইউরোপ আমেরিকায় একটি বিশেষ অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে, 'কম্প্যুটার হ্যাকার' অর্থাৎ কম্প্যুটার ঘাতক। আপনি হয়তো কোন চমৎকার সকালে কীবোর্ডের সামনে বসে গতদিনের বিক্রিবাটার হিসেবটা ঝালিয়ে নিচ্ছেন, হঠাৎ পর্দায় ফুটে উঠল ঝাঁকড়া ক্রিসমাস ট্রী। কিংবা লিখিত ভাবে ফুঠে উঠলো কটি শব্দ—'আপনি হ্যাকারের কবলে!'

হ্যাকারদের দৌরাত্ম্য এখন সর্বত্র, ন্যাটো, পেন্টাগন, ব্রিটিশ টেলিকম, সব দপ্তরে। এই নতুন প্রযুক্তির ছোট্ট পর্দায় হ্যাকাররা যেন একেকটি 'র‍্যাম্বো'। আপনি ভাবছেন, আপনার ব্যক্তিগত মেশিনে আপনার সংরক্ষিত ডেটাগুলি দারুণ গোপনে রয়েছে, অথচ হ্যাকারদের কাছে ঐ গোপনীয়তা ভাঙা কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার।

হ্যাকারদের থাকে একেকটা কোড নাম, আসল নাম তারা কখনো ব্যবহার করে না। জনৈক সুপরিচিত ব্রিটিশ হ্যাকারের পরিচিতি 'প্লাগ' নামে। একসময় ফোন বেজে ওঠে, 'প্লাগ বলছি, না, কথাবার্তা টেপ করবেন না—আমি আপনাকে ১৪ ক্রেডিট দিতে পারি, মানে ১৫ মিনিট।'

যতদূর মনে হল প্লাগ কোন গাড়ি-পথের ফোনবক্স থেকে ফোন করছে। কিংবা সিগারেট প্যাকেটের সাইজের একটি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে রিসিভারে স্বরক্ষেপণ করে চলেছে, 'আর মাত্র ১৩ ক্রেডিট। জিগ্যেস করা হল, তুমি হ্যাকার হলে কেন? জবাব এল, 'আমরা চাই শ্রমিকদের হাতে সংস্থার মালিকানা, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কর্তৃপক্ষের গোপনে সংরক্ষিত ডেটাগুলো জেনে নেওয়া দরকার, ওরা আমাদের আক্রমণ করলে আমাদের হাতেও তো কিছু অস্ত্র থাকা দরকার। আমি এখন যে রেডিও রিসিভারটা ব্যবহার করছি, এটা তুমি স্টোরে ২০০ কুইড (প্রায় ৫০০০ টাকা দিলেই কিনতে পারো, এটা ১০০০ গজের মধ্যে সমস্ত সেল-ফোন ট্রান্সমিশন তুলে নিতে পারে। আমি শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি, ঐ অঞ্চলে দালালগুলো সব পোর্টেবল ফোন ব্যবহার করে, ওগুলো নিজেদের কোম্পানির কম্প্যুটারের সঙ্গে যুক্ত। আমি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং 'পাসওয়ার্ড' (অর্থাৎ কম্প্যুটারের মূল শব্দ সংকেত) গুলো নোট করে নিই।

প্রশ্ন, তোমাদের কি দল আছে?

প্লাগের উত্তর, 'আমি ইউরোপীয়ান গ্রুপ কে জি বি'র সদস্য। আমরা নেটওয়ার্কের ভেতরে অনুসন্ধান চালাবার সময় পরস্পরকে সাহায্য করি, কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না, চিনতে চাইও না। নিজের পরিচয় গোপন রাখাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। তবে, কোন কাজ দেখে কখনো কখনো বুঝে নিতে পারি, এটি বিশেষ কোন হ্যাকারের কীর্তি।'

প্রশ্ন: আচ্ছা প্লাগ, অন্যের কম্প্যুটার সিস্টেমে ঢোকাটা কি সহজ? 'অবশ্যই সোজা, তবে তোমাকে শব্দ সংকেতটা জানতে হবে। তোমার জানা দরকার সেক্ষেত্রে যে, একটা মেশিনের থাকে দ্বিমুখী চ্যানেল। যে নেটওয়ার্ককে আমি আক্রমণ করতে যাচ্ছি, সে—ও কিন্তু একই সঙ্গে আমার সিস্টেমকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে। আমার ফোন লাইন অনুসরণ করে খোঁজার চেষ্টা করছে, পর্দায় জিজ্ঞেস করছে আমি কে, চেষ্টা করছে আমাকে ভুলপথে নিয়ে যেতে, এভাবে প্রচুর সময় নেয় যাতে সে নিশ্চিত হয় যে আমি প্রকৃতই অনুমোদিত ব্যক্তি কিনা। সেই জার্মান ছেলেটা তো এভাবেই ধরা পড়েছিল, ক্যালিফোর্নিয়াতে সে স্টার ওয়ারস—এর রিসার্চ নেটওয়ার্কে নাক গলিয়েছিল, মনে আছে? আমেরিকান মিলিটারি করলো কি, ছেলেটার পথে ফাঁদ পেতে রাখল একটা কম্প্যুটার গেম, বোকা ছেলেটা লোভ সামলাতে পারল না, যেই খেলতে শুরু করল, ব্যস, ব্রেমেন—এ তার সোর্স অবধি ধরা পড়ে গেল। আর মাত্র দু'ক্রেডিট!'

শেষ প্রশ্ন, যদি ধরা পড়ে যাও?

উত্তর: 'না। ওরা যদি ঐ নতুন ইলেকট্রনিক ট্যাগ আমার ওপর ব্যবহার করতে যায়, আমার সেটা হ্যাক করতে লাগবে দু'মিনিট। কি করবো বল তো, ট্যাগের সামনে রেখে দেব একটি মাইক্রোসেট রেকর্ডার, ব্যাটারা যখন তুমি ওখানে আছ কিনা দেখবার জন্য 'কল' করবে, আমি স্বরটা ট্যাপ করবো এবং জবাবী মেশিনে সেটা ঢোকাবো। আবার যখন ওরা ডাকবে, ব্যস, স্রেফ ডাকাতি…')। লাইনটা স্তব্ধ হয়ে গেল এরপর।

হ্যাকাররা যেন মুক্তিফৌজ, ওদের যুদ্ধ বহুজাতিক কম্প্যুটার সংস্থা আই বি এম এবং তার সহযোগী মাইক্রোসফট, অ্যাপল, ট্যাণ্ডি, ট্যাণ্ডেম প্রমুখের বিরুদ্ধে। প্রযুক্তি সন্ত্রাসবাদীরা বৃহদায়তন কর্পোরেশনগুলির কম্প্যুটার সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের সীমারেখা এখনও স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি আই বি এম একটি ফেডারেশন গঠন করেছে, যারা সফটওয়্যার নকলের ব্যবসায় বাধা দিতে চায়। কেননা, কম্প্যুটার তৈরির সফটওয়্যারের ৮০ শতাংশই অবৈধ ভাবে নির্মিত হয়। এর একটা সদর্থক দিকও আছে। কেননা, এটা না হলে কম্প্যুটার প্রযুক্তি এত দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হত না। ছোটখাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সঙ্গতি ততটা জোরালো নয়, অতএব, তারা দু'নম্বরী মেশিন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এসব ব্যাপারও একধরনের 'হ্যাকিং'।

এছাড়া, কম্প্যুটার-শিল্পে একধরনের পাল্টা সার্ভিসিং—এর চালাকি প্রয়োগ করা হয়, সেটাও কিন্তু হ্যাকিং। লণ্ডনের নর্থ-ইস্টার্ন পলিটেকনিকের কম্প্যুটার বিভাগের বিশেষজ্ঞ পিটার উইলিয়ামস—এর মতে, শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মেশিনের ক্ষেত্রে নির্মাতা কোম্পানিগুলি হ্যাকিং—এর আশ্রয় নেয়। যেমন কোন কোন কোম্পানি তাদের মেশিনের ক্ষেত্রে একবছরের গ্যারান্টিসহ সার্ভিসের চুক্তি করে, তার ফী বছরের শেষে দাঁড়ায় প্রায় ৫,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১·৩ লক্ষ টাকা)। কোন সংস্থা বলল, তারা এত টাকার চুক্তি করতে পারবে না। তখন নির্মাতা কোম্পানি সেই মেশিনে একটি বছরখানেক মেয়াদের তথাকথিত 'টাইম বোমা' প্রোগ্রাম করে রেখে দিল। ব্যস, একবছর পর মেশিন বিগড়াতে বাধ্য। আপনি নির্মাতা কোম্পানিকে খবর দিলেন, তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এবার দিন ৬,০০০ পাউণ্ড, তবে কাজ হবে। গত বছরের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এভাবে ২২৫টি কেসে ৩,৮৯০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ এককোটি টাকারও বেশি কোম্পানিগুলি আয় করেছে। এখন, বড় কোম্পানিগুলি অসুবিধে এড়াতে এসব চুক্তিতে রাজী হয়, তাতে নির্মাতা-কোম্পানিগুলি আরো বেশি পেয়ে বসে।

'ট্রোজান হর্স' নামের একটি প্রোগ্রাম আছে, দেখে মনে হয় অতি সাধারণ, কিন্তু এটি মেশিনের ডিস্ক কিংবা সংরক্ষিত ডেটা, সবকিছু এলোমেলো করে দিতে পারে। 'ট্রোজান হর্স' নামের এই অনধিকৃত প্রোগ্রামের মোকাবিলার জন্য অ্যান্টি প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে, তার নাম 'ট্রোজান হান্টার্স'। এরকম আরেকটি ক্ষতিকর ভাইরাস প্রোগ্রাম হলো 'নটরোজ'।

কুখ্যাত ব্রিটিশ হ্যাকার হাইক শিলপ (ছদ্মনাম) হচ্ছেন এখনো অবধি জানা এধরনের প্রথম

একটি জেলা ইনফরমেশন সিস্টেম কাজ শুরু করে দিয়েছে। স্থানীয় কালেকটরের অফিসে অবস্থিত বিভিন্ন কম্প্যুটার একেবারে রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত। জেলা থেকে রাজধানীতে বিভিন্ন গ্রামীণ তথ্য সরবরাহের জন্য এগুলি ব্যবহৃত হবে, যেমন, জমিজমার হিসেবে কতটা সারের প্রয়োজন, খরচ ইত্যাদি। নিকনেট—এর প্রধান, অতিরিক্ত সচিব ডঃ শেষগিরি—র বক্তব্য, নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, কম্প্যুটার—ঘাতক, যাদেরকে পরিভাষা—অনুযায়ী 'হ্যাকার' বলা হচ্ছে, তারা যদি সাবোতাজ করে! সে সম্ভাবনা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অন্য কয়েকটি কম্প্যুটার নেটওয়ার্কের নাম, ইন্দোনেট, সেলনেট, কোলনেট, ব্যাঙ্কনেট ইত্যাদি—এসবের ক্ষেত্রেও কম্প্যুটার জালিয়াতির ঝুঁকি সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। এছাড়াও স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া, কোল ইণ্ডিয়া, ও·এন·জি·সি· প্রভৃতি সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে এবং টেলিফোন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল না থেকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ও এখন নিজেদের জন্য কম্প্যুটার—যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা

ভাইরাসের স্রষ্টা। তাঁর কাহিনী নিয়ে তিনি 'ন্যাটো'র নেটওয়ার্ককে একদা আক্রমণ করেছিলেন। সেটি ছিল পর্দা জুড়ে ক্রিসমাস ট্রীর উপদ্রব। ন্বিলপ বললেন, 'যদ্দূর জানি, ঐ ক্রিসমাস ট্রী ন্যাটো সিস্টেমে এখনো রয়েছে। পরের বছর আমরা ওদেরকে উপহার দিয়েছিলাম ব্যাং–এর হাসি।' এস·আই·এস এন্টারপ্রাইজের ডঃ সলোমন বলেছেন, 'প্রথমদিকের ভাইরাসগুলো বেশিক্ষণ টিকত না। ওগুলো সুযোগমত আত্মগোপন করতে পারত না।' এইসব ইলেকট্রনিক প্লেগের চিকিৎসার কাজে ডঃ সলোমন একজন বিশেষজ্ঞ।

গতবছর ক্রিসমাসের সময় হামবুর্গের আই বি এম অফিসে জ্যাপ নামে জনৈক তরুণ অস্থায়ী চাকরিতে ঢোকে। সে এমন একটি ভাইরাসের নক্সা বানায় যাতে আমেরিকান কোম্পানিটির কম্প্যুটারাইজড ঠিকানা তালিকার বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কে নজর রাখা যায়। সে পারীতে একটি মেশিনে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল, সেখান থেকে আরো কুড়িটি টার্মিনালে, তারপর ৪০০টি মেশিনে তা ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচদিন ধরে কোম্পানিটিকে এই ভাইরাস গ্রাস করে রাখে, সোর্স খুঁজে বের করতে আই বি এম এর কয়েক সপ্তাহ লেগে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ টেলিকম–এর 'ভিউডাটা সিস্টেম' 'প্রেস্টেল'–এর সর্বনাশ ঘটিয়ে ছিল শিফ্রিন, হঠাৎ খেয়ালের বশেই। ২৩ বছর বয়সী যুবকটি যে কোম্পানিতে কাজ করত, সেখানকার–কম্প্যুটার–ভুক্ত পৃষ্ঠায় প্রেস্টেল ছিল গ্রাহক হিসেবে। শিফ্রিন একদিন প্রেস্টেলের ম্যানেজারের নামটা এমনিই পেয়ে যায়। এখন শুধু ম্যানেজারের 'শব্দ সংকেত'টা পেলেই হয়। চাবি টিপতে টিপতে সেটাও তার আয়ত্বে এসে যায় একসময়। গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য তার হাতের মুঠোয় এসে যায়। শিফ্রিনের বিরুদ্ধে পরে জালিয়াতি আইনে মামলা করা হলে আদালত কেসটি শেষপর্যন্ত গ্রহণ করেন না। বলা হয়, দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন ক্ষতিসাধন কিংবা জালিয়াতির প্রমাণ নেই। অর্থাৎ আইন কিন্তু হ্যাকারদের বিপক্ষে যাচ্ছে না!

তবে নির্মাতা-কোম্পানিগুলিও বসে নেই। 'অ্যাপল' সম্প্রতি তাদের একটি মেশিনের অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রাম যাতে কেউ কপি না করতে পারে, তার জন্য একটি 'ট্রোজান'–এর ব্যবস্থা করেছে। আই বি এম–ও ব্যবস্থা করছে বিশেষ সুরক্ষাপদ্ধতির। কিন্তু এই লড়াই এখনও জারি।

–টম ডিউয়ি ম্যাথুজ
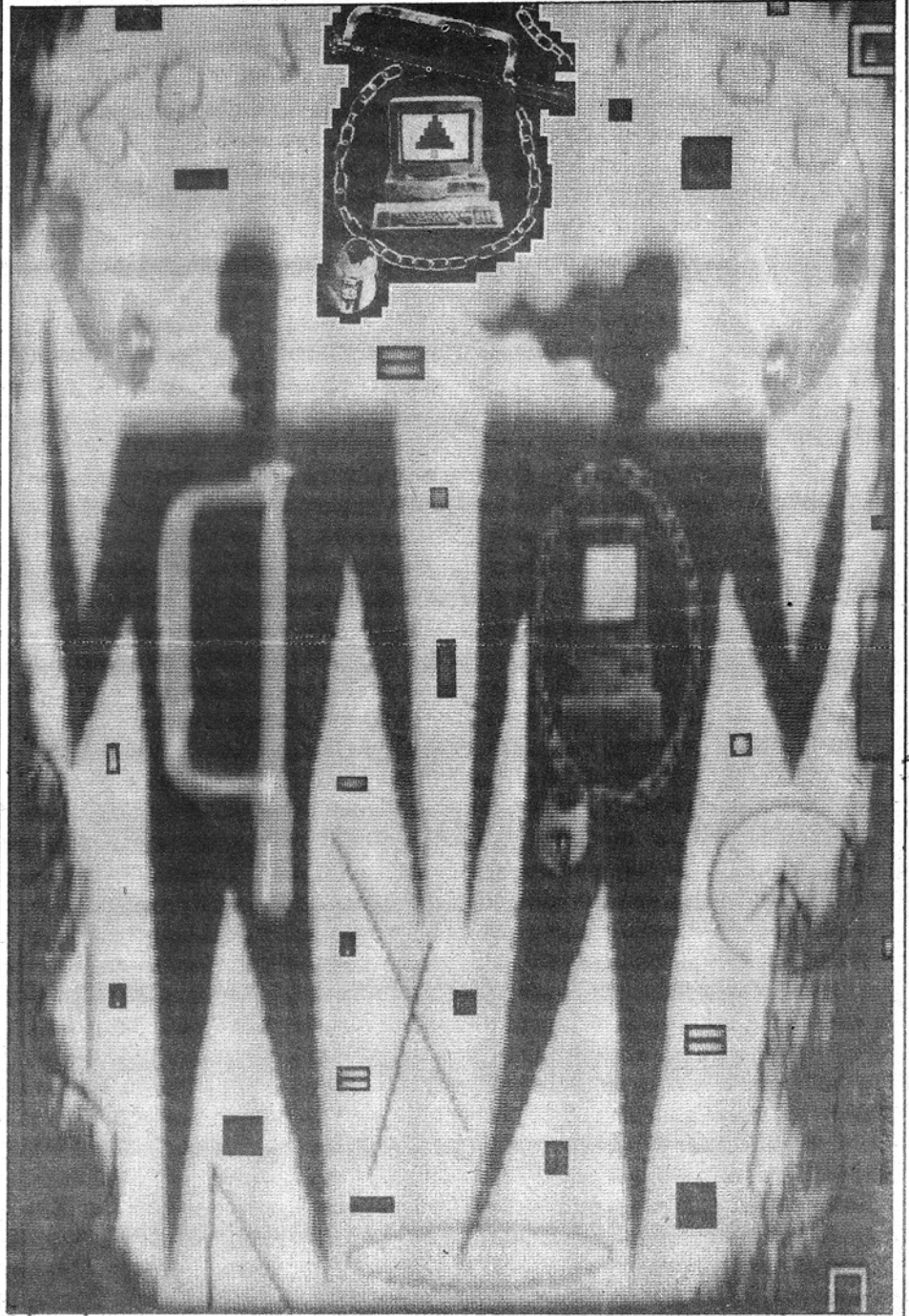
'ইউ আর হ্যাকড'!

ভাবছেন। অন্তর্ঘাত–এর সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে কতটা এড়ানো যাবে, সেটাই প্রশ্ন।

আবার, ডেটা সুরক্ষিত রাখতে হয়তো এমন কঠোর পদ্ধতি গৃহীত হল, যাতে হয়ত তথ্যাদির দ্রুত সরবরাহ ও সমস্যা সমাধানে দেখা গেল অনর্থক বিলম্ব ঘটছে। কম্প্যুটার মেনটেনান্স কর্পোরেশনের শ্রী বালসুব্রহ্মনীয়াম–এর বক্তব্য, এ যেন অতি দ্রুতগতি একটি ব্যবস্থাকে চালু রাখতে গিয়ে নিরাপত্তার বাধা দিয়ে তাকে ক্রমে শ্লথ করে তোলা।

যাই হোক, মেশিনে একটা ক্ষতি হয়ে যাবার পর বিশেষজ্ঞের ডাক পড়ে। ভাইরাস সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সাধারণত কেউ খেয়াল করেন না, যেমন, ডিস্ক স্পেসের হঠাৎ অবনতি, সিস্টেম ফাইলের পরিবর্তন ইত্যাদি। বলা যায়, ডেটা-সংরক্ষণে সতর্কতা গ্রহণের জন্য অদূর ভবিষ্যতে যে বিপুল পরিমাণ বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, ভারতের মত দেশে তা সম্ভব হবে কিনা, সেটা ভেবে দেখার বিষয়।

–সুধা ভাটিয়া

পূর্বোত্তর ভারতের সাত রাজ্যে কংগ্রেসের নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি

আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচল প্রদেশের ২১টি লোকসভা সিটের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস যে রাজনৈতিক কর্মজাল বিছিয়ে দিচ্ছে, তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশায়। বাঙালি উদ্বাস্তু এবং উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সমন্বয় সাধনে সন্তোষমোহন দেব এত তৎপর কেন ? মিজোরামের রাজ্যপাল পদ থেকে হিতেশ্বর শইকিয়ার অব্যাহতি কোন ভবিষ্যৎকে ইংগিত করে ? আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেসের নেপথ্য কর্মকাণ্ডের স্ট্র্যাটেজির দিকে সরজমিন আলোকপাত।

মধ্য বৈশাখের প্রখর উত্তাপ যখন অরণ্যদুহিতা ত্রিপুরার সর্বাঙ্গ দাবদাহে পুড়িয়ে তামাটে করে দিতে চাইছে তখন আগরতলা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তরে কৈলা শহর আর ধর্মনগরের মাঝে উনকোটি পর্বতকন্দরে সীতাকুণ্ডকে লক্ষ্য করে লাখো বাঙালি–উপজাতি পুণ্যযাত্রী জমায়েত হচ্ছিল উনকোটি অর্থাৎ কোটি থেকে এক কম দেবতামণ্ডলীকে দর্শন করতে ! উদ্যোগ ছিল ত্রিপুরার কংগ্রেস ও উপজাতি যুব

উনকোটিতে উৎসব: রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ?

উত্তরপূর্ব ভারতের পাঁচ মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

সমিতির জোট সরকারের। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ত্রিপুরার পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের তরুণ মন্ত্রী তথা রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্‌হা। বিল্লাল মিঞা, বিভা নাথ, রবীন্দ্র দেবশর্মা, কাশীনাথ রিয়াং, নগেন্দ্র জমাতিয়া ও অরুণ করের মত ৬ জন জবরদস্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে নিয়ে সে সময় উনকোটিতে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার এবং রাজ্যপাল কে.ভি. কৃষ্ণরাও। মুখ্যমন্ত্রী রাজধানী আগরতলা ছেড়ে এখানে এসেছেন তিনদিন থাকবেন বলে। প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরা তথা সারা পূর্বোত্তর ভারতের পক্ষে ব্যাপারটি ছিল নিতান্তই অভিনব। আর সেদিনকার সরকারি উৎসবটির সর্বাধিক অভিনব এবং আলোচিত বিষয়টি ছিল ওই মঞ্চে একদা উগ্রপন্থী টি.এন.ভি. নেতা বিজয় রাংখলের উপস্থিতি।

উনকোটির সরকারি সাংস্কৃতিক আসরে উগ্রপন্থী উপজাতি নেতা বিজয় রাংখলের উপস্থিতি সাধারণ মানুষকে যত বিস্ময়েরই সৃষ্টি করুক না কেন ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক মহলকে অবাক করেছিল ওই মঞ্চে পূর্বোত্তর কংগ্রেস সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ দাশ, পূর্বোত্তর যুব কংগ্রেস সমন্বয় সমিতির সহ সভাপতি বীরজিৎ সিন্‌হা এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালথানহাওলা এবং উত্তর পূর্বের উপজাতি মন্ত্রীদের উপস্থিতি। ত্রিপুরা সরকারের এই সাংস্কৃতিক উৎসবটিই তার তাৎপর্যতার কারণে সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের কাজটি কংগ্রেস গত মাস থেকেই শুরু করে দিয়েছে। উত্তর–পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক শক্তির উৎস ছাত্র ও যুব শক্তি, তা কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছে। যদি সেই ছাত্র–যুব শক্তিকে নিজের পতাকাতলে রাখা না যায় তাহলে সেই শক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঝুঁকে যাবে এর প্রমাণ কংগ্রেস পেয়েছে আসামের আসু, নাগাল্যাণ্ডের এন.এস.সি.এন., ত্রিপুরার টি.এন.ভি., মনিপুরের পি.এল.এ., মেঘালয়ের কে.এস.ইউ. এবং মিজোরামের এম.এন.এফ. উগ্রপন্থার মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে রয়েছে পূর্বোত্তর প্রত্যন্তের বিচ্ছিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর রাজনীতি। ভাবতে পারা যায় আয়তনে সমতলের একটি জেলার চেয়েও ছোট যার ভূখণ্ড সেই অরুণাচল প্রদেশেই ১০৮টি উপজাতি গোষ্ঠীর বাস! আবার উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক এমনই যে একটির সঙ্গে আর একটির আদর্শগত ফারাক দুস্তর। অথচ এদের একসূত্রে গাঁথতে না পারলে উত্তরপূর্ব ভারতে দেশের সার্বভৌমত্বই বিপন্ন হতে পারে। কেননা পূর্বোত্তরের উত্তরে চীন, পূর্বে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে আরাকান–বর্মা সীমান্ত। আর এই সীমান্তগুলিতে অন্য সব কিছু স্মাগলিং এর চেয়ে ব্যাপক হারে যেটা স্মাগল্‌ড হয় সেটা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এ হেন ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে পূর্বোত্তরের সাতটি ভগ্নীরাজ্যে আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিগুলি যেমন আসামে অ গ প, মিজোরামে লালডেঙা, নাগাল্যাণ্ডে পিপলস্ পার্টি প্রভৃতিরা ছাত্র–যুব শক্তিকে প্রয়োজন মত কাজে লাগিয়ে এবং নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক আঁতাত গড়ে ভোট-সিদ্ধির কাজটি ভাল ভাবেই করে আসছিল।

উত্তর পূর্ব ভারতের উপজাতি সাইকোলজি বিষয়ে অভিজ্ঞ নেতা হিতেশ্বর শইকিয়াকে রাজীব ততদিনে মিজোরামের রাজ্যপাল বানিয়ে রাজ-

নৈতিক নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। হিতেশ্বরের অনুপস্থিতিতে তাঁরই দেখানো রাজনৈতিক রাস্তায় পা দিলেন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড। তাই ১৯৮২ সালে হিতেশ্বর শাইকিয়ার উদ্যোগে ইটানগরে গঠিত 'উত্তরপূর্ব কংগ্রেস সমন্বয় কমিটি'কে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে আবার বাঁচিয়ে তোলা হল। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণ সাংমাকে সভাপতি ও ত্রিপুরার আই.এন.টি.ইউ.সি. নেতা আশুতোষ দাশকে সম্পাদক করে ফের সমন্বয় কমিটিকে বাঁচিয়ে তোলা হল। অন্যদিকে ছাত্র–যুব শক্তিকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগাতে অরুণাচল প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি কে. তাইপুড়িয়াকে চেয়ারম্যান করে সাতরাজ্য জুড়ে গঠিত হল যুব কংগ্রেস সমন্বয় কমিটি। কংগ্রেস সমন্বয় কমিটির প্রধান দপ্তর বসল গৌহাটিতে এবং যুব কংগ্রেসের প্রধান দপ্তর বসল শিলচরে। এরপর যুব কংগ্রেস সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সাতরাজ্যে শুরু হল সাংস্কৃতিক–ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পারে যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ছাড়া শুধুমাত্র রাজনৈতিক বুলি দিয়ে সাত উপজাতি প্রধান রাজ্যে নিরংকুশ আধিপত্য রাখা যাবে না। এ জন্য উত্তরপূর্ব যুব কংগ্রেসের নেতা ও ভাইস চেয়ারম্যান বীরজিৎ সিন্‌হাকে সম্পাদক করে কংগ্রেস উত্তরপূর্বে খুলে বসল সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং নাগাল্যাণ্ডে জোয়ার এল কংগ্রেসী সাংস্কৃতিক উদ্যোগের। উনকোটির উৎসব সেই রাজনৈতিক দর্শনের একটি সফল পদক্ষেপ।

উপজাতিদের সাংস্কৃতিক জীবনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগকে সফল করে কংগ্রেস ব্যাপকতর রাজনৈতিক চাল নিক্ষেপ করল বিচ্ছিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক বিবাদের মধ্য থেকে ফায়দা তোলার বিষয়ে। আর এর হেড কোয়ার্টার হয়ে উঠল শিলচরে অবস্থিত কেন্দ্রিয়মন্ত্রী সন্তোষদেবের আবাসস্থল। বিরোধী দলের বিশিষ্ট নেতারা, যেমন–মেঘালয়ে বি.বি. লিংডো, মিজোরামে চঙ্‌জোয়ালা, ত্রিপুরায় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, মনিপুরে সনাবা সিং, অসমে সংখ্যালঘু মোর্চা আবসু এবং আক্সাকে কংগ্রেস রাজনৈতিক ভাবে কাছে টেনে নিল। ফলত নির্বাচনী যুদ্ধে ব্যাপক পরাজয়ের আশংকা থাকা সত্ত্বেও মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডে সরকার গড়ল কংগ্রেস।

৭ এপ্রিল; দক্ষিণ কলকাতার মিজোরাম ভবনে শুরু হল ৬ উপজাতি মুখ্যমন্ত্রীদের রুদ্ধদ্বার রাজনৈতিক বৈঠক। আর এখানে উত্তরপূর্বের ৫ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এসে মিললেন সিকিমের অ–কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারি। পূর্বোত্তর কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণ সাংমার উদ্যোগে পূর্ব ভারতের পঞ্চায়েত সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আগত অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত

সংস্কৃতির পথ বেয়ে রাজনীতিতে!

এই বৈঠকটি রাজনৈতিক দিক থেকে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এরসঙ্গে জড়িত আছে নেপালী রাজনীতির অংশটি যা সারা পূর্ব ভারতের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়।

উত্তর পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্ন উপজাতি গোষ্ঠগুলি কোনকালেই ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। তবু বিরোধী আঞ্চলিক শক্তিগুলি যেমন অ গ প–র প্রফুল্ল মহন্ত, এম.এল.এফ.–এর লালডেঙা, টি.এন.ভি. নেতা বিজয় রাংখল, খাসিয়া নেতা বি.বি. লিংডা, লুসাই নেতা চঙ্‌জোয়ালা এবং নাগাল্যাণ্ডের বিরোধী নেতা ভামুজোর নেতৃত্বে আঞ্চলিক শক্তিগুলি যতটুকু ঐক্য গড়তে পারবে তাকে নির্বাচনী যুদ্ধে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলা যাবে যদি নেপালী এবং বাঙালিদেরকে কংগ্রেস আগামী লোকসভা নির্বাচনে নিজের পাশে রাখতে পারে। এই বিরোধী উপজাতি ঐক্য এবং নেপালী–বাঙালি রাজনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ত করার জন্য কংগ্রেস দুটি রাজনৈতিক চাল চালল। প্রথমত, উত্তর পূর্বের কংগ্রেস সরকারগুলিতে ডেকে নেওয়া হল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলির কয়েকজনকে। মেঘালয়ের বিরোধী নেতা বি.বি. লিংডোকে করা হল রাজ্য যোজনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, বিক্ষুব্ধ এম.এল.এফ. নেতা চঙ্‌জোয়ালাকে করা হল রাজ্যমন্ত্রী, টি.এন.ভি.–র বিজয় রাংখলকে করা হল উপজাতি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান।

এরপরই কংগ্রেসের লক্ষ্য হল নেপালী ও বাঙালিদের মত উত্তরপূর্বের ব্যাপক রাজনৈতিক শক্তিকে নিজের তাঁবুতে আনা। তাই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে যখন কলকাতার যুব ভারতী

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার

ক্রীড়াঙ্গনে সরকারি উদ্যোগে শুরু হল পঞ্চায়েত সম্মেলন তখন তারই মধ্যে একটি রাজনৈতিক অপারেশান সম্পূর্ণ করার জন্য সন্তোষমোহন দেবের দক্ষিণ হস্ত কমলেন্দু ভট্টাচার্য এলেন কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। তারিখটি ছিল ৮ এপ্রিল।

বৈঠকের ব্যবস্থা হল দক্ষিণ কলকাতার মিজোরাম ভবনে। সেখানে ডেকে আনা হল কংগ্রেসের সাম্প্রতিক কাজকর্মে ক্ষুব্ধ সিকিমের

মুখ্যমন্ত্রী নববাহাদুর ভাণ্ডারীকে—যিনি উত্তরপূর্ব ভারতে নেপালীদরদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

সম্প্রতি কংগ্রেসের যে দুটি কাজকে কেন্দ্র করে নরবাহাদুর ভাণ্ডারী ক্ষিপ্ত, তা হল তাঁরই পত্নী সাংসদ দিলকুমারীকে কংগ্রেসের তরফে প্রশ্রয় দান এবং নরবাহাদুরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিষয়ে সি বি আই তদন্ত নিয়ে। ইদানিং তৃতীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে দিলকুমারীর সঙ্গে নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর বিরোধ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষতার পর্যায়ে চলে গেছে। এসময়েই কংগ্রেস তাঁকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করে। এবং ওই দিলকুমারীর পরামর্শ মতই সিকিম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে লেণ্ডদুবা দোরজিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এর ফলে চটে যান নরবাহাদুর। তিনি ট্যাক্স ইস্যু তুলে কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে তিন দিনের সিকিম বন্ধ সম্পন্ন করেন এবং প্রকাশ্যেই ভি.পি. সিং-এর সঙ্গে বৈঠকে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন

নরবাহাদুর ভাণ্ডারী যে শুধুমাত্র সিকিমেরই একচ্ছত্র নেতা তাই নন, পূর্বভারতের বিহার, বাংলা, মেঘালয় ও আসামের নেপালী উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। নেপালী ভাষাকে সংবিধানের তপশিলভুক্ত করার জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া

সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারী

আশুতোষ দাসকে সম্পাদক করে সমন্বয় কমিটি

ত্রিপুরায় প্রধান বিরোধী দল সি পি এম এখন উপজাতি নেতা দশরথ দেবের অধীনে। পরাজিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর হাত থেকে সাংগঠনিক ক্ষমতা গিয়েছে দশরথ দেবের হাতে।

উদ্বাস্তু নেপালীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টিও তাঁরই আন্দোলনের ফলশ্রুতি এসব দিকে তাকিয়ে নরবাহাদুরের কংগ্রেসবিরোধী শিবিরে থাকাটা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে নিরাপদ নয়। বিশেষত যখন নেপালের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সরবরাহ নিয়ে কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল উত্তরপূর্বের বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার সুধীর রঞ্জন মজুমদারকে ওই বৈঠকে অংশ নিতে দেখা যায় নি। যদিও তিনি সেদিন পঞ্চায়েত সম্মেলনে যোগ দিতে এসে কলকাতার ত্রিপুরা হাউসে ছিলেন

আসলে উত্তর পূর্ব ভারতে বাঙালি ও উপজাতিদের সহানুভূতি আদায়ে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড দুটি পৃথক রাজনৈতিক লাইন নিয়েছেন একদিকে উপজাতিদের সন্তুষ্ট করতে অবৈজ্ঞানিক জুম প্রথার চাষকে কংগ্রেস সরকারগুলি বিনা বাধায় উত্তর পূর্বের পাহাড়গুলিতে অবাধে করতে দিয়েছে। সরকারি বাধা নিষেধ না থাকায় ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও মেঘালয়ে পাহাড়ি বনাঞ্চল পুড়িয়ে গাছ নষ্ট করে পাহাড়ি উপজাতিরা দেদার জুম চাষের জমি বানাচ্ছে। ফলত এতে বনসম্পদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কংগ্রেসের রাজনৈতিক জমিন উন্নত হচ্ছে এছাড়া স্থানীয় কংগ্রেসের সরকারগুলি পাহাড়ের ঢালে চা ও রাবার চাষ করার জন্য ব্যাপক হারে লোন ও অনুদান দিচ্ছে উপজাতিদের। অন্যদিকে সমগ্র উত্তরপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারি বাঙালিদের স্বপক্ষে টানতে কংগ্রেস কর্মকর্তাদের একাংশ অতীব গোপনে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ঢালাও ভাবে ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব প্রদানের চেষ্টা করে যাচ্ছে

ত্রিপুরায় প্রধান বিরোধী দল সি পি এম এখন উপজাতি নেতা দশরথ দেবের অধীনে। পরাজিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর হাত থেকে সাংগঠনিক ক্ষমতা গিয়েছে দশরথ দেবের হাতে ফলত উপজাতিদের মধ্যে নিজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে দশরথ দেব বাঙালি উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারে নেমে গেছেন। অন্যদিকে আসামেও বর্ণ হিন্দু অসমীয়া অধ্যুষিত অসম গণ পরিষদ তো নীতিগত ভাবেই বাঙালি বিতাড়নের পক্ষে। এর ফলে সারা উত্তরপূর্ব ভারতে সি পি এম ও অসম গণ পরিষদের মত কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ২১ লক্ষ উদ্বাস্তু বাঙালির কাছে বিদ্বেষের পাত্র হয়ে গেছে এতে পরোক্ষে লাভবান হচ্ছে কংগ্রেস।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ঢালাও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। এর ফলে গত দুই দশক জুড়ে সারা পূর্ব ভারতে বাঙালি নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া দুই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং নৃপেন চক্রবর্তী উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক সহানুভূতি হারাতে শুরু করেছেন। এছাড়া অসম নাগাল্যাণ্ড এবং ত্রিপুরায় বাঙালিরা যখন উপজাতি উগ্রপন্থীদের হাতে গণহত্যার শিকার হচ্ছিল তখন সি পি এম—এর এই দুই মুখ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে খুব একটা সরব না হলেও, সে সময় কংগ্রেসের স্থানীয় বাঙালি নেতারা সন্তোষমোহন দেব, সুধীররঞ্জন মজুমদার, শান্তি দাশগুপ্ত, সুরজিৎ দত্ত, মতিলাল সাহা, আশুতোষ দাশ ও কমলেন্দু ভট্টাচার্যরা বাঙালিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন

এছাড়া বিরোধি দলগুলির সমন্বিত শক্তি কট্টর বাঙালি বিরোধী অসম গণ পরিষদকে শরীক হিসাবে নেওয়া উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালিরা নিশ্চিত ভাবে আত্মরক্ষার তাগিদে কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকবেন। কেন্দ্রিয় ক্ষমতায় সাম্প্রতিককালে সন্তোষমোহন দেবের উত্থান ছিন্নমূল উদ্বাস্তু বাঙালিদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়াতেই সাহায্য করেছে। সেজন্যই

কংগ্রেস হাইকমাণ্ড সন্তোষমোহন দেবকে জনপ্রিয় বাঙালি নেতা হিসাবে প্রোজেক্ট করছেন। আর এই প্রেক্ষাপটে সন্তোষ মোহন স্বরাজ্য অসম ছেড়ে প্রায়শই ছুটে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, ওড়িশা এমন কি বিহারের বাঙালি অধ্যুষিত বেল্ট গুলিতে। এবং শুধু এই কারণেই উত্তরপূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ যোগাযোগ স্থল গৌহাটি পূর্বোত্তরের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও সন্তোষমোহনের নিজ শহর শিলচরকে উত্তরপূর্ব কংগ্রেসের প্রধান ঘাঁটি বানানো হয়েছে। এখানে বসেই পূর্বোত্তর কংগ্রেস সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ দাশ প্রতিবেদককে বললেন, 'আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজীব গান্ধীকে আমরা ২১টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২১টিই দেব। গত এক বছরেই আমরা জয় করেছি ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়। এবার আসামেও ধ্বস নামছে ওদের।

উত্তর পূর্ব ভারতের চারটি রাজ্য, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ডে কংগ্রেসের যে পলিটিক্যাল পলিসি নির্বাচনী সাফল্য এনে দিয়েছে তাকেই সারা পূর্বোত্তর তথা পূর্বভারতে প্রয়োগ করা হবে বলে মনে হয় কারণ—ওই চারটি রাজ্যের বিধান সভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকেই একটি আঞ্চলিক শক্তির অংশ বিশ্লেষের সঙ্গে মোর্চা করেছে। অন্য দিকে আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থী সংস্থাগুলির সঙ্গে আণ্ডার গ্রাউণ্ড আঁতাত করেছে। ত্রিপুরায় উপজাতি যুব সমিতি ও টি.এন.ভি., মিজোরামে বিক্ষুব্ধ এমএনএফ.(মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট–ডি) মেঘালয়ে বি.বি. লিংডোর হিল পিপলস ইউনিয়ন, নাগাল্যাণ্ডে এস.সি. জামিরের উদ্যোগে আত্মগোপনকারী উগ্রবাদী সংগঠন এন.এস.সি. এন (ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যাণ্ড) এর সহায়তা নেওয়া হয়। পরিবর্তে কংগ্রেস কথা দেয় সরকারে এলে কংগ্রেস তাদের আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ করে দেবে। নির্বাচনের পরে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মত টি.এন.ভি. এবং এন.এস.সি. এন.—এর গেরিলাদের পুনর্বাসনের কাজ ত্রিপুরা ও নাগাল্যাণ্ডের দুই কংগ্রেসী সরকার শুরু করে। অন্যদিকে মেঘালয়ে লিংডোকে এবং ত্রিপুরায় রাংখলকে বড় সরকারি পদ দেওয়া হয়েছে। মিজোরামে এম.এন.এফ.–ডি.–র দুই নেতাকেই যথাক্রমে মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

সম্প্রতি মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী জয়চন্দ্র সিং মনিপুরী উগ্রপন্থী সংস্থা পি এল ও (পিপলস লিবারেশন অ্যাসোসিয়েশন)'র সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন; অন্যদিকে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণসাংমা ও জংগী ছাত্র সংস্থা কে.এস.ইউ তথা খাসিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছেন।

নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এস.সি. জামির তাঁর রাজ্যের উগ্রপন্থীদের অংশবিশেষ যে আলোচনা টেবিলে বসতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে আসতে পারে তার কথা স্বীকার করলেন। এবং তিনি এও স্বীকার করলেন যে তাঁর সরকার ইতিমধ্যে সে ব্যাপারে খানিকটা উদ্যোগও নিয়েছেন। তিনি বললেন, 'রাজীব গান্ধীর পঞ্চায়েতী উদ্যোগে উপজাতি এবং মেয়েদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ঘোষণা এবং সার্থক উদ্যোগই আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সফল ট্রাম্পকার্ড হবে।' তাছাড়া পঞ্চায়েতে বর্তমানে উপজাতিদের যে পৃথক পদ্ধতি আছে—তাকেও রাজীব গান্ধী সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সম্ভবত কর্ণাটকের পর কেন্দ্রিয় সরকার প্রস্তুত হচ্ছেন অ গ প সরকারকে ফেলার জন্য। সেজন্যই ১ মে দুদিক থেকে অসমের অ গ প সরকারের দিকে আশংকার বাতাস বয়ে নিয়ে এল (১) রাজ্যপাল পরিবর্তন ও (২) হিতেশ্বর শইকিয়ার রাজ্য রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশ—এর মধ্যে দিয়ে।

মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালথানহাওলা উত্তর পূর্বে কংগ্রেসের জবরদস্ত স্তম্ভ। তিনিই সম্প্রতি এম.এন.এফ. নেতা লালডেঙ্গাকে পরাস্ত করে মিজোরামকে কংগ্রেসের পক্ষে এনে দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'লালডেঙ্গা এক সময় মিজোদের মধ্যে প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক ছিলেন, কিন্তু তার হাতে ক্ষমতা দিয়ে যেইমাত্র মিজো জনগণ বুঝলেন যে তিনি আসলে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ধ্বজাধারী এবং মিজো সেন্টিমেন্টকে স্বস্বার্থে পরিচালিত করেছিলেন—তারা এম.এন.এফ.–কে পরাজিত করে কংগ্রেসের পক্ষে রায় দিলেন। এবং আমি মনে করি এরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে।'

কংগ্রেসের অসম–স্ট্র্যাটেজি

উত্তরপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র হল অসম, অসমের একদিকে গৌহাটি ও অন্যদিকে শিলচর যথাক্রমে মেঘালয়, অরুণাচল, মনিপুরের এবং মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও ত্রিপুরার প্রধান দুটি কেন্দ্র। তাই উত্তরপূর্বের রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহও ওই দুটি কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত।

কংগ্রেসের কেন্দ্রিয় নেতারা ওই দুটি প্রধান কেন্দ্রের আশপাশেই দুটি ক্ষতস্থান বানিয়েছেন যে ক্ষতস্থান দিয়ে রাজনৈতিক ক্রিকেটের ঘূর্ণিবল সহজেই প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারবে। গৌহাটির পার্শ্ববর্তী জেলা কোকাড়াঝাড় এবং দরং জেলার উদলগুড়িতে আবসুর উদ্যোগে বোড়োল্যাণ্ড লড়াই এবং শিলচর ও কাছাড়কে কেন্দ্র করে বাঙালি ছাত্রদের সংস্থা 'আকসা'র তীব্র অ গ প–বিরোধী কাজকর্মে প্রফুল্ল মহন্ত সরকারকে বেশ বিপাকে ফেলেছে। আবসু'র সর্বাধিনায়ক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এবং আকসার নেতা প্রদীপ দত্তরায় উভয়েই যথাক্রমে সন্তোষমোহন দেব এবং বুটা সিং–এর আশ্রয়ধন্য। উপেন ব্রহ্ম নয়া দিল্লিতে সরকারি আশ্রয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। অন্যদিকে বুটা সিং ও হিতেশ্বর শাইকিয়ার স্নেহ ধন্য প্রদীপ দত্ত রায় বিক্ষুব্ধ অসম রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি কিরিপ চালিহার সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগও নাকি করেছেন। সেজন্যই (সম্ভবত) ২ মে কিরিপ চালিহাকে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তড়িঘড়ি দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্ভবত কর্ণাটকের পর কেন্দ্রিয় সরকার প্রস্তুত হচ্ছেন অ গ প সরকারকে ফেলার জন্য। সেজন্যই ১ মে দুদিক থেকে অসমের অ গ প সরকারের দিকে আশংকার বাতাস বয়ে নিয়ে এল (১) রাজ্যপাল পরিবর্তন ও ২) হিতেশ্বর শাইকিয়ার রাজ্য রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশ—এর মধ্য দিয়ে। এপ্রিলের শেষে অসমের রাজ্যপাল ভীষ্ম নারায়ণ সিংহকে সরিয়ে রাজস্থানের কংগ্রেস নেতা হরিদেও যোশীকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে। এবং ওই একই সপ্তাহে মিজোরামের রাজ্যপাল পদ থেকে হিতেশ্বর শাইকিয়ার পদত্যাগ পত্রও গৃহীত হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে ট্রাংক টেলিফোনে হিতেশ্বর শইকিয়া জানিয়েছেন যে ৫ মে তিনি দেশে ফিরছেন এবং তারপর তিনি নিজ নির্বাচন কেন্দ্র নাজিরাতে গিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে মনোনিবেশ করবেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে রাজ্য কংগ্রেসে বড়ধরনের রদবদল আসন্ন।

এখন অসমে সেই সত্তর দশকীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির বাতাস বইছে। একদিকে বোড়ো, অন্য দিকে বাঙালি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে মিলেছে কার্বি আলং–এর পাহাড়ি উপত্যকার কার্বিরা। অসমের অহোম সম্প্রদায়ের প্রধান শক্তিশালী প্রতিনিধি হিতেশ্বর শইকিয়া। অসম গণ পরিষদ জমানায় অহোমরা কম হেনস্থা হয় নি। পুলিশ, প্রশাসন, সরকারি সুযোগ সুবিধা সর্বত্রই বঞ্চিত তারা। এবার হিতেশ্বর আসায় তাদের বিক্ষোভের গতি ত্বরান্বিত হবে নিঃসন্দেহে।

সব মিলিয়ে বোধহয় উত্তর পূর্ব ভারতে কংগ্রেসের পাল্লাই ভারী।

রমাপ্রসাদ ঘোষাল
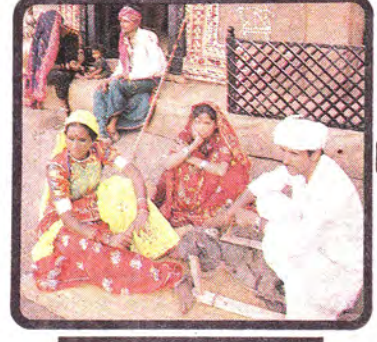
ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

পর্বতপুত্র ভি·কে·নেগি

শীর্ষারোহন, এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা !

মানালি পর্বতারোহন প্রশিক্ষণ শিবিরের শিক্ষার্থীদের সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে বুকটা অকস্মাৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে। পশ্চিম হিমালয়ের এক ছোট্ট উদ্যান ধুন্দি। তার একদিকে বয়ে চলেছে বিয়াস নদী। অন্যদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর পর্বত শ্রেণী। মাঝখানের ছোট্ট একটুকরো জমিতে পড়েছে মানালি পর্বতারোহন ইনস্টিটিউট আয়োজিত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। প্রশিক্ষণ শিবিরে সাত শিক্ষার্থীর সঙ্গে রয়েছেন ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার প্রশিক্ষক ভি. কে. নেগি।

লোকালয়বিহীন হিমালয়ের ধুন্দি থেকে প্রত্যেক দিন যাত্রা শুরু হত বরফের রাজ্যে। ফের ফিরে আসা হত ধুন্দির ক্যাম্পে। ক্রমে প্রশিক্ষণের আনন্দের দিনগুলি শেষ হয়ে এল। কিন্তু ফেরার ঠিক আগের দিনই ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি। সেদিন 'হাইট গেইনে' উঠতে হয়েছিল ছ'হাজার ফুটের বেশি উচ্চতার একটি পর্বতশিখরে। সূর্য ওঠার অনেক আগে যাত্রা করেছিল শিক্ষার্থীরা। দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ শৃঙ্গ জয় করে যখন নিচে নেমে এল ঘড়িতে তখন দুপুর আড়াইটে। হঠাৎই শোনা গেল একটি লোক বিয়াসের জলে ভেসে গেছে। শিক্ষার্থীরা শুনেই ছুটল ঘটনাস্থলে। গিয়ে সবাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খরস্রোতা পাহাড়ী নদী বিয়াসের তীরে। এই মুহূর্তে কি করা উচিৎ ? নদীর অন্যদিকে পাহাড়ের খাড়া

পর্বতারোহনের কষ্টকর অধ্যায়

ঢালের গায়ে লোকটি আটকে আছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে পাহাড়টিকে আঁকড়ে ধরতে। এদিকে বিয়াসের তীব্র স্রোত তাকে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ এরকম হলে লোকটি ভেসে যাবে জলের তোড়ে। কিন্তু বিয়াসের স্রোত পার হয়ে বিদেশি লোকটিকে উদ্ধারই বা করা যাবে কিভাবে?

চোখের সামনেই একটা প্রবল জলের টান ভাসিয়ে নিল লোকটিকে। প্রায় অচেতন দেহটি বেশ কিছু দূর ভেসে গিয়ে আটকে গেল একটা বড় শিলাখণ্ডের গায়ে। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিক্ষার্থীরা, ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ি কয়েকটা মানুষ। হঠাৎ সবাইকে পাশে সরিয়ে দিয়ে একজন খরস্রোতা বিয়াসের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলের তোড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে গেল অচেতন মানুষটির কাছে। সেই মুহূর্তে শিক্ষার্থীরা ভেবে উঠতে পারছে না, কে ঝাঁপ দিল জলে। শেষে আরেকজন নিশ্চিত মৃত্যুর বলি হয়ে যাবে না তো! লোকটি ফিরেও তাকাল না পেছনে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল বিদেশির অচেতন দেহটিকে। উদ্ধারকারী আর কেউ নন, মানালি পর্বতারোহনের সিনিয়ার প্রশিক্ষক ভি.কে নেগি!

ছিপছিপে গড়ন, মেদবর্জিত শরীর কিন্তু মুখে সব সময়ের জন্যই লেগে রয়েছে এক আত্মতৃপ্তির হাসি। আজ যে অচেতন দেহটিকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে দিলেন জানা গেল তাঁর সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। পরিচয় পত্রে তাঁদের আমেরিকা নিবাসী বলা হলেও আসলে তাঁরা এসেছিলেন ইজরায়েল থেকে। পথ ভুল করে তাঁদের জীবন শুধু বিপদে নয়, মৃত্যুর দ্বারে হাজির হয়েছিল।

হিমাচল প্রদেশের মানুষ নেগি ১৯৭৯ থেকে একের পর এক শৃঙ্গ জয় করেছেন। সাংলার কিন্নরে জন্ম তাঁর। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ১৯৭৫–এ যোগ দেন আর্মিতে। আর্মিতে থাকাকালীন নেগি শিখতেন স্কিইং, মাউন্টেনিয়ারিং এবং বক্সিং।

নেগি পশ্চিম হিমালয়ের আই বি এক্স (২১, ০০৮ ফিট উচ্চতার) শৃঙ্গ জয় করেন ১৯৭৯–এ। ১৯৮০ তে কাশ্মীর হিমালয়ের 'স্টক পিক' বিজয়। ১৯৮১তে সিয়াচেন গ্লেসিয়ারের শালথ্রো পর্বত শিখর (২৫,৪০০ ফিট) জয়। ১৯৮১ তেই আবার সিয়াকাংরি ও ইন্দ্রকল পর্বতশৃঙ্গ জয়। ১৯৮৪তে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর কে–১২ এবং গাড়োয়াল হিমালয়ের শিবলিঙ্গ (২১,৩০০ ফিট) জয়। 'ফ্রন্ট ফেজ' দিয়ে শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ জয়ের বিরল সম্মান প্রথম অর্জন করেছেন ভি কে নেগিই।

এত অভিজ্ঞতা, এত নিষ্ঠা, এত সাহস যে মানুষটিকে ঘিরে ঔজ্জ্বল্য পায়, সেই মানুষটির জীবনের সঙ্গে একটি কষ্টবোধও জড়িয়ে আছে
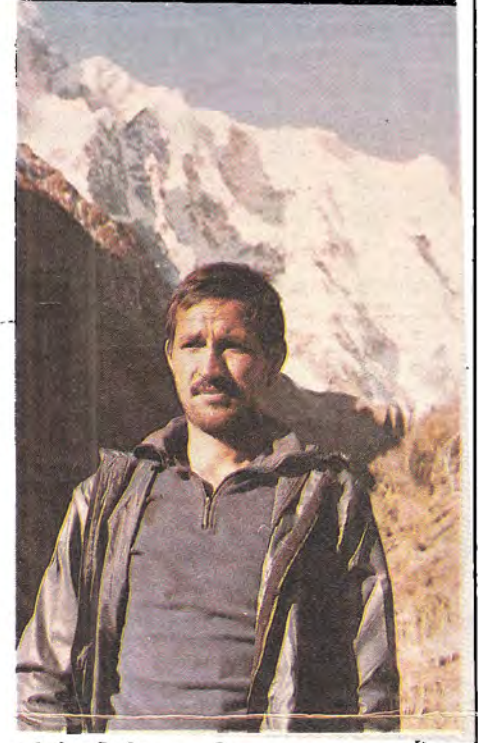
পর্বতবিজয়ী ভি.কে. নেগি

পর্বত আরোহনের পথে অনেক মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী ভি. কে. নেগি হিমালয়ের ভয়াল হাতছানির ভয়ালতম ঘটনাগুলি ব্যক্ত করেছেন নিজ অভিজ্ঞতার নিরিখে।

অস্টপ্রহরের জন্য। ১৯৮৫র সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের এভারেস্ট অভিযানের সময়ে হিমালয়ের আগ্রাসী তুষারঝড় আর তুষার ধ্বস চিরকালের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে গেছে নেগির পাঁচ সহযাত্রীকে। সেবার শুধু হারাতেই হয়েছে তাঁদের, জয় করা আর সম্ভব হয়নি। ১ নং থেকে ৬ নং তাঁবুর যাত্রাপথটার কথা ভাবলে আজও চমকে ওঠেন তিনি। ঠিক ছিল অভিযাত্রী দল এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেই ফিরবে। কিন্তু যাত্রার পর থেকেই দুর্যোগ। আবহাওয়া এত খারাপ যে এগোনই যায় না। তবু অসীম মনোবল নিয়ে অভিযাত্রীরা এগিয়েছেন বরফের ওপর দিয়ে। হিমালয়ে পাঁচ যাত্রী হারিয়ে যাওয়ায় এবং তুষার ঝড় না কমায় শেষ পর্যন্ত ২৮,০০০ ফুটের তাঁবু থেকে এভারেস্ট অভিযাত্রীদের জন্য নির্দেশ গেল সদলবলে নিচে ফিরে আসার জন্য। সেবারের অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার অপমান যত না নেগিকে কষ্ট দেয়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট দেয়, সহযাত্রীদের মর্মান্তিক ভাবে অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা। পুরনো সেই প্রসঙ্গ উঠলেই নেগির চোখ দুটি স্থির হয়ে যায়, ব্যথায় টন টন করে ওঠে বুক।

বললেন, সে ছিল অভিশপ্ত অভিযান। এত সাহস, এত পরিশ্রম, এত নিষ্ঠা সত্ত্বেও সেদিন হিমালয় বিরূপই শুধু নয়, আমাদের উপর নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। না হলে এরকম কৃতী পর্বতারোহীরাও হিমালয়ে লীন হতে পারে কখনো?

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ১৯৮৫—র পর পুনরায় এভারেস্ট অভিযান আয়োজন হবার কথা ১৯৯০ তে। আশা করি তাতে আমিও নির্বাচিত হব। শুধু নির্বাচিত হলে চলবে না, এবারে আমাকে এভারেস্টে উঠতেই হবে। শুধু আমার জন্য নয়, আমার সহযাত্রীদের অভিলাষ পূরণের জন্যও। যদি উঠতে পারি, আমি মনে করি সহযাত্রীদের আত্মার শান্তিকল্পে হিমালয়ের তুষারধ্বসকে আর শৈত্যপ্রবাহকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলতে পারব, 'শৃঙ্গরাজ! তুমি আমাদের হার মানাতে পারনি।' সহযাত্রীদের অসমাপ্ত কাজ আমাকে করতেই হবে।

যে মানুষটি সিয়াচেন গ্লেসিয়ার অভিযানের সময়ে দুর্যোগের মুখে আশ্চর্যজনকভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন, দুর্যোগের কারণে সেই মানুষটি এভারেস্ট অভিযান থেকে পিছু হঠে এসেছেন একথা ভাবতেই তাঁর কষ্ট হয়। বললেন, তখন শালথ্রো জয় করে ফিরছি। হঠাৎই উজ্জ্বল আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে ফেলল, বাদলার দিনে চারদিক ছেয়ে যেমন অন্ধকার নেমে আসে, পৃথিবীর উপর ঠিক তেমনি কালোর একটা স্রোত বয়ে এল। পেছনে গর্জন বাড়ছে। বাতাসের দাপাদাপি। আর রক্ষে নেই! কম করে ১২০ কি.মি. বেগে পেছু তাড়া করছে হাওয়া, তুষার ঝড়। সঙ্গীদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম, যে করেই হোক আত্মরক্ষা করতে হবে। স্কিইং ছাড়া উপায় নেই। উঃ! সে কি অবস্থা। প্রাণপণ স্কিইং করছি। তুষারঝড় ঠিক আমাদের পিছু পিছু। একবার ধরে ফেললে বেঁচে ফেরার উপায় নেই। কিন্তু বরাত জোরে আর প্রচণ্ড মানসিক শক্তিতে আমরা ক্ষিপ্রশরের মত করেছিলাম স্কিইং। কম করে ১২০ কিমি.র উপর বেগে। তারপর একটা খাদের আড়ালে ঢুকে পড়ে দক্ষতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছিলাম ঝড়। সে কথা ভাবতেই আজ বিস্মিত হই। বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন নেগি। শুধু বললেন, আমার কথা যদি লেখেন, অনুরোধ, শুধু এটুকু লিখতে ভুলবেন না—পাঁচ সহযাত্রীর অসমাপ্ত কাজ আমাকে করে যাবার জন্য ভারতের প্রতিটি মানুষ যেন আমাকে আশীর্বাদ করেন। তাঁদের শুভকামনা আমার একমাত্র পাথেয়।

বিজয় কুমার নেগি পুনরায় স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসলেন। এ হাসি তার দৃঢ় সংকল্পের। দৃঢ় প্রত্যয়েরও। পর্বতপুত্র নেগিকে যে বিশাল গুরুভার দিয়ে গেছেন তাঁর স্বগত সহযাত্রীরা!

রসিক পালের সহায়তায় গুরুপ্রসাদ মহান্তি

প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে প্রশিক্ষক নেগি

পারসিরা অবলুপ্তির পথে?

টাটা, মোদি ও ইরানীর সম্মানিত পরিবার সমৃদ্ধ পারসিরা আগামী দিনে তাঁদের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে চিন্তিত। জামশেদজী টাটা, রুসি মোদী ও স্টেটসম্যানের মালিক ইরানী যে সম্প্রদায়ের অগ্রবর্তী পুরুষ তাদের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্ন উঠছে কেন?

আগামী দিনে ভারতবর্ষে কি পারসিদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে? বাস্তবিক, এ দেশে পারসিদের সংখ্যা যে হারে কমতে শুরু করেছে, তাতে এ ধরনের সংশয় দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিজেদের এই পরিস্থিতিতে পারসি সম্প্রদায়ও যে খুব একটা সুখে আছেন, তাও নয়। বরং তারা এক ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করেছেন। সংখ্যালঘু পারসিদের জনৈক সদস্য হোমি জে·এস· তলয়াখানের মতে, ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে সারা দেশে পারসিদের সংখ্যা ছিল ১২৫,০০০ কিন্তু বিগত জনগণনায় সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৭১,৫০০তে!

আর্থিক দিক থেকে পারসিদের পরিস্থিতিও খুব একটা আশাপ্রদ নয়। যারা গুজরাট তথা মহারাষ্ট্রের কয়েকটি বিশেষ শহরে থাকেন, তাদের অবস্থা মোটামুটি ভাল হলেও গ্রামে বসবাসকারী পারসিদের পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। ১৯৫৪ সালে সুরাটের 'গোদওরা পারসি অঞ্জুমন ট্রাস্ট' গুজরাটের গ্রামে গ্রামে পারসিদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে একটি সমীক্ষা চালান। সেই সমীক্ষা থেকে জানা যায়, গ্রামে বসবাসকারী পারসিদের অবস্থা খুবই দুর্গতিপূর্ণ। আবার ১৯৬৭ সালেও একটি সমীক্ষা করা হয়; তাতেও একই চিত্র ফুটে ওঠে। ওই একই ছবি পাওয়া যায় কাম্মেরা মায়ে নামে এক সমাজসেবীর পর্যবেক্ষণে। তিনি দক্ষিণ গুজরাটের গ্রামীণ অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। এই পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেছিলেন 'সুরাট পারসি পঞ্চায়েত' ও 'ওয়ার্ল্ড জোরাস্ট্রিয়ন অর্গানাইজেশন'। এই সমীক্ষায় পারসি পরিবারগুলির করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। ফলে, ভারতের পারসি সম্প্রদায় নিজেদের এই পরিস্থিতিতে সচেতন হয়ে উঠেছেন।

বোম্বাই, সুরাট ও নৌসারিতে পারসিদের সংখ্যাধিক্য বেশি। বোম্বাই এর পরেই সুরাটের স্থান। দিল্লিতে রয়েছেন ৮০০ জন পারসি। 'দিল্লি পারসি অঞ্জুমন' এর অধ্যক্ষ লেফটেনেন্টে জেনারেল এ·এম সেঠনার কথায়, 'দিল্লিতে পারসিদের আগমন ঘটেছিল আজ থেকে ৪০০ বছর আগে। সেইসময় সম্রাট আকবর পারসি ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে এক পারসি পুরোহিতকে দিল্লিতে ডেকে এনেছিলেন।'

বর্তমানে কলকাতাতে প্রায় ১ হাজার পারসি পরিবার রয়েছে। কলকাতার পারসি যুবকেরা অবশ্য যথেষ্ট সক্রিয়। তাঁরা 'কলকাতা পারসি ইয়ুথ লীগ' তৈরি করেছেন। তাছাড়া পারসিদের বিশিষ্ট জীবন শৈলী দেখা যাবে জামশেদপুরে। ওখানেই তাদের মৌলিক জীবনধারার পরিচয় মিলবে। সারা ভারতে একমাত্র বিহারের জামশেদপুরই হলো পারসিদের হাতে তৈরি শহর। জামশেদজী টাটার নামে তৈরি এই শহরে পারসিদের আধিপত্য কল্পনাতীত।

পারসি উৎসবের আলপনা 'চৌক'

জামশেদপুরের সোনারিতে পারসি কবরস্থানের ওয়াচম্যান ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রথম প্রথম আশি বছরের বৃদ্ধ বেলীসায়ক প্যাটেলকে রীতিমত ভয় পেতেন। প্রতি সোমবার পারসি কলোনিতে ঘুরে বেড়ান ওই বৃদ্ধ পারসিটি। কবরস্থানে ঢুকেই ঈশ্বরীপ্রসাদকে দেখে দাঁত খিচিয়ে ওঠেন বেলীসায়ক 'ওরে নীচ! এইসব মৃত লোকগুলির সঙ্গে তুই মজা করছিস। এখনও কবরে তুই ফুল বদলাস নি! ওপরওলার কথা খেয়াল কর। দ্যাখ, জাহাঙ্গীর গান্ধীর কবরে নোংরা ফুল পড়ে রয়েছে। নিজের জীবনে কত কি করেছেন এই মানুষটি। এক সময় ইনি এখানকার রাজা ছিলেন। সোলী দেওত্রির কবরেরই বা কি হাল! এই মানুষটি একসময় এই কবরস্থানের সর্বেসর্বা ছিলেন। মানেক হোমী···, এই মজদুর নেতার কবরস্থান কেন ধোওয়া হয়নি?'

তবে ইদানিং প্যাটেল সাহেবকে ভয় পায়না ওয়াচম্যান ঈশ্বরীপ্রসাদ। তার ওপর রাগও আসে না। আজকাল প্রতি সোমবার ঈশ্বরীপ্রসাদ প্যাটেল সাহেবের জন্য অপেক্ষা করেন। প্যাটেল সাহেব এলেই তাঁকে বলেন, 'এখন তো আপনার চোখ বুজে রয়েছে। দেখুন, এই কবরস্থানের ৩৬০ জনের কবর রোজই আমি ধুই, তাজা ফুল দিই। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনি কবরে গেলে রোজই কবর ধুয়ে দেব, তাজা ফুল দেব।' ঈশ্বরীপ্রসাদের এই আশ্বাসে প্যাটেল সাহেব বেশ নরম হয়ে পড়েন। তারপর হাসতে হাসতেই বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে— দেখা যাবে। যদি এমনটি না হয় তবে আমি কবর থেকে বেরিয়ে এসে মজা দেখাব।' আশি বছরের বেলীসায়কের বাবা এস·বি· প্যাটেল ১৯৫১ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর দিনটি ছিল সোমবার। গত ৩৭

জামশেদপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজি টাটা

বছর ধরে বাবার কবরস্থানে এসে আত্মার শান্তি কামনা করছেন বেলীসায়ক। এবং কোনদিনও বাবার কবরে ফুল দিতে ভোলেন না। এই বেলীসায়ক চাকরি করতেন টিস্কোতে। চাকরি থেকে অবসর নেবার পর সাকচিতে নিজের ছেলেদের সঙ্গে থাকেন।

রোহিংটন নরিম্যান মাস্টারের বিধবা পত্নী রোজই ক্লিনিক যাবার পথে স্বামীর কবরে এসে ফুল দিয়ে যান। এই পারসি ভদ্রমহিলা পেশায় ডাক্তার। স্বামীর মৃত্যু তিন বছরও হয়নি। তাই কবরটি এখনও কাঁচা। প্রতিটি পারসির মৃত্যুর পর কফিনে মৃতদেহ বন্ধ করে কবর দেওয়া হয়। এবং ঢেকে দেওয়া হয় মাটিতে। তিনটি বছর ওই অবস্থায় থাকে। তারপর দেহ গলতে গলতে মাটিতে মিশে যায়। এরপর কবরকে পাকা করে তোলা হয়। তারওপর পাথরের এপিটাফ খোদাই করে লাগিয়ে দেন আত্মীয়স্বজনেরা। নরিম্যানের কবরটি তার দিয়ে ঘেরা। সামনের জমিতে ফুল ছড়ানো। এই জায়গাটি তার স্ত্রী রেখে দিয়েছেন, কেননা এখানেই তিনি কবরস্থ হবেন। জামশেদপুরের এই কবরস্থানটিতে এমন অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।

জামশেদপুরে প্রায় ছ থেকে সাতশো পারসি পরিবার রয়েছে। এদের মধ্যে যেমন উচ্চ আয়ের লোক রয়েছেন, তেমনই আছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। এদের মধ্যে অনেকেই টাটাতে চাকরি করেন। আবার অনেকেই ব্যবসাতে জড়িত। বিহারের এই ইস্পাত নগরী যেমন বিশ্বের প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে, তেমনই এখানকার সহজসরল সংস্কৃতি অনবদ্য জীবন মহিমার নিদর্শন। জনৈক বৃদ্ধ আর·বি· মলেগমওয়ালা পারসির কথায়, 'এদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এখনও একজন পারসি। সেইসঙ্গে জামশেদপুর হলো পারসিদের এক দেশ।'

আর·বি· মলেগমওয়ালার পুত্রবধূ শ্রীমতী ডি·এইচ· মলেগমওয়ালা অবশ্য শ্বশুরের কথায় প্রতিবাদ করেছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব যে পুরোপুরি পারসি একথা তিনি মানতে রাজী নন। শ্রীমতী মলেগমওয়ালার বক্তব্য, 'রাজীব গান্ধীর বাবা পারসি ছিলেন—এটা ঠিক। কিন্তু রাজীব পুরোপুরি পারসি নন। কারণ ওঁর 'নবজোৎ' হয়নি। তারাই প্রকৃত পারসি, যাদের ছোটবেলায় সাত থেকে দশ বছর বয়সে 'নবজোৎ' হয়েছে।' পুত্রবধূর কথায় শ্বশুর অবশ্য ধন্দেই পড়েছেন। কেননা তিনি সঠিক জানেন না পারসিদের প্রার্থনাস্থল 'ফায়ার টেম্পল'এ রাজীব প্রবেশ করার অধিকারী কিনা। বাস্তবিক, যারা পারসি নন তারা ফায়ার টেম্পলে প্রবেশ করতে পারেন না। এছাড়া পারসি-পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে 'নবজোৎ' অনিবার্য। 'নবজোৎ' সংস্কারের পরই তারা পারসি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন। যে সব পারসির সন্তানদের 'নবজোৎ' হয়নি, তারা পুরোপুরি পারসি নন। নানা ধরনের মানুষ রয়েছেন পারসিদের মধ্যে। এমনই এক বিচিত্র ব্যক্তি হলেন হোমী আবদুল রহমান। পাটনার এই মানুষটিকে নিয়ে জিজ্ঞাসার শেষ নেই। কে এই আবদুল রহমান? কি তাঁর পরিচয়? পাটনার হতুয়া মার্কেটের কাছে আবদুলকে দেখলেই লোক তফাতে সরে যায়। নিজের ছোট্ট ঘরে ততোধিক ছোট্ট একটি কারখানা তৈরি করেছেন তিনি। সেখানে নিত্যনতুন আবিষ্কার নিয়ে হইচই বাঁধিয়ে বসেন। প্রাকৃতিক শক্তিসম্পন্ন দেয়ালঘড়ি নাকি তিনি আবিষ্কার করে বসেছেন! নিজের আবিষ্কার চুরি যেতে পারে—এই আশঙ্কাতে আবিষ্কৃত মডেল নষ্ট করে দেন। এরপর প্রাকৃতিক শক্তিতে রেল চালানোর ব্যাপারে আবার দৌড়ঝাঁপ করতে থাকেন। এরকমই আজব দুনিয়াতে বসবাস করেন আবদুল রহমান। যখনই কেউ তাকে তাঁর এইসব কর্মকাণ্ডের কথা জিজ্ঞেস করেন, তখনই তিনি চুপ করে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি মুখ খুলতে নারাজ।

আবদুল রহমান কেমন ধরনের মানুষ—এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। অনেকে বলেন, গুজরাটের সুরাটের নিকটবর্তী নৌসারিতে বসবাসকারী একজন পারসি বি·জে· ইঞ্জিনিয়ার এর ছেলে হোমী বরজোরজি ইঞ্জিনিয়ার পাটনাতে আসেন। বাস্তবিক, পারসি বরজোরজি কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন—এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। হোমী দাবী করেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক কাকার ছেলে। ফিরোজ গান্ধীর পরিবার নাকি গুজরাটের নৌসারিতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। আবদুল রহমানের পাশের বাড়িতেই থাকতেন ফিরোজের পরিবার। কেউ কেউ তাকে পরিহাস করে বলে, 'হোমী আবদুল রহমান, আপনি যদি প্রধানমন্ত্রীর ভাইপো হ'ন, তাহলে পাটনাতে পড়ে পচছেন কেন?' তবে এসবের কোন জবাব দেন না আবদুল রহমান। এই বিচিত্র মানুষটিকে নিয়ে পাটনাতে একরকম হইচই আছে। সকলের কাছেই তিনি কৌতূহলের বস্তু।

খাবারের বেলাতে প্রতি পারসি পরিবারে 'ধনসাক' ডিশ অপরিহার্য। প্রতিটি উৎসবেই এরা 'ধনসাকে'র প্রিপারেশান করেন। ধনসাক চাল, মাংস আর মশলা দিয়ে তৈরি করা হয়। বিশেষ করে 'ব্রাউন চাওল' এই রান্নায় ব্যবহার করা হয়। মাছেরও নানা ধরনের রান্না করে থাকে পারসিরা। প্রতি বছরের জুলাই মাসে মাংস ও মাছের প্রিপারেশান হয়। এই মাসকে 'বহমান মাস' বলা হয়।

প্রতি বছরের মার্চ মাসে পারসিদের উৎসব 'জামশেদ নওরোজ' আনন্দের বন্যা এনে দেয়। তাদের নবী 'জোরাস্টের' এর জন্মদিন হিসেবেই এই উৎসব পালিত হয়। আগস্টের শেষাশেষি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিনগুলিকে ওরা নববর্ষ হিসেবে পালন করে থাকেন। এই উৎসব উপলক্ষে পারসি হোস্টেলের ডিনার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এবং ফায়ার টেম্পলে প্রার্থনার অনাড়ম্বর আয়োজন করেন তারা।

পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে পারসিরা নিজেদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে সমান সচেতন। অবসর সময়ে পুরুষেরা 'ডগলী' পরে থাকেন। এটি লম্বা কোটের ডিজাইনে তৈরি। সঙ্গে টুপি 'ফেল্টো' পরা চাই। মেয়েরা শাড়ি অথবা স্কার্ট পরেন। প্রতিটি উৎসবে মেয়েরা 'আলপনা' দিয়ে থাকে, যাকে 'চৌক'

বলা হয়। এই অনুপম শিল্প কলা শুভত্বের প্রতীক। পারসি পরিবারে 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ'ই বেশি। ইদানিং প্রেম করে বিয়েতেও তাদের এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের পারসিরা আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিয়ে করছে ফায়ার টেম্পলের পরোহিতদের কাছে। সেখানে পারসি সংস্কৃতি অনুসরণ করেই বিবাহ সম্পাদন হয়। তবে রেজিস্ট্রি কোর্ট ম্যারেজ করা অনিবার্য। পারসি মহিলারা সিঁদুর পরেন না। বিয়েতে আংটি পরা ওদের সোহাগেরই প্রতীক। বোম্বাই পারসি পঞ্চায়েত সম্প্রতি পারসি মহিলাদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছেন। এই সমীক্ষা পঁয়ত্রিশ বছরের নিচের মহিলাদের নিয়ে করা হয়। এদের অধিকাংশই চাকরিজীবী। এই সমীক্ষায় যেটা সবথেকে প্রকট হয়ে ওঠে, তা হল—এইসব পারসি মহিলারা চাকরি তথা অর্থ রোজগারের ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয়। বিয়ের পর এদের কেউ ঘরে বন্দিনী থাকতে চান না। সমীক্ষা থেকে আরো জানা গেছে, অধিকাংশ পারসি মহিলা দুটির বেশি সন্তানের পক্ষপাতী নন। একদিক থেকে এটি পরিবার কল্যাণের পক্ষে ফলদায়ক হলেও, অন্যদিকে পারসিদের বিনাশ এভাবেই ঘটছে বলে সমীক্ষার মূল বক্তব্য।

কয়েকমাস আগে, পূর্ব কলকাতার 'পারসি ইয়ুথ লীগ' কলকাতাতে পারসিদের একটি বৃহত্তর সম্মেলন করেছিলেন। এই সম্মেলনে নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে বৃটেন, কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াতে

রুসি মোদী

পাটনার আশ্চর্য পারসি: হোমি ইঞ্জিনীয়র

ছবি: দীপক কুমার

বসবাসরত পারসিদের নিজস্ব সংস্কৃতির অবলুপ্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে যেসব শিশু প্রথাগতভাবে পারসি হয়নি তাদেরও এই ধর্মে অর্ন্তর্ভুক্ত করা হবে। শিশুটি নবজাত হলে পারসি জীবন শৈলী মারফত তাকে তৈরি করে নেওয়া যাবে। এইভাবেই পারসি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে বলে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে যে হারে পারসিদের অবলুপ্তি ঘটছে, সেক্ষেত্রে এইভাবে না চললে পতন অবিনার্য।

টিস্কোর ৭০ বছরের চেয়ারম্যান রুশি মোদী। তামাম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মোদীর জীবন শৈলী শত প্রতিকূলতার মধ্যেও অবিচল রয়েছে। যখনই তিনি বাইরে থেকে দৌড়ঝাঁপ করে জামশেদপুরে এসে পৌছান তখন মা জেরাবাঈ মোদীর কবরখানাতে দুদণ্ড এসে দাঁড়ান। একটু জিরিয়ে কয়েকগুচ্ছ ফুল ছড়িয়ে প্রার্থনা করে নতুন কাজ শুরু করেন। এ বছর গণতন্ত্র দিবসে রুশি মোদী পদ্মভূষণ লাভ করেছেন। এই পদবী প্রাপ্তি পারসি সমাজের পক্ষে গৌরবজনক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে জাহাঙ্গীর গান্ধী এই সম্মান পেয়েছিলেন।

রুশি মোদী বাস্তবিক এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন আগে বি·বি·সি 'দ্য মানি মেকার্স' নামে একটি টি·ভি· সিরিয়ালে বিশ্বের ছজন শিল্পপতির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ওই সিরিয়ালে ডেভিড লোমেক্স উপলব্ধি করেন যে বিশ্বের এই ছজন শিল্পপতির মধ্যে রুশি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। ৪৬ বছর পর্যন্ত টিস্কোর জমিদারি সামলানোর পর ১৯৮৪ সালে জে·আর·ডি· টাটা টিস্কোর দায়িত্ব দেবার লোক খুঁজছিলেন। সেইসময়ই তিনি রুশি মোদীকে মনোনীত করেন।

আভিজাত্যের গৌরবে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী রুশি মোদীর জন্ম হয় ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ে। বাবা হোমী মোদী ছিলেন বোম্বাইয়ের এক ধনী ব্যবসায়ী। হোমী তার ছেলে রুশিকে বৃটেনের স্কুলে ভর্তি করে দেন। রুশির ওপর বৃটেনের প্রভাব আজও রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে অক্সফোর্ডে ভর্তি হন রুশি। অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করার সময় তিনি নাকি সাপ্তাহিক ট্যুটরিয়াল ক্লাস করা ছাড়া অন্য কোন ক্লাসই করতেন না। কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। বাবার পাঠানো টাকাতে মজা করতেন রুশি। বছরে এক দুদিন টাকার জন্য অভাবে পড়তে হত। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় জুটল তাসের সঙ্গী। আর ছিল পিয়ানো বাজানোর নেশা। একদিন তিনি যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরের পাশে আলবার্ট আইনস্টাইন ছিলেন। খুব ভোরে উঠতেন রুশি। আইনস্টাইনেরও সেই একই অভ্যেস। আইনস্টাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি পিয়ানো বাজাও?' জিজ্ঞাসা শুনে চুপ করে রইলেন রুশি। তখন আইনস্টাইনই বললেন, 'ঠিক আছে। আমরা একদিন যুগলবন্দী বাজাব। আমি ভয়োলিন বাজাব, তুমি বাজাবে পিয়ানো।' যতদিন সেখানে ছিলেন আইনস্টাইন, তারমধ্যে কুড়ি পঁচিশটি সন্ধ্যাতে রুশির সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে।

এরপর অক্সফোর্ড থেকে তিনি ভারতে চলে এলেন। তাঁরজন্য বাবা হোমী মোদী সামান্য একটা পদে চাকরির বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। এতদিন বিলাসব্যসনে কাটিয়েছেন রুশি। আচমকা এই সাধারণ চাকরি করতে এসে বড় মুশকিলে পড়ে গেলেন। তবে রুশি বুঝেছিলেন, ছোটপদে চাকরি করতে করতেই খ্যাতির শিখরে পৌছনো যায়। এরপর ধীরেধীরে সাফল্য লাভ করে পদোন্নতির শিখরে ওঠেন রুশি। এরপর তিনি টাটা কোম্পানির কর্মী বিভাগের সহায়ক নির্দেশক হন। আজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বাদে রুশি ওই সংস্থার সর্বোচ্চপদে বিরাজ করছেন।

চেহারা, ব্যক্তিত্ব, অভিজাত রুশি মোদীর কথাবার্তা সাধারণের কাছে বিরল এক অভিজ্ঞতা। তেমনই আকর্ষণীয় তাঁর বাংলোটি। ছিমছাম, সাজানো গোছানো বাংলোটিতে রয়েছে সুইমিং পুল। একবার বৃটিশ রয়েল পার্টি এই সুইমিং পুলটির প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। রুশির ঘরে অজস্র বই ঠাসা। ঘরের মধ্যে টাঙানো রয়েছে বহু ছবি। মাঝের ঘরে রয়েছে পিয়ানো। অবসর পেলেই পিয়ানো বাজাতে বসে যান। বাজিয়ে ফেলেন পোর্টর, রজার্স, রাগিনীগুলি। তখন যেন মনে হয় সেই ছেলেবেলার দিনগুলো ফিরে এসেছে।

ইস্পাত সাম্রাজ্যের জীবন্ত প্রবাদ রুশি মোদীর বৈবাহিক জীবন অবশ্য তেমন সুখের নয়। ১৯৫০ সালে নিকট আত্মীয়া শীলুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ১৯৬০ সালের মধ্যে দুজনের সম্পর্ক এমন তিক্ততায় পর্যবসিত হয়, যে বিচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। এ কারণে রুশি নিঃসন্তান। রান্না নিজেই করতে ভালবাসেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বরাবরই তিনি শৌখিন। যখন তিনি রান্নাঘরে ঢোকেন, তখন রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কয়েক ডজন আর্দালি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন। রুশি বানাতে পারেন বিশিষ্ট পারসি খাবার তাকুরী। এই রান্নার স্বাদ সত্যিই তোফা।

ভারতে যখন ক্রমেই পারসিদের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে, তখন জামশেদপুরের জীবন্ত প্রবাদ রুশি মোদী ক্রমহ্রাসমান পারসিদের কাছে এক পরম গৌরব। কিন্তু কথা হলো, এই সামান্য সংখ্যক পারসিদের মধ্যে এই দু একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কি তাদের ক্ষয় রোধ করতে পারবে? পারসিদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচারকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ যদি সেভাবে না নেওয়া হয়, তাহলে এই মানুষগুলি ক্রমে ভারত থেকে হয়তো হারিয়েই যাবেন।

—বিকাশ কুমার ঝা
ছবি: প্রভাকর

অগ্নিপুরুষের স্ত্রী

শহীদ ভগৎ সিং এর সহযোদ্ধা বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত'র পত্নী শ্রীমতী অঞ্জলি দত্ত স্বামীস্মৃতির সম্বলটুকু মনে নিয়ে জীবনকাব্যে উপেক্ষিতার ভূমিকা পালন করছেন।

অগ্নিপুরুষের স্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জলি দত্ত

বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিংহ দুই সাগ্নিক বিপ্লবী

স্মৃতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছেন শ্রীমতী অঞ্জলি দত্ত। জীবনের অন্তিম লগ্নে গোটা জীবনের ছোট-বড় ঘটনাগুলি তাকে কেমন যেন বিহ্বল করে তুলেছে। অঞ্জলিদেবীর মনে পড়ে, স্বামী বটুকেশ্বর দত্ত একবার তাঁকে বলেছিলেন জীবন হল দুঃখকে সহ্য করার সুখকর প্রক্রিয়া। স্বামীর সেই কথা আজও ভুলতে পারেননি তিনি। অঞ্জলিদেবী যখন পাটনার বাঙকীপুর গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন তখন তো কাজকর্মের ভেতরই দিন কেটে যেত। কিন্তু ১৯৮৭তে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সেই সব স্মৃতির জালে তিনি ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। চোখ বুজলেই দেখতে পান অমর শহীদ ভগৎ সিং–এর সঙ্গে তাঁর স্বামীর ছবি। অতঃপর চোখ ভরে ওঠে জলে।

অমর শহীদ ভগৎ সিং-এর অন্যতম সহযোগী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্যাগ সম্পর্কে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। প্রশাসনিক বিবাদ এবং জনকল্যাণ বিষয়ক বিরোধে ৮ এপ্রিল ১৯২৯–এ ভগৎ সিং–এর সঙ্গে অ্যাসেমব্লিতে গিয়ে বোমা ছোঁড়ার জন্য বটুকেশ্বর দত্তকে ভগৎ সিং–এর সঙ্গে ফাঁসী দেওয়া হয়নি এ জন্যই যে তখন

ন স্টা ল জি য়া

বটুকেশ্বরের বয়স মাত্র ১৯। অল্প বয়েসী হওয়ার দরুন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দীপান্তরে পাঠিয়ে দেন। একইসঙ্গে ফাঁসী হয় ভগৎ সিং–এর। জীবনের বেশ কিছু বছর বটুকেশ্বর দ্বীপান্তরে কাটান। অথচ স্বাধীনতার পর তাঁর ভাগ্যের যে টানাপোড়েন চলেছিল তা আজও অঞ্জলিদেবী ভুলতে পারেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেও বটুকেশ্বর দত্তকে স্বাধীনতার পর উপেক্ষা আর দারিদ্র সহ্য করতে হল। নিজের পরিবারের জন্য দুটো রুটি সংগ্রহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি বিপ্লবী বটুকেশ্বর। পরে তিনি ক্যানসারে পড়েন। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন কাটানোর পর ২০ জুলাই '৬৫তে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর, জীবনের বাকি পথ অঞ্জলি একা কিভাবে কাটাচ্ছেন তা শুধু তিনিই জানেন। এত কষ্টের মধ্যেও বটুকেশ্বর তাঁর দেশপ্রেমকে কিন্তু ভোলেন নি। যে জন্যই তাঁর একমাত্র মেয়ের নাম রেখেছিলেন ভারতী। বটুকেশ্বর দত্তের মৃত্যুর পর ভারতী ও অঞ্জলিদেবী লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। সে সব মনে পড়লে এখনও অঞ্জলিদেবীর কান্না এসে যায়।

পাটনায় জক্কনপুর এলাকায় প্রধান চৌরাস্তায় আছে বেশ কয়েকটি গলি। এমনি এক সরু গলির ভেতর একটি সাদা বাড়ি, বাড়ির দরজায় আজও নেমপ্লেটে লেখা—'বি·কে· দত্ত'। পরিচয় দেওয়ার পর এক বৃদ্ধা দরজা খুললেন। পরনে সাদা শাড়ি, গায়ের রং ফর্সা, সাদা শনের মত চুল, আলতো হাসিতে বাৎসল্যভাব, সত্যি মন ভরে যায়। যেন কোন বাঙালি গৃহিণীর মত। এই বৃদ্ধাই হলেন বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের স্ত্রী অঞ্জলি দত্ত। ঘরের আনাচে কানাচে বটুকেশ্বর দত্তের ছবি টাঙানো। কথায় কথায় অঞ্জলিদেবী ভীষণ উদাস হয়ে পড়লেন। বললেন, স্বাধীনতার পর জেল থেকে ছাড়া পেলে আসানসোলে আমাদের বিয়ে হয়। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৩৫ বছর হবে।

স্বামীর সম্পর্কে অঞ্জলিদেবী বলেন, তাঁর পরিবারের লোকেরা থাকতেন কানপুরে। ওখানেই বটুকেশ্বরের জন্ম। কানপুরের মালরোডে ইংরেজ সাহেব মেম নিয়ে ফূর্তি করতে আসতেন। সে জন্য কোন ভারতীয়র মালরোডে যাওয়া নিষেধ ছিল। সে সময় বটুকেশ্বরের বয়স ১২-১৩ হবে। একবার কৌতূহলবশত তিনি মালরোডে চলে যান। তখন এক ইংরেজ ভারতীয় বাচ্চা ঘুরতে ফিরতে দেখলে খুব মারধোর করে। সেদিন থেকে বটুকেশ্বর দত্তের মনে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা জন্মায়, যা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল।

অঞ্জলিদেবী এরপর বিয়ের পরবর্তী সেইসব দিনগুলির দিকে ফিরে যেতে যেতে বললেন, 'বিয়ের পর আমরা দু'জন পাটনায় চলে আসি। আমাদের সামনে তখন জীবন যাপনের সমস্যা। ও তখন চাকরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এক সর্দারজীর বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে ছোটখাট একটি কাজ পেলেন। কারখানাটা খুবই সাধারণ। সেখানে হাত মেশিনে বিস্কুট তৈরি হত। শ্রীদত্তের ওপর ভার ছিল ময়দা আর সুজির পারমিট যোগাড় করা। স্বাধীনতা সংগ্রামে বোমা ছোঁড়া হাত এই কাজে সায় দিচ্ছিল না ঠিকই, তবু আশা ছাড়েন নি। কিন্তু দিন কয়েক পরে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তাই আবার সেই অভাব অনটন।' স্মৃতিচারণ করতে করতে নিজেকে সামলে নিলেন অঞ্জলিদেবী। আবেগরুদ্ধ গলায় বলতে লাগলেন 'আমাদের এক মেয়েও জন্মেছে, একটি পয়সার জন্য হা-হন্যে অবস্থা। কোথাও কোন চাকরি পেলেন না তিনি। আমি স্কুলের চাকরির জন্য সে সময়ে পেতাম মাত্র একশ টাকা।'

স্বর্গীয় বটুকেশ্বর দত্তের স্মৃতিতে আজও কোথাও কোন কিছুই হয়নি। শ্রীমতী দত্ত বললেন—'স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনের সময়ও তাঁকে কোথাও আমন্ত্রণ করা হয়নি। যে কষ্ট তিনি অন্তিম সময় পর্যন্ত বয়ে বেড়িয়েছেন।' সে সময় বিপ্লবী তাঁর জীবনকালেই পেয়েছেন চরম উপেক্ষা। মৃত্যুর পরেও কি তাঁকে সম্মান দেওয়ার কথা সরকার ভাবতে পারেন না? উপেক্ষার ভেতর দিয়ে মৌন অঞ্জলিদেবী আজ জীবনের সন্ধ্যায় উপনীত, তাঁর এই মৌন ব্যথা আর কে বুঝবে?

বিকাশ কুমার ঝা

ছবি: দীপক কুমার

ছবি তপন সর্বাধিকারী

নিহত গৌতম ভট্টাচার্য্য

তারিখটি ছিল ৫ এপ্রিল। উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুরের আর্দালি বাজার বুধবারের সাতসকালে পাঁচশ উন্মত্ত জনতার গর্জনে কেঁপে ওঠে। মারমুখী জনতার গর্জনে এলাকার লোকজনেরা আতংকে শিহরিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, একদল সশস্ত্র জনতা কংগ্রেসকর্মী শিবপ্রসাদ যাদবের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে নিকটবর্তী থানার পুলিশকে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি মেসেজ দিলেন। পুলিশের জীপ ছুটে এলো ঘটনাস্থলের দিকে। ততক্ষণে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। শিবপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে নারকীয় উল্লাস করতে করতে ঢুকে পড়েছে সশস্ত্র জনতা। তাদের হাতে ঝলসে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র। সশস্ত্র পুলিশকে বোকা ও অথর্ব বানিয়ে উন্মত্ত জনতা তচনচ করে ফেলেছে শিবপ্রসাদের ঘর। শিবপ্রসাদকে যখন টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হলো নিকটবর্তী নিমগাছের দিকে, তখন প্রত্যক্ষদর্শীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, সশস্ত্র পুলিশ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়! নৃশংস উগ্রপন্থীদের কায়দায় খুন করে হত্যাকারীরা ছুটে গেল পলাতক দেবীপ্রসাদের দিকে। এরপর পুলিশকে পুরো সাক্ষীগোপাল বানিয়ে নৃশংস উল্লাস করতে করতে জনতা পালিয়ে গেল।

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা কোন ক্রাইম থ্রিলারের কাহিনী নয়। কাহিনীর পটভূমি

দুই ২৪ পরগণা জুড়ে এত রাজনৈতিক হত্যা কেন?

কলকাতাকে চক্রাকারে ঘিরে থাকা উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে কংগ্রেস, বিক্ষুব্ধ সিপিএম, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর·এস·পি কর্মীদের উপর নেমে আসা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলির নেপথ্যে রাজনীতি ও প্রশাসনের কোন যোগসাজশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?

নিহত শিবপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদের মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন প্রিয় দাশমুন্সী

বামফ্রন্টের সুশাসিত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুর অঞ্চল। ঘটনাটি তখনই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কালার পায়, যখন জানা যায় এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন সি·পি·আই·এম–এর দুজন কর্মী। এবং যাদের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে নিকটবর্তী নার্সিংহোম থেকে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে পুরোপুরি রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে, তা বুঝে উঠতে অবশ্য সাধারণ মানুষের খুব একটা অসুবিধে হলো না। কারণ প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এই হামলা ছিল যুব কংগ্রেসের একটি সভার পাল্টা প্রতিক্রিয়া।

বামফ্রন্ট সরকারের বিগত বারো বছরের শাসনে এ রাজ্যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ক্রমশ বাড়ছে। ব্যারাকপুরের এই পলিটিকাল মার্ডার নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা দিতে পেরেছে বলে রাজনৈতিক মহলগুলি মনে করছেন। জনপ্রিয়–ফলে ভোটে তাঁর হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই কারণে মধুসূদন মাখাল ও তার বাহিনীকে শিখণ্ডী করে এই হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত হয়!

রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত উত্তাল যে এ রাজ্যের বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি পি আই এম–এর বিরোধিতা করার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে বিক্ষুব্ধ সি·পি·আই·এম কর্মী গৌতম ভট্টাচার্যকে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড নিয়ে যখন সমস্ত মহলগুলি সচকিত হয়ে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলেন, তখনই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানালেন যে গৌতম খুন হয়েছেন পারিবারিক বিরোধের পরিণতিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাজ্যের হাজার সমস্যা যখন মুখ্যমন্ত্রীর দরজার একশ হাত দূর থেকে ফিরে যায়, তখন গৌতম ভট্টাচার্যের মত সাধারণ বিক্ষুব্ধ সি·পি·আই·এম কর্মীর পারিবারিক বিবাদের খবর তিনি পেয়ে যান! তিনি এক বিবৃতিতে স্পষ্টই জানালেন যে এই গৌতম খুন হয়েছে তার দেহরক্ষীর গুলিতে। কিন্তু হাওড়ার পুলিশ সুপার শংকর মুখার্জির বক্তব্য শুনে স্থানীয় সি পি আই এম অফিস বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায়। শংকরবাবু বলেন, সেদিনের হাঙ্গামা ও গুলি চালনাতে যে ক'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই সি পি আই এম কর্মী। পুলিশ জানিয়েছে, বিকেল বেলাতে গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোডে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য অম্বিকাবাবু নিজের গাড়ি খারাপ হওয়ায় গৌতম বসুর স্কুটারে যাচ্ছিলেন। আরেকটি স্কুটারে যাচ্ছিলেন আরেকজন কংগ্রেস কর্মী। তার সঙ্গে বসেছিলেন অম্বিকাবাবুর দেহরক্ষী সুভাষ দাস। বিকেল চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট নাগাদ গোপাল মুখার্জি লেন ও চিন্তামণি দে রোডের ক্রশিং–এর কাছে আততায়ীরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। পুলিশের কথানুযায়ী, আততায়ীরা গুলি চালিয়েছিল কি না এ ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে অম্বিকাবাবুর দেহরক্ষী গুলি চালিয়েছেন পাঁচ রাউণ্ড। বিধায়ক

হত্যার বিরুদ্ধে **দেওয়াল** লিখন

ছবি: তপন সর্বাধিকারী

কেননা প্রশাসনের প্রধান অস্ত্র পুলিশের সামনেই বামপন্থীরা সুসংবদ্ধ ভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালায়। এবং হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। এ থেকেই স্পষ্ট হয় প্রশাসন নিজেকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, যেখানে তাদের সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে হাজারো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

রাজনৈতিক খুনের জ্বলন্ত নমুনা দেখা গিয়েছিল দমদম এলাকাতে। পনের বছর ধরে জিতে আসা বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের সিটে সি·পি·আই·এমকে হারিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টিকারী শ্রীশ মুখার্জি খুন হলেন রাতের অন্ধকারে বাগজোলা খালের ধারে। কংগ্রেস পক্ষের বক্তব্য, দমদম থানার ও·সি· কবীর খানের সামনেই বোমা ও গুলি করে খুন করা হয়েছিল শ্রীশকে। এ ব্যাপারে বামপন্থী মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছিল। এই মন্ত্রীর আসনে নাকি নমিনেশান পাওয়ার কথা ছিল শ্রীশের। অভিযোগ, মন্ত্রী জানতেন, শ্রীশ দমদমে বেশ হত্যাকাণ্ডের পিছনে সি পি আই এম–এর কোন হাত নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বিক্ষুব্ধদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিকে কোন ভাবেই সমর্থন করে না। স্থানীয় সি পি আই এম নেতা গোপাল ভট্টাচার্য ও তাঁর দলের কয়েকজন এ ব্যাপারে আগাম জামিন নিয়ে বসলেন। অথচ এই ঘটনার সঙ্গে সি পি আই এম যদি কোনভাবেই যুক্ত না থাকত, তাহলে আগাম জামিন নেবার প্রশ্ন কি করে আসে! পানিহাটির বিক্ষুব্ধ সি পি আই এম কর্মী গৌতম ভট্টাচার্যের খুনের ব্যাপারে নাগরিক কমিটির সম্পাদক অনিমেষ মজুমদার সি পি আই এম–কেই দায়ী করেছেন।

রাজনৈতিক খুনের অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার পুর নির্বাচনে। ভোটের দিন খুন হল কংগ্রেস কর্মী গৌতম বসু। কংগ্রেস বিধায়ক অম্বিকা ব্যানার্জি বললেন, সি পি আই এম গুণ্ডারাই তাকে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু অম্বিকাবাবুর বক্তব্যকে মানতে চান নি স্থানীয় সি পি আই এম কর্মীরা। তাদের বক্তব্য, অম্বিকাবাবু দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন, সি·পি·আই·এম গুণ্ডারা গুলি করেছে। যদিও অম্বিকাবাবু এই খুনের পিছনে সি·পি·আই·এম·–এর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন, কিন্তু বামফ্রন্টের রাজ্য চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জি পরিষ্কার জানান– অম্বিকাবাবুর দেহরক্ষীর গুলিতেই গৌতম বসুর মৃত্যু হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে এই রাজনৈতিক খুনগুলি রাজ্যের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের পলিটিকাল স্ট্যাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছে। কংগ্রেস আমলে যারা ঘন ঘন রাজনৈতিক সন্ত্রাস, খুন জখমের অভিযোগ তুলতেন, আজকে তাঁদের বারো বছরের শাসনে সাধারণ মানুষ রীতিমত আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন। ১৯৮৩ সালে সর্বাত্মক খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল সি·পি·আই·এম–এর বিরুদ্ধে বীরভূমের পাটনীল গ্রামে। দলবেঁধে নারকীয় সন্ত্রাস চালিয়েছিল তারা। ঘরের গরুও আক্রমণের

হাত থেকে রেহাই পায় নি। এবং বর্ধমানে সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড ফ্রন্ট শাসনের সব থেকে কলংকজনক অধ্যায় বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

রাজনৈতিক খুনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ এখন রেকর্ড সৃষ্টি করতে চলেছে বলে রিপোর্ট মোতাবেক জানা গেছে। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল—যখন ডঃ বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন গড়ে দিনে দুজনও খুন হয় নি। প্রফুল্ল সেনের আমলেও দুজন খুনের রেকর্ড ছিল না। এমন কি নকশাল আন্দোলনে যখন ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ এ তামাম পশ্চিমবঙ্গে হিংস্র রাজনীতির আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখনও এই খুন গড়ে দৈনিক দুয়ের বেশি যায় নি। এই খুনের অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালে যখন সিদ্ধার্থ শংকর রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় নকশালি আন্দোলন ছিল ভয়াবহ। ওই বছরগুলির গড়পড়তা খুনের খুনের খতিয়ান দুই পেরিয়ে তিনে পৌঁছয় নি। কিন্তু বিগত বামফ্রন্টের বারো বছরের শাসনে এই দৈনিক গড় চার ছাড়িয়ে পাঁচে এসে পৌঁছেছে।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে খুনের সংখ্যা ছিল ৬৯৩টি। ১৯৬৮ সালে ৬৮৮টি। ১৯৬৯ সালে ৭৭৬টি। ১৯৭০ সালে ১২০৮, ১৯৭১ সালে ১৯২১টি। ১৯৭২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৮৪০টি। ১৯৭৩ সালে খুনের সংখ্যা ছিল ৯৫৯টি, ১৯৭৪ সালে ৮৯২টি। ১৯৭৫ সালে ৭৮৬টি। ১৯৭৬—এ ৮২৬টি, ১৯৭৭ সালে ৮৯৭টি। সাতাত্তর সালে কংগ্রেস এই রাজ্য থেকে হটে যাওয়ার পর নিরংকুশ প্রাধান্য নিয়ে ক্ষমতাতে আসে বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টের শাসনে পুলিশ রিপোর্ট মোতাবেক খুনের খতিয়ান পেশ করা যাক। ১৯৭৭ সালে ৮৯৭টি, ১৯৭৮ সালে ৯০৯টি। ১৯৭৯ সালে ১০৪৬টি। ১৯৮০ সালে ১৪৬৭টি। ১৯৮১তে ১৪৯৩। ১৯৮২ তে ১৩৯৯। ১৯৮৩, ১৯৮৪ সালে যথাক্রমে ১৩২৭ ও ১৪৩৮। ১৯৮৫ সালে মোট খুনের সংখ্যা ১৩৯৬। ১৯৮৬ সালে তেরোশর বেশি। ১৯৮৭ সালে এই সংখ্যা চোদ্দশ অতিক্রম করে যায়। ১৯৮৮ সালে এই খুনের সংখ্যা পনেরশরও বেশি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বলাবাহুল্য, এগুলি পুলিশ রিপোর্ট। এই রাজ্যে রাজনৈতিক চাপের কাছে বহু খুনের কেস উইথড্র হয়ে যাচ্ছে। যে সংখ্যাগুলি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে ৬০ ভাগই রাজনৈতিক খুন বলে পুলিশের বক্তব্য। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়,সমাজ বিরোধীদের সংঘর্ষের পিছনে রাজনৈতিক মদত রয়েছে। আবার বহুক্ষেত্রে অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে পুলিশদের গড়িমসি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে পুলিশ সাফাই গাইতে উঁচু মহলের দোহাই পেড়ে থাকেন। এমন কি বহু ক্ষেত্রেই এ রাজ্যে রাজনৈতিক খুনের আসামীকে প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। প্রশাসনের জনৈক কর্তাব্যক্তির মতে, ছোট ছোট দাঙ্গা, সংঘর্ষ বড় সড় সংঘর্ষে রূপান্তরিত হবার

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

নিহত কমিশনার শ্রীশ মুখার্জি

যারা ক্ষমতাসীন, তাদের মাথার ওপর থাকে রাজনৈতিক আশীর্বাদ এবং পুলিশের সহায়তা।

সময় রাজনৈতিক দলগুলি ইনভলভ হবার চেষ্টা করে। কারণ এখানে এলাকা দখল করা রাজনৈতিক দলগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাঁর মতে, এইসব অ্যান্টিসোসালদের সঙ্গে সংঘর্ষই পরে রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ পায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা মন্দির বাজারেও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। বেহালাতে জনৈক কংগ্রেস কর্মীকে প্রকাশ্যে দশ জনের সামনে গুলি করে মারা হয়। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু গ্রামে একের পর এক রাজনৈতিক খুন ঘটে চলেছে। কংগ্রেসীদের বক্তব্য যে পুলিশ নির্বিকার! তবে অনেকক্ষেত্রে সি পি এম—কংগ্রেসের সংঘর্ষের জের হিসেবে সি পি আই এম কর্মীও খুন হচ্ছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মগরাহাটে সি পি আই এম—এর ছাত্রফ্রন্টকর্মী শম্ভু সর্দার খুন হন। তবে এই খুন সি পি আই এম—কংগ্রেস বিবাদের জের কিনা, তা বলতে চান নি সি পি আই এম—এর নেতারা। কংগ্রেসের হাতে সি পি আই এম—এর খুন হওয়ার ঘটনা বামফ্রন্টের আমলে তুলনায় নগণ্য। কেননা সি পি আই এম সব দিক থেকেই সংগঠিত। তাছাড়া সর্বক্ষেত্রেই প্রশাসনকে হাতে পেয়ে থাকেন তারা।

গত বছর ৪ ডিসেম্বর সাংসদ মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস সমর্থকদের নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার অবনী মোহন জোয়ারদারের অফিসে যান। মমতা অভিযোগ করেন, বেহালার কংগ্রেস কর্মীর হত্যাকারীকে পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ধরছে না। বরং এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বেহালা থানাকে নির্দেশ দেন তিন জন সি পি আই এম নেতাকে প্রোটেকশান দিতে। এদের মধ্যে একজন আবার খুনের আসামী। তার বিরুদ্ধে আরেকটি খুনেরও অভিযোগ ছিল। তাদের রীতিমত শেলটার দেয় বেহালা পুলিশ। মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করেন, প্রশাসন এমনই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে যে কংগ্রেসীরা এখন প্রাণ হাতে করে নিয়ে ঘুরছেন। পুলিশের সামনেই সি পি আই এম কর্মীরা খুন জখম সন্ত্রাস নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে মমতার অভিযোগ, এই সংঘর্ষ, খুনগুলিকে তিনি প্রশ্রয়ই দিয়ে যাচ্ছেন।

শহরে যেখানে এই রাজনৈতিক খুনের প্রাবল্য মোটামুটি কম দেখা যায়, সেখানে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বহু জায়গাতে ক্ষমতাসীন সি পি আই এম কর্মীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জোর করে পার্টি ফান্ডে চাঁদা আদায়ও করে। যদি সি পি আই এম—এর কথা না শোনা হয়, তাহলে তাদের এক ঘরে করা হবে। ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে পার্টির নির্দেশে। এছাড়া বহু জায়গাতে পার্টির বিধান অনুযায়ী বিচার চলে। গণ আদালতের বিচারে সাজা পাচ্ছে গ্রামবাসীরা। পুলিশের কাছে বিচার চাইতে গেলে তাদের স্পষ্ট জবাব : আমাদের কিছুই করার নেই!

পুলিশের বক্তব্য বড় বড় নেতাদের টেলিফোন এলে ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া পুলিশের অন্য কোন উপায় থাকে না। তবে বহুক্ষেত্রেই পুলিশকে আক্রমণের হাতিয়ার করেও ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় জমিজমার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের সংঘর্ষে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে রাজনৈতিক দলগুলি। যারা ক্ষমতাসীন, তাদের মাথার ওপর থাকে রাজনৈতিক আশীর্বাদ এবং পুলিশের সহায়তা। সম্প্রতি পানিহাটির পুর নির্বাচনে পুলিশকে হাতিয়ার করার রিপোর্টও পাওয়া গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রায়ই এই রাজ্যের আইন শৃংখলার ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। কিন্তু ১৯৮৮—৮৯ সালে খুনের খতিয়ান দেখলে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর কথা মেনে নেওয়া যায় না। আর অনেক কেসই থানাতে রিপোর্ট হয় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনেক খবরই পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হাতিয়ার করে এই রকম রাজনৈতিক খুন জখম সন্ত্রাস চালিয়ে গেলে কি হয় কংগ্রেসের পরিণতি তা স্পষ্ট করেছিল। ৭৭ সালে কংগ্রেসের একাধিপত্য গুড়িয়ে গিয়েছিল। সেই সম্ভাবনার কথাও কি এই রাজ্যের সি পি আই এম নেতারা ভেবে দেখেছেন?

—মণিশংকর দেবনাথ।

অন্য সব ডাই একত্র হলেও,
গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া
হেয়ার ডাই ব্যবহারকারীর
সংখ্যাই বেশী!
৩টি বিশেষ কারণে ঃ
১ গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া হেয়ার ডাই চুলে আনে স্বাভাবিক রঙরূপ। এর ভেতরে এক কণ্ডিশানারও আছে, যা চুল নরম আর আয়ত্বের মধ্যে রাখে। আসলে, আপনি না বললে কেউ জানতেও পারবে না।
২ অন্য হেয়ার ডাইয়ের সঙ্গে তফাৎ হল, গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া হেয়ার ডাই ব্যবহার করা সহজ আর সুবিধেজনক। হ্যাঁ, চুল শ্যাম্পু করার মতই সহজ।
৩ গোদরেজের আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া হেয়ার ডাইয়ের কোয়ালিটি সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, কারণ আপনার চুল আর চামড়া রক্ষার জন্যে এটি বিশিষ্ট ফর্মূলায় তৈরী হয়েছে। সম্পূর্ণ সুরক্ষা—তাই দিয়ে হয় গোদরেজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা!
গোদরেজ® আপনা-থেকে-ছড়িয়ে-পড়া পার্মানেণ্ট হেয়ার ডাই
Godrej
SELF-SPREADING PERMANENT HAIR DYE
Natural Black
Just shampoo it in
Godrej
SELF-SPREADING PERMANENT HAIR DYE
DARK BROWN
Just shampoo it in
পাওয়া যায় ২টি স্বাভাবিক রঙে : কালো ও গাঢ় খয়েরী।
CLARION/B/GS/50/244 BEN
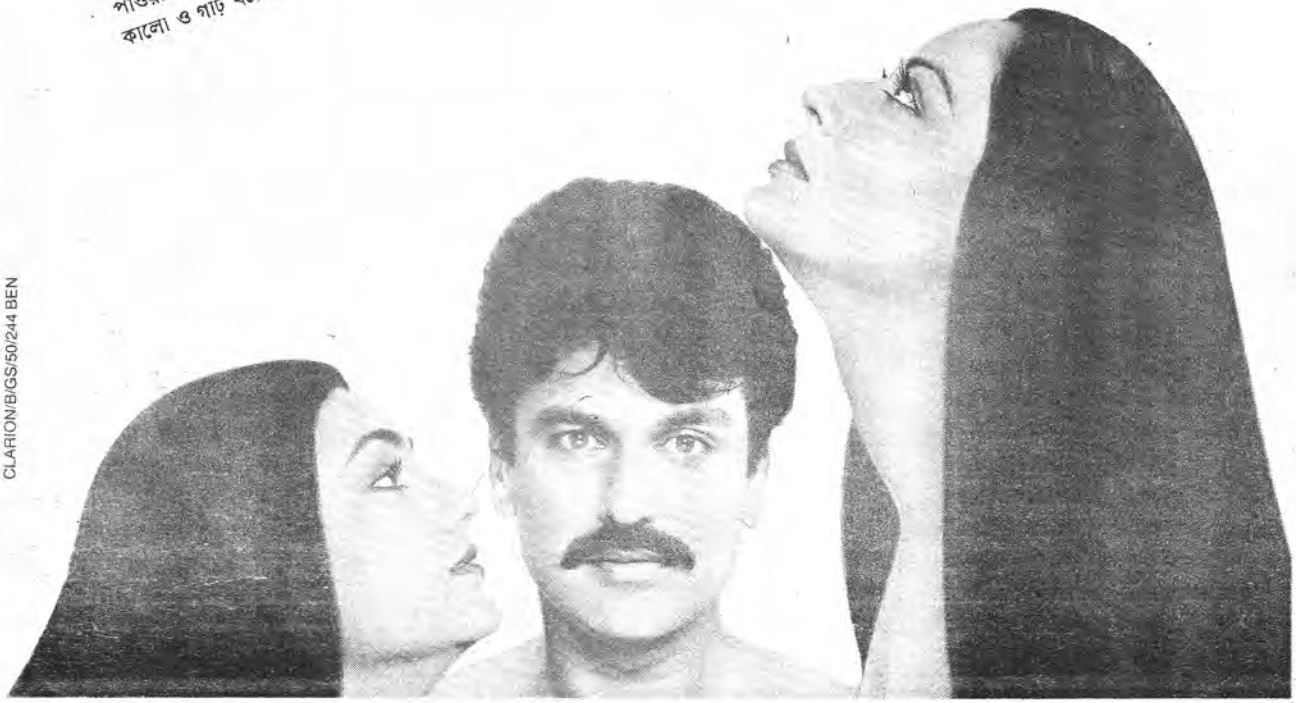
এটি এমন ব্যক্তির গল্প, যার চেহারায় নেই আভিজাত্য, তিনি কোনো উঁচুপদে চাকরিও করেন না, রাজনৈতিক নেতাও নন। অথচ বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি সর্বত্র ভি আই পি মহলে এই সাধারণ মানুষটির দারুণ সমাদর। মহারাষ্ট্রের সরকারী আমলারা পর্যন্ত এঁর টেলিফোন পেলে সাগ্রহে জিগ্যেস করেন, আরে রাম কেমন আছ? আসবে নাকি, গাড়ি পাঠাব? রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া–দাওয়া কিন্তু।

জন্মপ্রেমিক একটি মানুষ

মধুবালার সঙ্গে রাম ঔরঙ্গাবাদ

সাধারণ এক ফটোগ্রাফার রাম। অথচ তার জীবনে এসেছে একের পর এক সেদিনের নামকরা ফিল্ম-অভিনেত্রীরা। বহু ভি আই পি'র সঙ্গে তার দহরম মহরম। অতিসাধারণ একটি চরিত্রের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কাহিনী।

সুরইয়ার সঙ্গে

হ্যাঁ, রাম, অর্থাৎ লোকটির নাম রাম ঔরঙ্গাবাদকর। আজ থেকে ৭৩–৭৪ বছর আগে ঔরঙ্গাবাদ ছাউনি, রিয়াসৎ–এ–নিজাম, হায়দ্রাবাদে একটি অনুন্নত শ্রেণীর পরিবারে তার জন্ম। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার, তাই লেখাপড়া বিশেষ এগোয়নি। হায়দ্রাবাদের সিটি কলেজে ইন্টার অবধি তার পড়াশোনা। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে রাম এক প্রতিবেশী বালিকার প্রেমে পড়ে। মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, বিয়ের পর যক্ষ্মা রোগে মেয়েটি মারা যায়। মেয়েটি রামের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিল। এরপর রামের যখন ষোলো, সে ফের প্রেমে পড়ে এক অষ্টাদশীর। মেয়েটি ছিল মুসলমান। তাকে বিয়ে করবার জন্য রামও ধর্ম পাল্টে রহিম হয়ে গেল এবং নিকাহও হল। মেয়েটির নাম ছিল রফত খাতুন, ওর বাবা রামকে ভয় দেখাল, শীগ্‌গির আমার মেয়েকে তালাক দাও···। এরপর কিশোর রাম তাড়াতাড়ি রফতকে তালাক দিয়ে মুক্তি পেল। কিন্তু ততদিনে রফত বিবি গর্ভবতী। রামও অতঃপর পালিয়ে এল বোম্বাই–এ।

বোম্বাই–এ মেসোর কাছে উঠল রাম। মেসোর এক বন্ধু তখন ফিল্ম অভিনেত্রী সুলোচনা (রুবি মেয়ার্স)–এর বাড়িতে কাজ করতেন। কিন্তু ওঁর বাড়িতে কোন কাজের লোক বেশিদিন টিকত না। 'আনারকলি' সুপারহিট হওয়ায় সুলোচনা অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিলেন খুব। মেসো–র বন্ধু রামকে সুলোচনার বাড়িতে কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এদিকে রাম কিন্তু সুলোচনার বাড়িতে টিকে গেল। খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজে রাম অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ দক্ষ হয়ে উঠল। সুলোচনার মা তো পুরোপুরি রামনির্ভর হয়ে উঠলেন। নারগিসের মা জদ্দনবাঈ এর সঙ্গে এখানেই রামের আলাপ পরিচয় হয়। জদ্দনবাঈ রামকে সুলোচনার বাড়ি থেকে নিয়ে এসে নিজের ফিল্ম–ইউনিটের কাজে লাগিয়ে দিলেন। জদ্দনবাঈ সেসময় 'ইন্সান আউর শয়তান' ছবি তৈরি করছিলেন। কিন্তু কি কারণে যেন রামকে অল্প ক'দিনের মধ্যেই তিনি বের করে দিলেন

এরপর রাম কিছুদিন একটি অফিসে পিওনের কাজ করল। তারপর জুইশ ক্লাবে বিল কালেকটরের চাকরি করল কিছুদিন। সেসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমীর আলি নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি রামকে এসময়েই একটা ক্যামেরা উপহার দিয়েছিলেন। রাম সেই ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলতে তুলতে এক অনির্বচনীয় নেশায় ডুবে গেলেন। কোনো ট্রেনিং ছাড়াই রাম হয়ে উঠলেন দক্ষ ফটোগ্রাফার। সেসময় মোরারজী দেশাই–এর ছবি তুলে রাম তিনশো টাকা পুরস্কারও পেলেন। পরে জওহরলালের ছবি তুলতে গিয়ে তাঁর সঙ্গেও আলাপ করেন। রামের স্বভাবটা ছিল খোলামেলা, উদার প্রকৃতির। জমাটি আড্ডা দিতে পারতেন। বুদ্ধিও প্রখর ছিল তাঁর। ইংরেজী বলতে শিখে গিয়েছিলেন চমৎকার। এছাড়াও উর্দু, হিন্দী,

গুজরাটী ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মারাঠী তো ছিল তার মাতৃভাষা। চারটে ভাষাতেই তার লেখাপত্র এবং চার ভাষার কাগজেই তার ফটোগ্রাফ ছাপা হতে থাকে।

ফটোগ্রাফার হিসেবে রামের চাহিদা বেশ বেড়ে গেল। সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার, তার সরলতা, এসব মিলিয়ে রামের সঙ্গে যারই আলাপ হত, সে-ই পছন্দ করে ফেলত রামকে। রাম বহু ন্যুড ছবি তুলেছেন জীবনে। অন্যান্য ফটোগ্রাফাররা রামকে জিগ্যেস করত, মেয়েরা তোমার কাছে নিঃসংকোচে কাপড় চোপড় খুলে ফেলে কিভাবে ভাই? বশীকরণ মন্ত্র জানো নাকি! ন্যুড ফটোগ্রাফিতে রামের নাম ফটোগ্রাফির জগতে তখন সুপরিচিত। হায়দ্রাবাদের নিগার সুলতানা, সে সময়কার বিখ্যাত নায়িকা, তার বিকিনি পরা ছবি 'সিনে ভয়েস' কাগজে ছাপিয়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। রণজিৎ স্টুডিও-র মালিক চন্দুলাল শাহ সে ছবি দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে নিগার সুলতানাকে পরবর্তী তিনটি ছবি থেকে বাদ দিয়ে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেন। নিগারকে অন্য স্টুডিওতে নায়িকার চাকরি খুঁজতে হয়েছিল এরপর। তিনি কিন্তু রামকে একটুও দোষ দেননি। তখনকার দিনে তো হিরো হিরোইনরা কোন একটি স্টুডিওতে বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে থাকতেন। তবুও নিগারের ঐ ছবি কাগজে ছাপা হবার পর জনপ্রিয়তার লোভে তখনকার নামকরা সব অভিনেত্রীরা যেমন মনোরমা, গীতা-বালী, নলিনী জয়বন্ত, নারগিস প্রত্যেকে শরীর দেখানো ফটো প্রচারে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন।

ঔরঙ্গাবাদের দুপাশে কুলদীপ কৌর আর নিম্মি

এসময় রাম প্রেমে পড়েন ফিল্ম অভিনেত্রী নিম্মির। নিম্মির তখন বেশ কদর। তাঁর একটি ফিল্ম ইংরেজীতে ডাব করে আমেরিকাতেও দেখানো হয়েছে তখন। নিম্মির সঙ্গে রামের মেলামেশা নিয়ে তখন ফিল্ম জগতে প্রচুর গুঞ্জন। ওদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রকাশ্যেই আলোচনা হত। রামের অশিক্ষিত স্ত্রী তখন দুই কন্যার জননী। রাম

কুলদীপ কৌর-এর সঙ্গে রাম

সেসময় নিম্মিকে নিয়ে একটা বইও লিখে ফেলেছিলেন।

'ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা' ছবির প্রিমিয়ার শো-তে নিম্মি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন রামকে। রাম তার আগেই খবর পেয়েছেন, তার স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং ভর্তি হওয়ার কিছু পরে তার একটি ছেলে হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আবার খবর এসেছিল, ছেলেটি জন্মের কিছু পরই মারা গেছে। কিন্তু রাম এসব খবর শুনেও চুপচাপ ছিলেন, নিম্মির সঙ্গ তিনি ছাড়তে চাননি। কিন্তু নিম্মি সব জানতে পেরে অবাক হয়ে যান, এমন নিষ্ঠুর লোকও আছে পৃথিবীতে! তারপর নিম্মি রামের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখেননি।

তারপরেও রাম আরো অনেক মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন। সবার কথা তার ঠিকমত মনেও পড়েনা। গ্র্যান্ড মেডিকেল কলেজের এক অনুষ্ঠানে রামের আলাপ হয়েছিল স্নেহপ্রভা প্রধান নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে। স্নেহপ্রভা পরে নামকরা নায়িকা হয়েছিলেন। উর্দুভাষার বিখ্যাত লেখিকা ইসমাৎ চুগতাঈ-এর সঙ্গেও রামের খুব ঘনিষ্ঠত ইসমাতের স্বামী শহিদ একবার রামকে ত করে বাড়ি থেকে বেরও করে দিয়েছিলেন ইসমাতেরই চেষ্টায় মিটমাট হয়ে যায়। সু মধুবালা, শোভনা সমর্থ, কুলদীপ, মীনা এঁদের সবার সঙ্গেই রাম কোন না কোন ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়েছেন।

রাম এখন বৃদ্ধ। সপরিবারে এক-কামরার ফ্ল্যাটে বাস করেন। কারো কোন অভিযোগ নেই। চিরকাল জীবনযাপন করে এসেছেন, আজো কোনদিনই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেননি। অসদুপায় অবলম্বন তো দূরের নিজের পরিচিতির সূত্রগুলিকেও তিনি লাগাননি কখনো। টাকা পয়সাও জ জন্মপ্রেমিক মানুষদের বোধহয় এটাই নিয়া

-মহেন্দ্র সর

হোটেল রেস্তোরাঁ
তাজ প্রেম

চিড়িয়াখানার সামনে সুদৃশ্য পাঁচতারা তাজ হোটেলের ভাগ্য দেখে অন্যান্য হোটেল ব্যবসায়ীরা কি ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন? কারণ, এই হোটেল নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে হোটেল কর্তৃপক্ষ যে হারে বামফ্রন্ট সরকারের করুণা পাচ্ছেন, তাতে ঈর্ষান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজ্য সরকারের আবগারি বিভাগ গত বছরের মাঝামাঝি ঘোষণা করেছিল, নতুন আবগারি নীতি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন, তাই যতদিন না আবগারি নীতি ঘোষণা করা হচ্ছে, ততদিন নতুন করে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষকে বারের লাইসেন্স দেওয়া হবে না। অথচ, নতুন আবগারিনীতি ঠিক না হওয়া সত্ত্বেও আজ হোটেল চালু হবার ঢের আগে, গত বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ তাজ হোটেলকে ৭টি বারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এই হোটেলটি গত নভেম্বরে চালু হবার কথা ছিল, এখন শোনা যাচ্ছে আগামী মে-তে চালু হবে। তাজ হোটেল যখন আবগারি

বিভাগের ঢালাও অনুগ্রহ পাচ্ছে, তখন প্রখ্যাত মদ প্রস্তুত সংস্থা ম্যাকডোয়েল এবং জগজিত ইন্ডাস্ট্রিজ কিন্তু বারের জন্য কয়েকটি বড় লাইসেন্স চেয়েও পায়নি। পাবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদের নতুন আবগারি নীতির কথা বলে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, তাজ গ্রুপ অব হোটেলস সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে হোটেলের একটি অংশ তোলার জন্য কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। কিন্তু কোন এক ভোজবাজিতে জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে ১৪ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তর হৈ চৈ হওয়ায় নাম কা ওয়াস্তে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হলেও, কাজের কাজ কিছু হয় নি। তাজ হোটেলের তুঙ্গে বৃহস্পতি, তাই জরিমানার সবটাই মকুব হয়ে যায় কিনা তা দেখতে নিন্দুকেরা ওঁৎ পেতে আছে।

চন্দন নিয়োগী

আলিমুদ্দিন স্ট্রি
কাজিয়া : ছোট তরফে

মার্কসবাদী ফরোয়া
ব্লকের প্রধান দু
নেতার অন্যতম তারা দ
আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সি পি আই এম-এর সদর দপ্তরে গিয়ে সাফ জানিয়ে এসেছেন আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের সোস্যালিস্ট পার্টি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তাই এই দলের দুই গোষ্ঠী যথা মৎস্য মন্ত্রী কিরণময় নন্দের গোষ্ঠী এবং বিমান মিত্রের গোষ্ঠী, এঁদের কাউকেই ফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দিতে দেওয় চলবে না। কিরণময় নন্দরও মন্ত্রী থাকা বান্ছনীয় নয়। প্রসঙ্গত, তারাবাবু এ প্রসঙ্গে যে উদাহরণটি দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান ও অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি মারা যাবার পর মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক কার্যতঃ দু'ভাগ হয়ে যায়, তখন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জি সাফ বলে দিয়েছিলেন, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের দু'টি গোষ্ঠী এক না হলে কোন গোষ্ঠীকেই ফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। পরবর্তী পর্যায়ে মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের দু'টি বিবাদমান গোষ্ঠী এক হলে ফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দেবার অনুমতি পায়। এবার পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিস্ট পার্টি দু'ভাগ হবার পর কোন গোষ্ঠী ফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দেবে, তা নিয়ে সি পি আই এম নেতৃবৃন্দ সরাসরি কোন মন্তব্য করেন নি। তবে তারাবাবু তাঁর প্রতিবাদ জিইয়ে রেখেছেন। তারাবাবু অবশ্য তাঁর বক্তব্যে সায় না দেওয়ায় ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি ও সি পি আই নেতৃবৃন্দের ওপর বেজায় চটেছেন। মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকেরই কোন কোন নেতা বলছেন, কিরণময় সি পি আই এম নেতাদের সঙ্গে যে লাইন করে রেখেছে, তা নাকি খুবই পোক্ত। ফলে, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ভাগ হবার পর ফ্রন্ট নেতারা যে থিয়োরি অ্যাপ্লাই করেছিলেন এক্ষেত্রে কি আবার করবেন? মনে তো হয় না।

চন্দন নিয়োগী

মহাকরণ
মানেকার কুকুর প্রেম

নেত্রী মানেকা গান্ধী একটি বিশেষ আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে। না, কোন রাজনৈতিক বক্তব্য নেই চিঠিতে। মানেকা শ্রী বসুকে অনুরোধ জানিয়েছেন, কলকাতার ফুটপাথ থেকে কুকুর ধরে নিয়ে হত্যা করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা যেন প্রয়োগ করা না হয়। জীবদরদী মানেকা লিখেছেন, পরিকল্পনা মত প্রতি সপ্তাহে শ' শ' কুকুরকে ইনজেকশান দিয়ে মেরে ফেলার কাজটি নিতান্তই অমানবিক। শুধু কুকুর হত্যা কেন, অনেক পাখির মাংসও আজ খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। মানেকা এ বিষয়েও কম উদ্বিগ্ন নন। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের কুকুর নিধনযজ্ঞের পরিকল্পনা মানেকাকে বড় বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। প্রতিবিধান চেয়ে মানেকা মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর গেছে। না, জবাব জ্যোতি বসু দেন নি, দিয়েছেন কলকাতার মেয়র কমল বসু। কমল বসু মন্তব্য করেছেন, কলকাতা থেকে বেওয়ারিশ কুকুর না সরিয়ে উপায় নেই। মানেকার এই কুকুর নিধনে আপত্তি থাকলে তিনি এদের নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। কলকাতার সব কুকুর বাড়িতে রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব নয় মানেকার পক্ষে, তবে মানেকার বাড়িতে কুকুরের মোটেই অভাব নেই। বিশ্বের সব প্রজাতির কুকুরই রয়েছে তাঁর বাড়িতে। তাই মানেকা যদি কলকাতার কুকুর নিধনে আপত্তি জানান, তা কি খুব অস্বাভাবিক? আর সবচেয়ে বড় কথা, কলকাতায় এই কুকুর নিধনের পরিকল্পনা গৃহীত না হলে হয়ত নেত্রী মানেকার পরিচয়ের আড়ালে জীব দরদী মানেকা কলকাতাবাসীদের কাছে অপরিচিতই থেকে যেতেন।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

মন্দির মসজিদ

হেমামালিনীর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা

সম্প্রতি সারা কলকাতা জুড়ে গুজব যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যধাম দক্ষিণেশ্বরে শ্রী শ্রী ঠাকুর পূজিত মাতা ভবতারিনী দেবী নাকি মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন এবং যাওয়ার সময় তিনি নাকি মন্দিরের পাথরের চত্বরে তাঁর শ্রীচরণের পদ-চিহ্নও এঁকে দিয়ে গেছেন। এপ্রিলের শেষে খৈতানের ডাকে কলকাতায় আগতা হেমমালিনীর গ্র্যাণ্ড হোটেলের ঘরেও সে গুজব ভেসে এসেছিল বাতাসে। শুনেই তৎক্ষণাৎ সেই অলৌকিক পাথুরে পদচিহ্ন দেখতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দৌড়ে ছিলেন হেমামালিনী। হায়, কোথায় কি! বাতাসের গুজব, বাতাসেই মিশে গেছে। চাতালে আর সেই পায়ের ছাপ নেই। অগত্যা মাতৃদর্শন এবং পূজারী অভয়পদ হালদারের মারফৎ মাতৃপূজা। তারপর প্রসাদী মালা, পদ্মফুল এবং সিঁদুর নিয়ে ফিরে আসা। গুজবের কলকাতা সম্পর্কে হেমামালিনী বললেন- 'আর যা কিছু নিয়ে গুজব হলে সহ্য করা যায়; কিন্তু ধর্ম নিয়ে গুজব একেবারেই বিচ্ছিরি!' হেমামালিনীর সঙ্গে আমরাও একমত।

রমাপ্রসাদ ঘোষাল

চিড়িয়াখানা

অম্বরীশের আহবান

রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী অম্বরীশ মুখার্জি এবার চিড়িয়াখানার পশুদের খাঁচায় না রেখে মানুষকে খাঁচায় রাখার একটি পরিকল্পনা নিচ্ছেন! কথাটা শুনতে খুব অদ্ভুত লাগলেও, মানুষ কিন্তু দর্শনার্থী হিসাবেই থাকবে, তাই পাশাপাশি খাঁচায় থেকে গিয়ে পশুত্বের স্বাদ পাবার প্রশ্নটা আসছে না।

হিংস্র বাঘ সিংহ থেকে শুরু করে তৃণভোজী পশুরা সবাই মুক্তির আনন্দে মানুষের কাছাকাছি যাতে আসতে পারে তারই জন্য এই খোলা চিড়িয়াখানা। এটি একটি বিরল প্রচেষ্টা বলে বনমন্ত্রী জানিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-এর কাছে এজন্য ৪০০ বিঘা জমি নেওয়া হয়ে গিয়েছে। বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে বাঘ, সিংহ, হরিণ ও নানা দেশের পাখি এখানে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখানে যেসব পশুরা স্থান পাবে তারা আর ঘেরাটোপে বন্দী দশায় জীবন কাটাবে না। বরং দর্শনার্থী মানুষেরা যদি হিংস্র পশুর স্বাভাবিক জীবন দেখতে আগ্রহী হন তবে তাঁদের জন্য খাঁচা বন্দী পথের ব্যবস্থা ওই কৃত্রিম বনাঞ্চলেই গড়া হবে। মন্ত্রী এক সময় আবেগের বশে বলে ওঠেন, এ রাজ্যে কি নেই? বন আছে, পাহাড় আছে, আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর আছে মনোহারিণী হরিণ। এ রাজ্যকে সাজাবার কিসের অভাব?

তবে বন পর্যটন ও চিড়িয়াখানা গড়ে তুলতে যে টাকা লাগবে তার বড় অভাব। আপাততঃ ২০ কোটি টাকা লাগছে। তার মধ্যে ৬ কোটি টাকা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। কেন্দ্রিয় সরকার বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করে যদি আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়ান তবে রাজ্যের পর্যটন শুধু নয়, দেশের একটি বিরল সম্পদ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে পারবে বলে মন্ত্রী মশাই আশা করেন।

চন্দন নিয়োগী

টলিউড

আলপনা গোস্বামীর প্রত্যাবর্তন

টলিউডের সংবাদ শিরোনামে এবার সেই আলপনা গোস্বামী। বছর তিনেক আগে মুখ্যমন্ত্রী পুত্র চন্দনের সঙ্গে আলপনার সম্পর্ক আছে বলে যে গুঞ্জনের জোয়ার উঠেছিল, সেই গুঞ্জন আপাতভাবে ধামা চাপা দিয়ে আলপনা মুখ্যমন্ত্রী আত্মীয় ডালিম বসুকে বিয়ে করে উড়ে গেছিলেন পশ্চিমে। স্বামী, সন্তান, সংসার নিয়ে দিন তাঁর ভালোই কাটছিল। কিন্তু সেই আলপনাই আবার সোজা টলিউডে। তবে কি ডালিম-আলপনার বিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাঙল? খবরে প্রকাশ, আলপনা টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার বিভিন্ন পরিচালকের কাছে ধর্ণাও দিয়েছেন, কাজ করতে চান। সংসার স্বামী সন্তান ছেড়ে এখানে আসা প্রসঙ্গে একটিই বক্তব্য-ছবিতে অভিনয়ের জন্য। রটনা, আলপনা নাকি স্থির করেছেন, ছবির অভিনয়ের কাজে কলকাতায় থাকবেন ছ'মাস, বাকি ছ'মাস স্বামীর কাছে। রটনা সত্যি হলে? সত্যি হলে ঘটনা ঘটবে একটিই-টলিউডের মহিলা তারকাদের ছ'মাসের

কাজে হয়ত কিছুটা ভাগ বসিয়ে দেবেন আলপনা। বাকি ছ'মাস তো তিনি স্বামীর কাছেই থাকছেন।

অমিত বিক্রম রাণা

লালবাজার

পার্ক স্ট্রিটের ও.সি. বদল

সম্প্রতি কলকাতার অভিজাততম থানা পার্ক স্ট্রিটের ও.সি. হয়ে এলেন অশোক যাজ্ঞিক। সৎ এবং কর্মপরায়ণ অফিসার হিসাবে অশোকবাবু পরিচিত। কিন্তু পার্ক স্ট্রিট থানায় দীর্ঘদিন বহাল থাকতে গেলে, সততা ও যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি নয়। আরও কিছু আছে। যে কারণে গত দেড় বছরে এই থানায় নয় নয় করে ৩ জন ও.সি. বদল হয়েছেন। এটা লালবাজারের ইতিহাসে একটি রেকর্ড। বার, অভিজাত ফ্ল্যাটের বারবনিতা ও বে-আইনি পার্কিং থেকে ওই থানায় মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয়। ওই টাকার একটা অংশ ভাগ বাটোয়ারা হয়, পুলিশেরই এক প্রভাবশালী মহলের মধ্যে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অশোকবাবু-ওই বিশেষ মহলের মন জুগিয়ে চলবেন? না তার নীতির রাস্তা ধরে চলবেন? যদি নিজের নীতি বজায় রেখে পার্ক স্ট্রিট থানায় অশোকবাবু টিঁকে যেতে পারেন, তবে সেটিও হবে পার্ক স্ট্রিট থানার ইতিহাসের একটি নতুন ঘটনা

চন্দন নিয়োগী

জালালাবাদের পাহাড়ে বিদ্রোহীরা

যুদ্ধদীর্ণ আজকের আফগানিস্তান

যুদ্ধটা এখন আফগান বনাম আফগানের। যাঁরা ভেবেছিলেন, সোভিয়েত সেনা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই পতন ঘটবে নাজিবুল্লাহ সরকারের, তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় দশলক্ষ মৃত্যুর পরেও এই গৃহযুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত! একটি সরজমিন প্রতিবেদন।

দশবছরের ক্রমাগত যুদ্ধের পর আফগানিস্তান এখন বিধ্বস্ত, দীর্ণ। রাজধানী কাবুল অধিকারের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অন্তত তিন তিনটি মুজাহিদিন গোষ্ঠী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এরা হল, মাসুদ, আবদুল হক এবং শাহ রুক্ষ গ্রান–এর নেতৃত্বাধীন তিনটে গোষ্ঠী। প্রথম দুজন আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক, আসলে তাঁরা চান আফগানিস্তানে ইসলামিক গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, আর শেষোক্তজন চান বিগত রাজতন্ত্রকেই ফিরিয়ে আনতে।

৩৭ বছর বয়সী ডাক্তার গ্রান জালালাবাদ-কাবুল সড়কে ১,৫০০ গেরিলা নিয়ে মোতায়েন। সোভিয়েত সেনা চলে যাবার পর এরা চল্লিশটি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি দখল করে নিয়েছেন। রাজধানীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় যেখান থেকে সেই সারুবি বাঁধের কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। বিদ্রোহীদের অস্ত্র যোগাচ্ছে আমেরিকা, আসছে পাকিস্তানের মাধ্যমে। সবমিলিয়ে দশবছরের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ গেছে প্রায় ১০ লক্ষের। আহত সরকারী সৈন্যরা বিদ্রোহীদের হাতেই শেষপর্যন্ত প্রাণ হারান, দু'একজনকে পাকিস্তানের পেশোয়ারে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে বিচার করা হয়। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রাচীর হিসেবে খাড়া রয়েছে সুলেমান পর্বত, সেখান থেকে আফগানিস্তান অবধি বিস্তৃত কুনার উপত্যকা এখন মুজাহিদিনদের দখলে। অভ্যন্তরে যেতে পারার মতো বাহন হচ্ছে শুধু জীপ, সেইসব জীপের চালকরাও সব তরুণ বিদ্রোহীরা, তাদের চোখ, চুল, পোশাক সব কাল। যেন ক্রমাগত মৃত্যু আর শোকের প্রতীক।

আফগান প্রতিরোধবাহিনীর গুলাবুদ্দিন হেকমতিয়ার–এর নেতৃত্বাধীন 'হেজব–এ–ইসলামি' গোষ্ঠীর গেরিলারাই কুনার উপত্যকায়

গেরিলা নেতা, সঙ্গীদের সঙ্গে গোপন ঘাঁটিতে

এখন গরিষ্ঠ শক্তি। এঁরা প্রাণের ভয় করেন না, কাবুলের কম্যুনিস্ট নেতৃত্বকে উৎখাত করতে এরা বদ্ধপরিকর। এঁরা মৌলবাদী এবং ধর্মান্ধ। বালির বস্তার আড়ালে প্রহরারত গেরিলা সৈনিকদের সদাসতর্ক দৃষ্টি সামনে রাস্তাগুলির ওপর। বিদ্রোহীদের নিয়ে যাওয়া আসা করছে পিক-আপ ভ্যানগুলি। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ দৃশ্যের মধ্যে পড়ে। গাছের গুঁড়িতে, পাথরের গায়ে মাঝে মাঝেই লেখা চোখে পড়ে বিভিন্ন শ্লোগান। 'শহীদের মৃত্যুর বদলা নাও, শত্রুর চোখে কাঁটা ছুঁড়ে মারো।' কোথাও বড় বড় করে লেখা হেকমতিয়ারের নাম, কাল অক্ষরে।

দশবছর আগেও এসব পাহাড়ি এলাকা ছিল ছবির মত নিরুপদ্রব। কিন্তু আজ আসাদাবাদ এবং চাঙ্গাতারাই শহরদুটি বিধ্বস্ত। শত শত নিরপরাধ মারা গেছে, প্রায় প্রতি পরিবার থেকেই কেউ না কেউ তরুণরা ভিড়ছে গেরিলাবাহিনীতে। আসাদাবাদে প্রতিটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর আলাদা অফিস আছে। একটি গোষ্ঠী তো সোভিয়েত সেনাদের একটি ব্যারাক দখল করে রেখেছিল। কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তান থেকে সরে যাবার পর গত জুনের জেনেভাচুক্তি অনুযায়ী বাড়িটি তারা আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। শহরের নানা স্থানে উড়ছে সাদা পতাকা, তাতে উৎকীর্ণ 'আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় ।' প্রতিটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা পতাকা আছে। হেজব–ই–ইসলামি–র সবুজ পতাকা, মুল্লাহ জামিল রহমান–এর সালাজি পার্টির কাল পতাকা। সৌদি আরবের রাজা ফাহদ সালাজি পার্টিকে টাকা দিয়ে থাকেন। পেশোয়ারের আবদুল্লাহ রোডে জামিল রহমানের রয়েছে চমৎকার সাদা রঙের অট্টালিকা, তাঁর হেডকোয়ার্টার।

আহত সহযোদ্ধার চিকিৎসা, গোপন আস্তানায়

সরকারী বাহিনীর বিধ্বস্ত ট্যাংক আর সামরিক বাহন

বর্তমানে এইসব গেরিলা যোদ্ধারা জালালাবাদের দোরগোড়ায় এসে পৌছেছেন। জালালাবাদ শহরটির দূরত্ব কাবুল থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। জালালাবাদের সঙ্গে কুনার উপত্যকার যোগাযোগরক্ষাকারী ব্রিজটির আগেই এক দুরারোহ পাহাড়ের গায়ে মুজাহিদিনদের আস্তানা। জায়গাটা যেন 'নো ম্যানস ল্যান্ড'। এখানে আগন্তুকদের খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা হয়। অচেনা কেউ এই অঞ্চলে এসে পড়লেই তাকে ঘিরে ধরে একদল মুজাহিদিন, তারপর নানা রকম প্রশ্ন। তারমধ্যে

গুলাবুদ্দিন হেকমতিয়ার-এর সাক্ষাৎকার

গুলাবুদ্দিন হেকমতিয়ার মুজাহিদিন গেরিলা বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত ও বিতর্কিত নাম। পেশোয়ারে তার ঝকমকে অফিস। ইদানীং তিনি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ সফর করে গেলেন তাঁর রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্যে। তিনি খুব একটা সফল হননি এ যাত্রায়। তাঁর সম্পর্কে সত্য, অর্ধসত্য মিলিয়ে অনেক রটনা। রটনা এমনও যে, মাদকদ্রব্য চোরাকারবারীদের সঙ্গেও নাকি তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। এখন আমেরিকার দাক্ষিণ্যে তাঁর ধনদৌলত অপর্যাপ্ত। তিনি প্রায় কোটি টাকা দামের এক বাংলোয় থাকেন এবং জার্মানী থেকে আমদানি করা বুলেটপ্রুফ গাড়ি চালিয়ে ঘোরাফেরা করেন।

ফর্সা, লম্বা এবং সুদর্শন গুলাবুদ্দিন হেকমতিয়ার ব্যবহার যথেষ্ট অমায়িক। পুশতু, পারসিয়ান, ইংরেজী, এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি বলতে পারেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা ক্ষমতাদখলের সম্ভাবনায় হেকমতিয়ার ইদানীং সাংবাদিকদের সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহারই করছেন। তাঁর সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ।

প্রশ্ন : সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে উত্তর আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান ও আমেরিকার সমর্থনে মুজাহিদিনদের দ্বারা দক্ষিণ আফগানিস্তান- আফগানিস্তানের এই সম্ভাব্য দু'ভাগ হওয়া সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

উত্তর : এরকম বাসনা কারোর কারোর অবশ্যই থাকতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা অবাস্তব। আমার এটা বলার একটা কারণ আছে। মুজাহিদিনদের যখন কোন কেন্দ্রীভূত শক্তি ছিল না। তখন রাশিয়ানরা জবরদস্তি অর্ধেক রাজ্য দখল করে তাদের সরকার কায়েম করেছিল। তবে রাশিয়ানরা দক্ষিণ আফগানিস্তানের চেয়েও উত্তর আফগানিস্তানে কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। এই পুতুল সরকার উত্তরের মানুষের কোন সমর্থনই পায়নি।

প্রঃ জেনেভা চুক্তি সম্পর্কে আপনার মত কি ? এটা কি আফগান বিদ্রোহীদের জয় ?

উঃ এই সংগ্রাম থেকে আমরা ইসলামকে আলাদা করতে পারিনা। ইসলামের জয় মানেই মুজাহিদিনের জয়। এই সংগ্রামের শক্তি নিহিত এর ইসলামিক চরিত্রের মধ্যেই। আপনি যদি এ থেকে ইসলামিক কার্যকলাপকে বাদ দেন তবে এ সংগ্রামই দাঁড়ায় না। সে কারণেই ইসলামের জয় মুজাহিদিনদের অন্তরে বিরাট শক্তি যুগিয়েছে। সোভিয়েত সৈন্য ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারটি অবশ্যই ইসলাম এবং মুজাহিদিন-এর জয়কে চিহ্নিত করেছে।

রাশিয়ানরা তাদের সৈন্যদের পরাজয়কে ঢাকতে এই চুক্তিকে ব্যবহার করেছে। তারা পৃথিবীর কাছে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে যে, শান্তি চুক্তির ফলেই তারা যেন সৈন্য সরিয়ে নিল।

প্রঃ যুদ্ধের ফলে আপনার দেশ তো আর্থিকভাবে ধ্বংস হয়েছে। সে জন্যে আপনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর পাকিস্তানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেবার কথা ভাবছেন ? এবং এর ফলে আফগানিস্তানে তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের কথা ভেবেছেন ?

উঃ একটি দেশ যখন কোন বৃহৎ শক্তির মুঠো থেকে বেরিয়ে আসে সে আর কারও মুঠোর মধ্যে যেতে চায় না। আমরা চাই স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ, ইসলামিক এবং আত্মনির্ভর আফগানিস্তান। আমরা, কোনও অবস্থাতেই কখনই আমাদের দেশকে কোন বৃহৎ শক্তির সৈন্যঘাঁটি হতে দেবনা।

প্রঃ এক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাটি দেখা যাক। বোধহয় আপনাদের বিদ্রোহী সংগ্রাম এখনও সংগঠিত নয় সে কারণেই রাজীব গান্ধী নাজিবুল্লাহ্ সরকারকে সমর্থন করেছেন। ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ট। অন্যদিকে ভারত সরকার ২০,০০০ আফগান শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছেন। সব মিলিয়ে আফগানিস্তান প্রশ্নে ভারতের ভূমিকা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

উঃ আমরা দেখছি যে, ভারত সরকার আফগান প্রশ্নে তাঁর দেশের মানুষের ইচ্ছা এবং অনুভূতির সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ! আমি জানিনা একজন নিরপেক্ষ এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আফগানিস্তানের ব্যাপারে ভারতের উদ্দেশ্য এবং নীতির ব্যাখ্যা কিভাবে করবেন। রাজীব গান্ধী জেনেভা চুক্তির অব্যবহিত আগেই নাজিবুল্লাহকে ভারতে আমন্ত্রণ করে এই ইম্প্রেশনই তৈরি করতে চেয়েছিলেন যে রাশিয়ানরা আফগানিস্তান ত্যাগ করলে ভারত সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে। বিস্ময়ের কথা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়েও ভারত আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র ফিরে আসাকে সমর্থন জানিয়েছে। ভারত তার বিদেশ মন্ত্রী নটবর সিংকে রোমে পাঠিয়েছিল জহির শাহকে আফগানিস্তানে ফিরে আসায় উৎসাহিত করতে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, আমাদের আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারত কেন মধ্যস্থতা করতে আসছে ? আমরা কি বলেছি যে ভারতে ইসলামিক সরকার চাই ? আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার-ই ভারতকে দেওয়া হয়নি। আমরা ভারতের সঙ্গে তেমনই বন্ধুত্ব এবং সুস্থ সম্পর্ক চাই, যেমন আছে পাকিস্তানের সঙ্গে।

প্রঃ হয়ত রাজীব গান্ধী বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, কাকে সাহায্য করবেন কারণ সাত পার্টির জোটে এবং মুজাহিদিন গ্রুপগুলোয় একতা নেই।

উঃ রাজীব গান্ধী বিভ্রান্ত। প্রথমত, আমাদের সাহায্য করলে সোভিয়েত রাশিয়া এবং তাদের তাঁবেদারদের কোনও সাহায্য তিনি পাবেন না। যদি ভারত আফগান বিদ্রোহকে সমর্থন করে একটি কথাও বলত খুশি হতাম।

প্রঃ আপনারা বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করে কোন ফল পাচ্ছেন না। তাই এখন সকলে জোট বাঁধার ব্যাপারে কি পরিকল্পনা আছে? পরের পদক্ষেপ কি?

উঃ লড়াই এখনও শেষ হয়নি। তবুও একটা গতি পেয়েছে। যতদিন না রাশিয়ানরা তাদের মদৎ প্রত্যাহার করে নেয় এবং মুজাহিদিনরা ইসলামিক সরকার গঠন করতে পারে ততদিন এ যুদ্ধ চলবে। আমরা বিশ্বাস করি, রাশিয়ানরা বেশিদিন নাজিব সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারবেনা, মুজাহিদিনরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা পাবেই। আমরা সেভাবেই প্রস্তুত হচ্ছি রাজনৈতিক এবং সামরিক স্তরে। আমাদের পরিকল্পনা আছে বড় বড় শহরগুলি আক্রমণ করার এবং সেই সঙ্গে পরিকল্পনা আছে সেগুলির শাসন ও অন্যান্য ব্যবস্থা হাতে নেবার। আমরা পূর্ণ স্বাধীন হবার পরই বিভিন্ন রাজ্যের নেতার নাম ঘোষণা করবো। আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি একটি নির্বাচিত কাউন্সিলের। ভোট হবে আনুপাতিক ভিত্তিতে। এই পদ্ধতিতেই নির্বাচন হবে এবং আমাদের সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতিদের নিয়োগের।

আফগান বিদ্রোহী গ্রুপগুলি

হিজব–ই–ইসলামি (আফগানিস্তান ইসলামিক পার্টি):

এটি একটি অতিরক্ষনশীল সুন্নি মুসলিম গ্রুপ এবং আফগানিস্তানের বিদ্রোহীদের প্রধান লড়াকু শক্তি। এর নেতা কাবুল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ইঞ্জিনীয়ারিং–এর ছাত্র গুলাবুদ্দিন হেকমতিয়ার, যিনি ১৯৬৯ সালে র‍্যাডিক্যাল 'মুসলিম স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন'–এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরকার বিরোধী কার্যকলাপ এবং মাওবাদী এক ছাত্রের খুনের অভিযোগে তাঁকে ১৯৭২ সালে এ্যারেস্ট করা হয়। তাঁর বহু সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৩ সালে রাজা মোহাম্মদ জাহির শাহর পতনের ফলে তিনি মুক্তি পান।

জামায়েত–ই–ইসলামি:

এটি হল আফগানিস্তানের আর একটি অপরিহার্য লড়াকু শক্তি। হিজব–ই–ইসলামি–র মত এরাও ইসলামিক আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সরকার স্থাপনে বিশ্বাসী–যদিও সেই সরকারে প্রগতিশীল এবং শোধনবাদী দলগুলিকে অংশগ্রহণ করতে দিতে এরা প্রস্তুত। উত্তর আফগানিস্তানের উজবেক এবং তাজিকদের কাছ থেকে মূলত সাহায্য এবং সহযোগিতা পায় জামাত–ই–ইসলামি, যদিও এর নেতা বাদাখাশানের তাজিক বংশোদ্ভূত এবং কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক থিয়োলজির ভূতপূর্ব অধ্যাপক সৈয়দ বরহানুদ্দিন রব্বানিকে দেশের সবাই শ্রদ্ধা করেন। মৌলানা মউদুদি পরিচালিত পাকিস্তানের জামায়েত–ই–ইসলামি দলের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যেহেতু হিজব–ই–ইসলামি এবং অন্যান্য সংগ্রামী আফগান দলগুলির কাছে এরা গ্রহণযোগ্য সে কারণে এরা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। এদের শক্তির মূল ব্যাপারটা এখানেই নিহিত। তবে এদের লড়াকু শক্তি উত্তর আফগানিস্তানের উজবেক এবং তাজিক অংশেই সীমাবদ্ধ।

জাভা-ইয়ে-আজদিয়ার (আফগান ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট):

বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা সিবগাতুল্লা মুজাদিদি এই দলটি পরিচালনা করেন। উপজাতিরা এই দলটির সমর্থন করেন ফলে জাতীয় স্তরে বড় সমর্থন পান এই নেতা। এই দলটি ১৯৭৯–র প্রথমদিকে পাদপ্রদীপের আলোয় আসে, যখন পশ্চিমী এবং উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে অস্ত্রশস্ত্র পায় এবং ঐ সময় তারা কোনার প্রদেশে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

মুজাদিদি অভূতপূর্বভাবে আফগানিস্তানের ভিতর এবং বাইরে থেকে সমর্থন পেয়েছেন। সারা দেশে ইসলামিক ধর্মীয় কেন্দ্রগুলির বিস্তৃতিসাধন করেছিলেন কাবুল শোর বাজারের যে হজরত সাহিব, মুজাদিদি তাঁর এক প্রপৌত্র। মুজাদিদি একজন শোধনবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অনেককেই ১৯৭৮ সালে তারাক্কি রাজত্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং পেশোয়ারে ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা করেন। আফগানের সংগ্রামী শক্তিগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা তিনি এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন।

পায়াম–ই–এত্তেহাদ–ই–ইসলাম (ন্যাশানাল ইসলামিক ফ্রন্ট):

পরিচালক সৈয়দ আহমেদ এফেনদি গইলানি এই দলে প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ সংখ্যক (৭০,০০০) মুজাহিদিন গেরিলা ছিল। গইলানির পারিবারিক সুনামের জন্যে পাকিস্তানের গায়েই গুরুত্বপূর্ণ পাকতিয়া এলাকার পুশতুন উপজাতির কাছ থেকে তিনি সমর্থন লাভ করেছেন। মুজাদিদির মতো গইলানিও মার্কিনী সমর্থনপুষ্ট।

(ইসলামিক রেভলিউশানারি মুভমেন্ট)
হরকত–ই–ইনকিলাব–ই–ইসলামি

এটি পেশোয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ একটি দল, যার বিশেষ পরিচিতি নেই (যদিও এরা প্রচুর বিদেশী সাহায্য পায়) শুধুমাত্র, মৌলবি মোহাম্মেদ নবি মহাম্মেদি, এই দলটি পরিচালনা করেন এটুকু জানা ছাড়া। তিনি লোগা প্রভিন্স থেকে আসা এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আগে যিনি র‍্যাডিক্যাল মুসলিম ব্রাদারহুড সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দলটিকে ১৯৭৯–র মার্চের মাঝামাঝি সংঘটিত হেরাত বিদ্রোহে অভিযুক্ত করেছিল।

এগুলি ছাড়া ছোট ছোট বহু দল আছে যাদের মূল পাকিস্তানে। যেমন শোলে, জাভা–ইয়ে–মোবারেজিন–ই–আজাদি–ই আফগানিস্তান (ফ্রন্ট অব দ্য হোলি ওয়ারিয়রস ফর দ্য লিবারেশান অফ আফগানিস্তান)। কিছু দল আছে আফগানিস্তান-এর ভেতরেই যেমন, কাবুল কেন্দ্রিক–নসের-উল-ইসলামি।

কিংবদন্তীর গেরিলা যোদ্ধা

আফগানিস্তানে যাঁরা বিদ্রোহের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, সেইসব গেরিলা বাহিনীর অন্যতম এক নেতা হাজী আবদুল হক, জীবিতাবস্থাতেই যিনি কিংবদন্তী, ২৯ বছর বয়সেই তিনি এই খ্যাতির অধিকারী। কাবুলের আশেপাশে যাঁর অনুগত গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা ৫,০০০–এরও বেশি, জাতীয় পর্যায়েও তাঁর প্রভাব ব্যাপক। সোভিয়েত বাহিনী চলে যাবার পর এঁর যোদ্ধারাই কাবুল দখলের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এঁরা নিশ্চিত যে পরবর্তী সরকার এঁরাই চালাবেন।

গত ১২ বছরে ১৫ বার আহত হয়েছেন হাজী আবদুল হক, তাঁর ডান পা'টা মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। তাঁকে বন্দী করা হয়েছে, তাঁর ওপর চলেছে বহু অত্যাচার, মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছিল তাকে যদিও পরিবারের লোকজন ঘুষ দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন–সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন যেন এক প্রবাদ পুরুষ।

১৯৮৫–র শেষদিকে আবদুল হক দেখা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন এবং ১৯৮৬–র গোড়ায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে। তিনি হচ্ছেন প্রথম মুজাহিদিন যার সঙ্গে ঐ দুজন রাষ্ট্রনেতা দেখা করেছিলেন। হকের ঐ সাক্ষাৎকার সেবার অনেক কাজ দিয়েছিল।

হক কম্যান্ডারদের ভেতর 'লয়া জিরগাহ' নামে এক আন্দোলনের স্রষ্টা. এটি হচ্ছে নেতা নির্বাচনের জন্য এক ধরনের পুরনো আফগানি প্রথা। তিনি বলেছেন, 'আমরা শুধু পুশতুনদের নিয়ে নয়, সবকটি জাতি গোষ্ঠীকে নিয়ে সরকার তৈরি করতে চাই। অনেক লোক মারা গেছে, আর রক্তপাত নয়।'

তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি মন্ত্রী বা জেনারেল হতে চাই না, বাড়ি ফিরে চাষবাস করবো কিংবা নিজের স্কুলে ফিরে যাবো। তবে দেশের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে হয়তো আমার কিছু ভূমিকা থাকবে।'

একটা প্রশ্ন হল, 'তুমি কি মুসলমান?' উত্তর যদি 'না' হয় তখন মুজাহিদিনদের বক্তব্য হবে, 'মুসলমান ছাড়া এখানে কারো থেকার কিংবা থাকার অধিকার নেই। আল্লাহ'র কৃপায় আমরা জালালাবাদ মুক্ত করতে চলেছি। মুক্ত করবো পুরো আফগানিস্তান। আল্লাহ-আকবর। আমরা দখল করবো তাসখন্দ বুখারা-রাশিয়ার যেখানে যেখানে মুসলমানরা আছে সেইসব জায়গাগুলোও। আল্লাহ-আকবর। আমরা দখল করবো ইতালির দক্ষিণাংশ, ওটাও আমাদের। আল্লাহ'র কৃপায় আমরা এ জিহাদে জয়ী হবোই।'

প্রশ্ন করলাম, যেসব আফগান কম্যুনিস্টরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারাও তো মুসলমান?

নাসারুল্লাহ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কখনোই না। ওরা প্রকৃত মুসলমান হলে রাশিয়ানদের সঙ্গে লড়ত। আমরা ক্ষমতায় এলে ওদের বৌ, ছেলেমেয়ে, বাবা-মা সবাইকে শেষ করে ফেলবো। কেননা, কম্যুনিস্টরা থাকলে ইসলামি গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।'

-নিজস্ব প্রতিনিধি

এই দৃশ্যটিকে আপনার যদি বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়...

তাহলে আপনি হয়তো আজ পর্য্যন্ত 'ফ্রেঞ্চি'-ই পরেন নি।

ভি আই পি ফ্রেঞ্চি। ছোটখাট আঁটসাট জাঙিয়া
যাতে পুরুষালী তাকত পুরোপুরি ঠাসা। এটিকে
নিয়ে তো সারাদুনিয়ায় কাড়াকাড়ি পড়ে
গেছে। আমাদের বড়বড় শহরগুলিতেও এর রম্‌রমা
চাহিদা। সত্যিই এ এক আন্তর্জাতিক স্টাইল যা
ভি আই পি এনেছে আপনারই মত দৃপ্ত
পুরুষদের জন্য।

"রূপ অনেক, নাম এক-খৈতান"

হেমা মালিনী, রাজ বব্বর, পদ্মিনী, রাধিকা, দেবিকা... ম্যাগনেট, ব্যারন, টাইকুন, ডাইনেস্টি, মিনি, চিকি, মিকি, ভিকি, রূপা, সোনা... আমাদের তারকার সূচী অনেক বড়। কার্যকুশলতায় ও সৌন্দর্যে চমৎকার, তাই কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবেন! প্রতিটি খৈতান পাখা আমাদের নিজস্ব কারখানায় তৈরি। সুতরাং ১০০% খৈতান! তাইতো খৈতানের উৎকৃষ্টতা অর্থাৎ অদ্বিতীয় কোয়ালিটি এতো বেশি নির্ভরযোগ্য।

বাড়ী কিম্বা অফিস, দোকান কিম্বা গুদাম, বাথরুম বা রান্নাঘর, সিনেমা হল বা থিয়েটার, কারখানা অথবা ফাউন্ড্রি—১৩৫ টিরও বেশি ধরনের, বিভিন্ন সাইজে ও রঙে খৈতানের অপূর্ব পাখা যে কোন জায়গার জন্য উপযোগী। আসল কথা হলো—হাওয়া চাই যেখানে, খৈতান সেখানে।
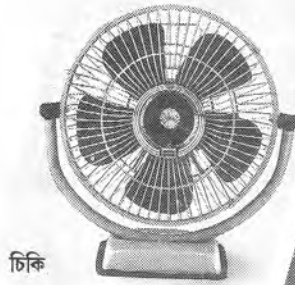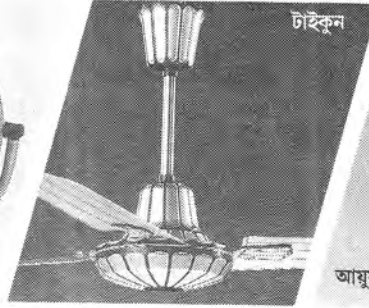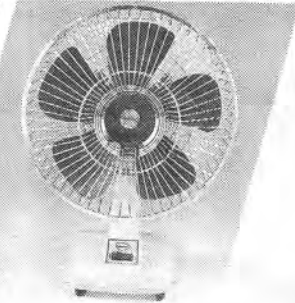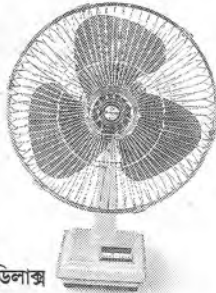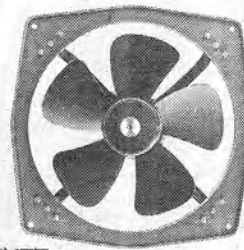
খৈতান-শুধু নামই যথেষ্ট

সাত এপ্রিলের সকালবেলা কলকাতার পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের গেট থেকে বিদ্যুৎ গতিতে একটি গাড়ি বেরিয়ে এল। এখনও বৈশাখ পড়ে নি। তবু এই সাত সকালেই কলাকাতার রাস্তাগুলি তেতে উঠেছে। প্রতিদিনের মতই বেরিয়ে পড়েছে যানবাহনগুলি। পুলিশের গাড়ির মধ্যে রয়েছে হালকা ক্রীম রঙের লোমশ একটি কুকুর। দুটি কুতকুতে চোখ জানলা দিয়ে চারপাশ অত্যন্ত মনযোগ সহকারে জরিপ করে চলেছে। কুকুরটির পাশে বসে রয়েছে কয়েকজন পুলিশ। হর্নের আওয়াজ করতে করতে গাড়িটি এগিয়ে চলেছে। আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কলকাতাতে আসছেন। এই কারণে কলকাতাতে সকাল থেকেই সাজো সাজো রব। কলকাতার পুলিশ মহল তথা গোয়েন্দা মহলে শুরু হয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আয়োজন। সুঁচ গলার উপায় নেই। গোয়েন্দার শ্যেনচক্ষু সর্বত্রই ঘোরাফেরা করছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাত সকালেই বেরিয়ে পড়েছে ডগ স্কোয়াড। গাড়িতে উপবিষ্ট কুকুরটির নাম ভেস্পা। একেবারে বাজপাখির মত ক্ষিপ্র এই কুকুরটি।

ন'টার আগেই তীব্রগতিতে পুলিশের গাড়িটি এসে থামল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের কাছে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আজ এই স্টেডিয়ামে আসছেন। সুতরাং ভি.আই.পি. ট্রিটমেন্ট। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে কমান্ডো, ব্ল্যাক ক্যাট, গোয়েন্দাদের মতই ডগ স্কোয়াডের এই কুকুরটি অত্যন্ত দক্ষ। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার গলদেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এ কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াডের কুকুর গোয়েন্দা ভেস্পাকে নিয়ে আসা হলো মাঠের একধারে। এবার সে অপারেশান শুরু করল। অত বড় বিশাল মাঠটা আড়াআড়ি ভাবে চক্কর দিয়ে মাটি শুঁকতে লাগত। উদ্দেশ্য, মাটির নিচে কোন বিস্ফারক লুকোনো আছে কিনা তা খুঁজে বের করা। বিশাল মাঠটির এ কোণ থেকে ও কোণ চক্কর দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ফিরে এল ডগ স্কোয়াডের লোক–জনের কাছে। অফিসাররা নিশ্চিত হলেন যে তারা যা আশংকা করেছিলেন, তা ঠিক নয়। এখানে নির্বিঘ্নেই প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন।

কলকাতার ডগ স্কোয়াডকে প্রায়শই এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে হয়। একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারটি এই কুকুর গোয়েন্দারা তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখে, তেমনই বহু জটিল খুন, ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণের কিনারা করে থাকে এই মনুষ্যেতর জীবগুলি। এমনই একটি ঘটনার কথা শোনা যাক। এটি কলাকাতারই মেট্রো রেলের ঘটনা।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহের ঘটনা। লালবাজারের কন্ট্রোল রুম হঠাৎ টেলিফোন করে জানাল যে টালিগঞ্জের মেট্রো রেলের ড্রাইভার ও গার্ডের কেবিনে বোমা রাখা রয়েছে। মেট্রো রেলে সাড়া পড়ে গেল। শুরু হলো ছুটোছুটি। সমস্ত ট্রেনগুলি বন্ধ করে দিলেন কর্তৃপক্ষ। খবর গেল, পুলিশে। সেখান থেকে ডগ স্কোয়াডে। খবর পেয়েই অপারেশান। বোমা বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ ভেস্পাকে নিয়ে ছুটে এলেন অফিসাররা। ভেস্পাকে নিয়ে হ্যান্ডার সনৎ নাথ এবং এস. লামা তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। ভেস্পা একটার পর একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে মেঝে শুঁকতে লাগল। এককে সময় মনে হলো ভেস্পা বুঝি বোমার খবর পেয়ে গেছে। সীটের নিচে ঢুকে অবশেষে অফিসারদের সামনে এসে দাঁড়াল। ক্লান্ত হয়ে জীভ বের করে হাঁফাতে হাঁফাতে ভেস্পা জানিয়ে দিল–লালবাজারের কন্ট্রোল রুমের খবরটি ভুল। আবার ট্রেন সার্ভিস নর্মাল হলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন প্ল্যাটফর্মের যাত্রীরা। উৎকণ্ঠিত, আতংকিত যাত্রীদের আশ্বস্ত করে ভেস্পা ফিরে গেল নিজের ডেরাতে।

এবার একটু পেছন দিকে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। উনিশশো একাশি সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। মধ্যকলকাতার অভিজাত এলাকা পার্ক স্ট্রিটের কুইন্স ম্যানসনের চত্বরে একটি পুরুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। শীতের সকাল। ওই বাসিন্দাদের নজরে পড়ল একটি দেহ থেঁতলে রক্তাক্ত অবস্থাতে পড়ে আছে। তারা তৎক্ষণাৎ খবর দিলেন নিকটবর্তী পার্ক স্ট্রিট থানাতে। তারপরই পুলিশ এল মৃতদেহটি সরজমিন পর্যবেক্ষণ

কুকুর কাহিনী

অন্তর্ঘাত, বিস্ফোরণ, ড্রাগচক্র এবং খুনখারাবির কিনারা করতে গিয়ে কলকাতা ও দিল্লি পুলিশের এই ট্রেন্ড কুকুরগুলি আশ্চর্যতর কাণ্ডকারখানার পরিচয় দিয়েছে। এই প্রতিবেদন জীবজগতের সবচেয়ে তীক্ষ্ণধী এবং পরিশ্রমী প্রাণীদের কীর্তি–কাহিনী নিয়ে পেশ করছে প্রাণী–পুলিশের অজানা অধ্যায়কে!

ডগ স্কোয়াডের ডোরা, ভেসপা, রেখা ও সোমা

করতে। এবং লাশটি পরীক্ষা করে তারা একটি মামলা দায়ের করলেন। কেস নাম্বার—সেকসান-কে/কেস নং ৭৫৫/২০.১২.৮১। সেদিন সকাল বেলাতেই ডগ স্কোয়াড়কে টেলিফোন করে খবর দেওয়া হলো। খবর পেয়ে ছুটে এলেন অফিসাররা। সঙ্গে গোয়েন্দা কুকুর জুলি। জুলি এসেই প্রথমে মৃতদেহের চারপাশ ঘুরে দেখল। হ্যাণ্ডার এবার তাকে মৃতদেহের কাপড়ের একটি অংশ শুঁকিয়ে দিলেন। তারপরই জুলি দ্রুত বেগে চারতলার ফ্ল্যাটের সামনে উঠে এল। উঠেই দরজাতে আঁচড়াতে লাগল। ওই ফ্ল্যাটের মালিক হলেন নান্দু আদবানি। এইবার পুলিশ অফিসার ও হ্যাণ্ডার কলিং বেল টিপতেই, আদবানি দরজা খুললেন। দরজা খোলা পেতেই জুলি ভেতরে ঢুকল। তারপর চতুর্দিকে তন্নতন্ন তল্লাশি শুরু করল। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। এবার জুলি দ্রুত বেগে বেরিয়ে এল বারান্দাতে। তারপর সে চলে গেল একধারে। অফিসাররা দেখলেন যে জুলি যেখানে ঘোরাঘুরি করছে, সেখানকার টবগুলি ভাঙা। দেওয়ালে ধস্তাধস্তির দাগ। সেখানেই জুলি বসে চিৎকার করতে লাগল। অফিসাররা ওখানে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে নিচে ঠিক ওই জায়গা বরাবর লাশটি পড়ে আছে। এবার আদবানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পার্ক স্ট্রিট থানাতে নিয়ে আসা হলো। জেরার মুখে আদবানি স্বীকার করে যে ওই ফ্ল্যাটেই পাঁচজনের পার্টি হয়। ওই পার্টিতে একজন মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। পার্টিতে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান চলে। তারপর ধস্তাধস্তি হয়। ধস্তাধস্তির সময়েই ওই যুবকটিকে বারান্দা থেকে ফেলে দেওয়া হয়। যাই হোক, পুলিশ মামলা করে। বিচারে আদবানির শাস্তি হয়। ওইদিন ওই রহস্যময় খুনের কিনারা করতে ডি সি (সাউথ) ও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন যদি গোয়েন্দা কুকুরটি না আসত, তাহলে খুনের কিনারা করা সহজসাধ্য হতো না।

কলকাতার ডগ স্কোয়াড এমন অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করে এসেছে। এই ডগ স্কোয়াডের সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। রাজা ও রানী নামে দুটি কুকুরকে নিয়ে এই স্কোয়াডটি শুরু হয়। এর আগে বেঙ্গল পুলিশে ডগ স্কোয়াড ছিল। অপরাধের কিনারা করতে বেঙ্গল পুলিশের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া হতো। এতে অবশ্য কাজের খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। বি এস এফ—এর কাছ থেকে রাজা ও রানী নামে দুটি কুকুর নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এই স্কোয়াডের উদ্দেশ্য ছিল খুন জখম ডাকাতি বোমা বিস্ফোরণের কিনারা করা। প্রথমে দুটি কুকুর নিয়ে ডগ স্কোয়াড শুরু হলেও পরে আরও পেশাদার শিক্ষিত কুকুরকে আনা হয়। এদের মধ্যে তারা, রক্ষা, বামা উল্লেখযোগ্য। এইসব কুকুরগুলির নাম দিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনার স্বয়ং। এদের ট্রেনিং দিতে ব্যারাকপুর পাঠানো হয়। ১৯৭১ সালে এক বছরের জন্য বেকি ও হ্যাণ্ডস নামে দুটি গোয়েন্দা কুকুর দিল্লি গিয়েছিল ট্রেনিং নিতে। এই কুকুরগুলিকে আনা হয়েছিল জার্মানী ও ইংল্যাণ্ড থেকে।

কলকাতা ডগ স্কোয়াডে ছ'টি কুকুর। প্রত্যেকটি কুকুরের জন্য একটি করে হ্যাণ্ডার। বর্তমানে ডগ স্কোয়াডে চারটি গোয়েন্দা কুকুর কর্তব্যরত রয়েছে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য। ন'জন হ্যাণ্ডার রয়েছে দেখাশুনো করার ব্যাপারে। এই কুকুরগুলির নাম যথাক্রমে সোমা—এর বয়স ছ'বছর সাত মাস, রেখার বয়স চার বছর চার মাস, ভেস্‌পার বয়স দু'বছর পাঁচ মাস, ডোরার বয়স দু'বছর সাত মাস। সোমা ও রেখার কাজ হলো ট্রাকিং এবং স্মেল—অর্থাৎ ডাকাত—খুনেদের ধরা। ভেস্‌পা বোমা বিস্ফোরণের তদন্ত করে। ডোরার কাজ হলো নারকোটিক্স—এর কেসগুলির অনুসন্ধান করা। গত বছর ২২ ফেব্রুয়ারি ভেস্‌পা এবং ডোরার হ্যাণ্ডার সনৎ নাথ, সন্তোষ রায় সনমান তামাং-এর সঙ্গে গোয়ালিয়র—এ ন্যাশনাল ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিল। এবং ডোরা ওই ট্রেনিং—এ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উনিশশো অষ্টআশির ডিসেম্বর মাসে কেটি এবং এ বছর মার্চ মাসে আরেকটি কুকুর জুলি মারা যায়। গোয়েন্দা কুকুর জুলি তার বারো বছরের জীবনে অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছিল। টালিগঞ্জ ও ওয়াটগঞ্জের দুটি জটিল কেসের কিনারা করে গোয়েন্দা বিভাগে সে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল।

গোয়েন্দা কুকুরগুলি কেনার ব্যাপারে ডগ স্কোয়াড ভালো জাতের কুকুর শাবকের দিকে নজর দেয়। ভেস্‌পা, ডোরাকে কলকাতা থেকেই কেনা হয়েছিল। তারপর এক বছরের জন্য গোয়ালিয়রে ট্রেনিং নিতে পাঠানো হয়। ডোরা খুব দক্ষ কুকুর। এই গোয়েন্দা কুকুরটি নারক্রোটিক্স—এর আসামী ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। ডগ স্কোয়াড কর্তৃপক্ষের মতে, ডোরা যে ধরনের পারফর্মেন্স দেখিয়েছে, তাতে যে কোন ধরনের নারক্রোটিক্স কেসের কিনারা সে করতে পারবে। তবে ডগ স্কোয়াডের সেরা গোয়েন্দা কুকুর ছিল বেকি। বেকি হলো জুলির মা। ডগ স্কোয়াডের প্রথম দিকে এই গোয়েন্দা কুকুরটি অনেক রহস্যের কিনারা করেছে।

কলকাতা ডগ স্কোয়াডের মূল দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের ওপর। তারই অধীনে গোয়েন্দা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মূলত এই বিভাগটি দেখাশোনা করেন। এই বিভাগে রয়েছেন, একজন করে ও. সি., সার্জেন্ট, এস.আই., ন'জন হ্যাণ্ডার, তিনজন ক্যানেল বয়। এই নিয়েই ডগ স্কোয়াড। কুকুরগুলিকে দেখাশোনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশু চিকিৎসক রয়েছেন। কুকুরেরা অসুখে পড়লে তাদের পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আলিপুরের ভেটের্নারি ক্লিনিকের ডঃ সেনগুপ্ত এদের চিকিৎসা করে থাকেন।

ডগ স্কোয়াডের প্রতিটি কুকুরের খাবার খরচ মাসিক তিনশ টাকা। প্রথমে এই খরচ ছিল দেড়শ টাকা। পরের দিকে তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই তথ্য জানালেন ডগ স্কোয়াডের ও.সি. সুধীর বিশ্বাস। ওষুধের খরচ আলাদা। সব মিলিয়ে বছরে পাঁচ হাজার টাকার মত খরচ বরাদ্দ করা রয়েছে। একজন হ্যাণ্ডারের বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ

গোয়েন্দা কুকুরের প্রশিক্ষণ

বছরে ষোল হাজার টাকার মত।

সকাল ছ'টায় উঠে ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয় কুকুরগুলোকে। ময়দানের সতেজ বাতাসে ঘোরাফেরা করার ফলে এদের একঘেঁয়েমি কেটে যায়। কখনো এদের মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলন করানো হয়। কখনো বা গোয়েন্দাগিরির পাঠ দেন প্রশিক্ষকরা। একসঙ্গে দশ বারোটি রুমালের মধ্যে একটি ঘাম মোছা রুমাল বা কোন রিভলবারের গুলি লুকিয়ে রেখে তাদের খুঁজে বের করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসবের পর আটটার সময় এদের ফেরত আনা হয়। ফেরার পর স্কোয়াডের লোক-জনেরা ম্যাসেজ করে দেয়। লোম আঁচড়ে স্যাভেল ওয়াটার দিয়ে স্পঞ্জ করে দেওয়া হয়। তারপর ন'টা নাগাদ দুপুরের খাবার খেতে দেওয়া হয়। খাবার হলো—দুশো গ্রাম পরিমানের হাত রুটি, আধ লিটার দুধ, একটি সিদ্ধ ডিম, এক লিটারের মত জল। বিকেলে আড়াই শো গ্রাম চালের ভাত, সব্জির তরকারি—এদের মধ্যে পেঁপে থাকবেই। এছাড়া বীট, গাজর, লাউ, বাঁধাকপির পাতা থাকে এবং সাড়ে সাতশ গ্রাম বীফ। এগুলি মণ্ড করে তাদের দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিরামিষ। তখন দই ভাত থাকে রাতের ডিনারে। প্রতিটি কুকুর সারা দিনে দুই থেকে তিন লিটার জল খেয়ে থাকে।

কিভাবে এই গোয়েন্দা কুকুরেরা কাজ করে? কোন খুন, ডাকাতি সংঘটিত হলে অথবা কোন চোরাই জিনিসের অনুসন্ধান করার সময় কুকুর-গুলোকে অপরাধ সংক্রান্ত কোন জিনিস শুঁকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কুকুরগুলি তীব্র ঘ্রাণশক্তি নিয়ে অপরাধীর পথ অনুসরণ করে থাকে। তবে অপরাধীরা গাড়ি ব্যবহার করলে গোয়েন্দা কুকুর-গুলি বিশেষ কোন কাজ করতে পারে না। গ্রামেগঞ্জে বা পাহাড়ি এলাকাতে গোয়েন্দা কুকুরেরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে থাকে। এর কারণ, সেখানে অপরাধীরা খুব কমই গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। ভারতবর্ষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত 'ওয়াচে' এরা এক নম্বর মাস্টার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত মাদক দ্রব্যের বে-আইনি পাচার রুখতে নারক্রো-টিক্স বিভাগের কুকুরদের কাজে লাগানো হয়। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশে একটি এ্যান্টি ড্রাগ সেল খোলা হয়েছে। এই বিভাগে একজন কমিশনার দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, চারজন ইন্সপেক্টর ইন-চার্জ রয়েছেন। এ ব্যাপারে গোয়েন্দা কুকুর-গুলিকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

ডগ স্কোয়াডের ইতিহাসে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের নকশাল আন্দোলনের সময়টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সালে বেশ কিছু কেসের কিনারা করে এই গোয়েন্দা কুকুরেরা। ১৯৭৩ সালে ষোলটি খুনের কেসের মধ্যে পাঁচটি কেস সনাক্ত করে। পরের মাসের পয়লা জানুয়ারি থেকে একত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে ছ'টি খুন ঘটে। এই ছ'টি কেসের মধ্যে তিনটি কেসের অপরাধীকে গোয়েন্দা কুকুরেরা ধরে ফেলে।

কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডের ও.সি. সুধীর বিশ্বাস

কলকাতা ডগ স্কোয়াডের কর্তৃপক্ষ অবশ্য কতগুলি অসুবিধের কথা স্বীকার করেছেন। যেমন এদের নিজস্ব গাড়ি নেই। ফলে অকুস্থলে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাদের মতে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছতে পারলে সুবিধে হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে। কেননা অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী প্রমোশন পেয়ে অন্য বিভাগে চলে যান। এ জন্য কর্মীর অপ্রতুলতা রয়েছে। যে সব বিভাগে মাত্র একটি করে কুকুর রয়েছে, সেখানে একাধিক কুকুর থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি রাজীব গান্ধী যখন কলকাতাতে এসেছিলেন তখন একটি মাত্র কুকুরকে সারা মাঠ চক্কর দিতে হয়েছিল। এছাড়া যখন একটি কেস করে কুকুরটি ফিরে আসে, তখন আবার কল পেয়ে তাকে আবার যেতে হয়। এতে তার ওপর চাপ বেশি পড়ে। কর্তৃপক্ষের মতে, বর্তমানে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ সহ দক্ষ হ্যান্ডারেরও প্রয়োজন। নইলে ডগ স্কোয়াডকে ঠিকভাবে চালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এবার রাজধানী দিল্লির ডগ স্কোয়াডের একটি চাঞ্চল্যকর অপারেশানের কাহিনী শোনা যাক। দিল্লির করোলবাগের ওয়েস্টার্ণ এক্সটেনশন এলাকার হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের উঠোনে একটি রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান মোতাবেক জানা যায় যে ওই মৃতদেহটি ওই স্কুলের অধ্যাপিকা ইলা সুদের। ইলার ঘাড়ে ধারালো কোন অস্ত্রের দাগ ছিল। এবং মাটিতে জমাট বাঁধা রক্ত দেখে অনুমান করা যায় যে এই খুনটি দশ বারো ঘন্টা আগে সংঘটিত হয়েছে।

স্কুলের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে ইলা ছিলেন সদা হাস্যময়, কারোর সঙ্গেই শত্রুতা ছিল না। এ হেন যুবতীটিকে কেন খুন করা হল!—এ বিষয়টি ধাঁধার মত রয়ে গেল পুলিশের কাছে। স্কুলের কর্মীরাও সঠিক কারণ বলতে পারল না।

ইলা যে বাড়িতে থাকতেন সেটি ভাড়া করা। বাবা-মা থাকতেন ভূপালে। ইন্সপেকটার মেহের সিং স্কুলের কর্মীদের কাছ থেকে এও জানতে পারলেন যে ইলার সঙ্গে কারো প্রেম ছিল না। মেহের সিং এর পাশাপাশি সার্কেল ইন্সপেকটর মার্কণ্ডেয়ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, স্কুলের দারোয়ান রোজই রাত নটায় বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে স্কুলে আসে। সেদিন যখন ডিউটি করতে এসেছিল তখন লাশটিকে দেখতে পায়। দারোয়ানের বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, রাত নটার আগেই ইলাকে খুন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও জানা গেল আগেরদিন ইলা সাড়ে পাঁচটার সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। রাতে কেন এবং কিভাবে আবার স্কুলে ফিরে এসেছিলেন তা রীতিমত রহস্য-জনক! ইলা স্কুলে না স্কুলের বাইরে খুন হয়েছেন তারও কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। তবে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল, খুনটি ওখানেই হয়েছে। মৃতদেহের পঞ্চাশ গজের মধ্যে নতুন একপাটি মেয়েদের চপ্পল পাওয়া গেল। তবে ওই চপ্পল ইলার নয়। নতুন এই একপাটি চপ্পল দেখে পুলিশ রীতিমত চিন্তায় পড়ে। নতুন চপ্পল কেউই তো ওভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না! তবে কি কোন মহিলা খুন করেছে ইলাকে? তবে তদন্তকারী অফিসার এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলেন যে খুনের ব্যাপারে কোন মহিলা জড়িত রয়েছেন। হয়তো তিনি ইলার বান্ধবীও হতে পারেন। স্কুল কমপাউণ্ডের বাইরেও আরেক পাটি চটি পাওয়া গেল। দুপাটি চটি পেয়ে তদন্তকারী অফিসাররা নিশ্চিত হলেন যে এই চটি জোড়ার মালিকই খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে জড়িত রয়েছে। হয় সে খুন করেছে, নচেৎ খুনের দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছে। খুনের সময় পালাতে গিয়েই চপ্পল জোড়া এভাবে সে ফেলে রেখে যায়। এই চপ্পল জোড়া স্কুলের স্টাফদের দেখানো হলেও

কেউ চিনতে পারল না। এবং স্কুল সূত্রে জানা গেল, ইলার তেমন কোনও অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিল না।

এবার এই রহস্যময় খুনের কিনারা করার জন্য দিল্লির ডগ স্কোয়াডের শরণাপন্ন হলেন দিল্লি পুলিশ। ডগ স্কোয়াডের দুটি গোয়েন্দা কুকুর পামী আর লীডার। পামী হল মাদী কুকুর। আর লীডার ছিল পুরুষ কুকুর। লীডারের সহায়তায় পুলিশ আবগারী বিভাগের কেস অনুসন্ধান করে থাকে।

অকুস্থলে পৌঁছে পামী মাটি শুঁকতে শুঁকতে কম্পাউণ্ডের বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর দু তিনটে গলি পেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। একটু পরেই বাড়ির দরজা ঠেলতে থাকে। দরজা খুলেই পামী ভেতরে ঢুকে পড়ে। পেছনে পেছনে পুলিশের দল। দু তিনটে ঘর পেরিয়ে কুকুরটি একটা দরজার সামনে এসে চিৎকার করতে থাকে। দরজা খুলতেই সে ছুটে যায় বিছানার ওপর। দাঁতে করে বিছানাপত্র টেনে নামায়। পুলিশের লোকজনেরা উৎগ্রীব হয়ে দেখলেন, বিছানার তলা থেকে কিছু কাগজপত্র টেনে বার করছে।

দেখা গেল এই কাগজগুলি আসলে প্রেমপত্র। জনৈক বিকাশকে চিঠিগুলি লেখা হয়েছে। সেই চিঠিতে ইলার নামও লেখা রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। পত্র লেখিকার নাম কৃষ্ণা সচদেব। বাড়ির মালিকের কাছ থেকে জানা গেল, তাঁর মেয়ে কৃষ্ণা রাতের ট্রেনে জলন্ধরে চলে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, বিকাশ নামের যুবকটি কৃষ্ণা ও ইলার সঙ্গে একইসঙ্গে প্রেম করত। পামী তখনও পাগলের মত কি যেন খুঁজে চলেছে। তন্নতন্ন খোঁজাখুঁজির পর খাটের তলা থেকে রক্ত মাখা কাপড় মুখে করে নিয়ে এল। বোঝাগেল, খুনটা সংঘটিত হয়েছে এখানেই। পামীর কাজ-শেষ হতেই পুলিশের অনুসন্ধান শুরু হল। এরপরই কৃষ্ণাকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি নিয়ে আসা হল। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কৃষ্ণা স্বীকার করল যে ইলাকে সে-ই খুন করেছে। কৃষ্ণা জানাল, সে এবং ইলা একইসঙ্গে বিকাশকে ভালবাসত। এবং দুজনেই তাকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বিকাশ তাদের দুজনকে একইসঙ্গে একই রকম প্রেমপত্র লিখত। প্রথমদিকে কৃষ্ণা এ খবর জানত না। পরে এসব জানতে পেরে কৃষ্ণা বিকাশকে চেপে ধরে। চাপের মুখে পড়ে বিকাশ জানায় যে ইলার সঙ্গে তার বহুদিনের প্রেম। চট করে তাকে কাটানো যাবে না। এই সম্পর্ক শেষ করতে গেলে সময় লাগবে। বিকাশ তাকে এও জানায় যে সে তাকেই বিয়ে করবে। এ কথায় কৃষ্ণা শান্ত হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বিকাশ ইলার সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণা ভাবল ইলাই তার এবং বিকাশের প্রেমের পথে কাঁটা। তাই সে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ফন্দী আঁটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথাতে ইলাকে রাতের অন্ধকারে খুন করা হয়। এই চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনাটি দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াডের এই অভিযানের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আদালতে এই খুনের মামলাটি উঠলে কৃষ্ণার পক্ষের আইনজীবী প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে কুকুরের অনুসন্ধান আদালতে যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। তাঁর আরো বক্তব্য ছিল যে, ওই কুকুরটিকে জড়িয়ে পুলিশ একটি মন গড়া কাহিনী বানিয়েছে। যদি পুলিশ ওই কুকুর গোয়েন্দার সাক্ষ্যকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চান, তাহলে আদালতে তাকে পেশ করা হোক। এবং এখানে কুকুর গোয়েন্দা তার যোগ্যতার প্রমাণ দিক। আইনজীবীর প্রার্থনা শুনে বিচারক আদেশ দেন কুকুরটিকে আদালতে নিয়ে আসতে। হাবিলদার বেনারসী দাস আদালতে কুকুরটিকে নিয়ে এলেন। যে সব ব্যক্তি আদালতে হাজির ছিলেন, তাদের প্রত্যেককেই বলা হল তাদের জুতো জোড়া ছেড়ে রাখতে। এবার জুতো

গোয়েন্দা কুকুরদের থাকার ঘর

গুলো এক কোণে রেখে বেনারসী দাস কুকুরটিকে নির্দেশ দিলেন আইনজীবীর জুতো জোড়া খুঁজে বার করতে। অসংখ্য জুতোর ভিড় থেকে কুকুরটি ঠিক জুতো জোড়া বের করল। হাতেনাতে এ রকম প্রমাণ পেয়ে আদালত সন্তুষ্ট হল। পামীর সাক্ষ্য মোতাবেক কৃষ্ণা সচদেবের শাস্তি হয়ে গেল।

এইরকমভাবে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেসের ফয়শালা করেছে এই দিল্লি ডগ স্কোয়াডের কুকুরেরা। দিল্লির এই ডগ স্কোয়াডটি ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয়। এই ডগ স্কোয়াডটি চালু করেন পুলিশ অধীক্ষক সুরেন্দ্র নাথ। এর আগে ১৯৬০ সালে হাবিলদার বেনারসী দাস ও রণজিৎ সিংকে ডগ স্কোয়াডের বিশেষ ট্রেনিং-এ দু'বছরের জন্য হিমাচল প্রদেশের পুলিশ সেন্টারে পাঠানো হয়। তারা ফিরে এলে ৭ জুলাই, ১৯৬২ সালে মন্দির মার্গ থানায় ডগ স্কোয়াডের সেল খোলা হয়। ওই বছর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে দুটি অ্যাল-সেশিয়ান-এর বাচ্চা উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি মেয়ে কুকুরটির নাম রেখেছিলেন রেণু। পুরুষ কুকুরটির নামকরণ করেছিলেন মধু। নেহরুজী ওই দুটি কুকুর দিল্লি ডগ স্কোয়াডকে দিয়ে দেন। এরপর ১৯৬৮ সালে ১৮টি নতুন গোয়েন্দা কুকুর আনা হয়। এদের কিছু আনা হয়েছিল হিমাচল প্রদেশ থেকে। বাকিদের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডগ ট্রেনিং স্কুল টেকনপুর ও গোয়ালিয়র থেকে। বর্তমানে মন্দির মার্গ থানার পাশাপাশি কিংস ওয়ে ক্যাম্পের থানাতেও ডগ স্কোয়াড সেল খোলা হয়েছে। এই দুই সেলে রয়েছে একজন সাব ইন্সপেকটর, ৩ জন সহকারী ইন্সপেকটর, ৭ জন হাবিলদার ও ১৭ জন সিপাহী। বেনারসী দাস প্রমোশন পেয়ে সাব ইন্সপেকটর পদে উন্নীত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি ওই দুটি সেলের ইনচার্জ। শুরুর সময় ডগ স্কোয়াডে তিনটি বিদেশি প্রজাতির অ্যালসেশিয়ান, ডোভার পেন্সর, লেব্রাডর এর ১৮টি কুকুর ছিল। লেব্রাডর প্রজাতির একটি কুকুর রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই স্কোয়াডটি দিল্লির ক্রাইম ব্রাঞ্চের অধীন। বর্তমানে এই ব্রাঞ্চের ইনচার্জ হলেন আমোদ কণ্ঠ। প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অপরাধ বিভাগের প্রধান প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট এরিয়া প্রধানকে চিঠি লিখে ওইসব এলাকার অপরাধ সংক্রান্ত বিবরণ জানতে চান। তাঁরা লিখিতভাবে বিবরণ জানান। এরপর অপরাধ শাখা ডগ স্কোয়াডকে নির্দেশ দেন, রাতের বেলাতে তাঁরা যেন অপরাধ প্রবন-এলাকাতে গোয়েন্দা কুকুর নিয়ে হানা দেয়। বলাবাহুল্য, এ ধরনের আদেশ ডগ স্কোয়াড অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। রাতের অন্ধকারে গোয়েন্দা কুকুররা গন্ধ শুঁকে অপরাধীর খোঁজে বেরোয়। এই কুকুরগুলি ৩০০ মিটার দূরের গন্ধ নিতে পারে। অপরাধীদের কোন খোঁজ পেলেই ওরা হ্যাণ্ডারকে ইশারা করে থাকে। রাতের অন্ধকারে যখন অপরাধী পুলিশের মুখোমুখি হয় তখন কিন্তু পুলিশ খুব দরকার না হলে গুলি চালায় না। অপরাধীদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। কুকুররা পিছু ধাওয়া করে অপরাধীর ডান হাত কামড়ে নেয়। অপরাধীদের ডান হাতে অস্ত্র থাকে।

কুকুররা শুধুমাত্র যে তীব্র ঘ্রাণশক্তি সম্পন্নই হয় তা নয় সাধারণভাবে এই মনুষ্যেতর জীবগুলি একদিকে যেমন প্রভুভক্তির জন্য ক্ষেত্র বিশেষ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তোলে, তেমনই গোয়েন্দাগিরির কাজে তাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ঘ্রাণের মাধ্যমে এইসব কুকুরেরা বহু জটিল রহস্যের সমাধান করেছে। এই মনুষ্যেতর জীব-গুলির আনুগত্য প্রভুনিষ্ঠার সাথে সাথে অপরাধী ধরার ব্যাপারে এরা নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা কুকুরের প্রভুভক্তির অনেক কাহিনী শুনেছি। তাদের গোয়েন্দাগিরির কাহিনীও কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়।

আবদুল কাইউম
দিল্লি পুলিশের তথ্য পুস্তক থেকে

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

৫০ এর দশকে ভারতীয় টেবিল টেনিসে বাংলার দখলীকৃত স্বর্ণযুগ পেরিয়ে এসে বাংলার টেনিস খেলোয়াড়রা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল পরের দশকগুলিতে। কেন এই অবক্ষয়? বিশ্ব টেবিল টেনিসের প্রেক্ষাপটে বাংলার ভবিতব্য নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন প্রখ্যাত টেবিলটেনিস কোচ সুনীল দত্ত।
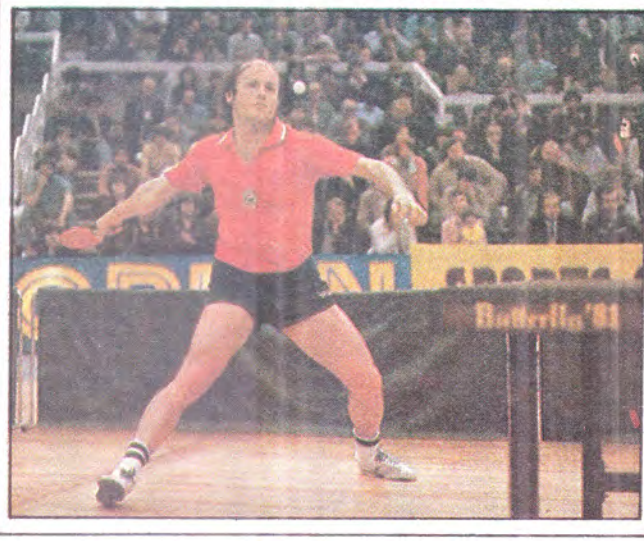
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরির ইস্তভান জুনিয়র অবিশ্বাস্য টপস্পিনে খেলেন

বাংলায় টেবিল টেনিসের ভবিতব্য

বিশ্বমানের চীনা খেলোয়াড় জিয়াং জিয়াংলিং

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। উদ্যোক্তা ভারত। ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস উপলক্ষেই গড়ে উঠেছিল কলকাতায় পূর্ণাঙ্গ আধুনিক নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতাই বাংলা টেবিল টেনিস রসিকদের চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দেয় আধুনিক টেবিল টেনিস–এর রূপ, রস, শৌর্য এবং বৈজ্ঞানিক চর্চার দিকটি।

টেবিল টেনিস, যে খেলার একদা নাকি নাম ছিল 'জেন্টেল ট্যাপিং অ্যাট দ্য ডিনার টেবিল' বা 'পিং পং' তা যে আধুনিককালে স্পিড, স্পিন, পাওয়ার, টেকনিক, স্কিল এবং চূড়ান্ত শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার খেলা হয়ে উঠেছে, চলেছে নিরন্তর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা নিত্য নতুন প্রথা

৯১পৃষ্ঠায় দেখুন

বম্বে স্টারদের প্রেম : বৈধতার সীমা পেরিয়ে

জয়াপ্রদা, প্রেমের সরসী তীরে বারবার !

রেখা, এখনও মনের মানুষ খুঁজে পাননি !

স্টারডমের এক নম্বর বক্স দখলের দৌড়ে জয়লাভ করতে গিয়ে কলা ও কৌশলের অস্ত্র প্রয়োগগুলির মধ্যে প্রেম কিভাবে বৈধতার সীমানা পেরিয়ে গ্ল্যামার কুইনের স্বর্ণশিরোপা ছিনিয়ে আনে তারই নেপথ্যকথা।

বম্বে স্টারডমের হাওয়াটাই অদ্ভুত। বিশেষ করে এখানকার বক্স নায়িকা-দের চলন বলন, কাজকর্ম রূপালি পর্দার গ্ল্যামারের সাথে অন্য এক গ্ল্যারের জন্ম দেয়। আর তাই নিয়ে ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশের রিক্সাওলাটিরও আগ্রহের সীমা পরিসীমা থাকে না। নব্বুই পয়সা দামের টিকিটে নাইটশো দেখতে গিয়ে তারা নায়িকাদের প্রেমের দৃশ্য আর অন্তরঙ্গ শয্যাদৃশ্য দেখে মুখে আঙ্গুল দিয়ে সিটি দেয়, নিজে-দেরকে উত্তেজিত বোধ করে। এদের উপভোগ ও আনন্দের মুহূর্তগুলির সংবাদ কী বক্স নায়িকা-দের কাছে সংবাদ হয়ে পৌঁছয়? পৌঁছোক আর নাই পৌঁছোক, অনেক বক্স নায়িকা কিন্তু কাহিনীর চাইতেও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে পড়েন তাদের ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব মহলে অবাধ মেলামেশার বিষয়ে। আর এই সংবাদ হয়ে ওঠার কেন্দ্রবিন্দুতে

থাকেন সেইসব বিবাহিত নায়িকা যাঁরা স্বামী ছাড়াও ফিল্ম মহল্লার অন্য নায়কদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেন এবং যারা অবিবাহিতা হয়েও বিবাহিত নায়কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বম্বে স্টারডম এইসব গ্ল্যামার কুইনদের বৈধতার সীমানা পেরিয়ে যাওয়া প্রেম ঘটনা নিয়ে নিজে যেমন সরগরম হয়ে ওঠে, তেমনি এইসব সংবাদ চটকদার ফিল্মি পত্রপত্রিকাগুলি ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়। স্টারডমের রূপালি গ্ল্যামারের এইসব কাহিনী ছায়াছবির দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে।

বম্বে বক্সের নায়িকাদের মধ্যে এক নম্বর কি না সে বিতর্কে না গেলেও গ্ল্যামার গার্ল শ্রীদেবী একটি জনপ্রিয় নাম। শুধু তাই নয়, বম্বের ছবিতে

শ্রীদেবী, বক্সের সফলতমা প্রেমের সারিতেও প্রথমতমা

ছবি: জগমোহন

ডিম্পল কাপাড়িয়া—রাজেশের পর অন্য চারণভূমির সন্ধানে?

স্মিতা পাতিল: স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রাজ বব্বরকে বিয়ে করেছিলেন

কাজের হিসেবেও শ্রীদেবী অনেক এগিয়ে। এক-কথায় শ্রীদেবী বম্বের সফল নায়িকা। আর এ জন্যেই তার চারিদিকে পুরুষ ভ্রমরের আনাগোনার শেষ নেই। মাঝে জোর গুঞ্জন উঠেছিল সুপারস্টার মিঠুনের সঙ্গে শ্রীদেবীর অন্তরঙ্গতা শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিবাহিত হলেও মিঠুনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে মিস শ্রীদেবী নাকি অসম্মত ছিলেন না।

মিঠুন ও শ্রীদেবীর সম্পর্ক যে পর্যন্তই গড়াক না কেন, জনসাধারণের চোখে তা খুবই সুখদায়ী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য মিঠুন–শ্রীদেবীর সম্পর্ক আর ততখানি জোরদার নেই। সুপারস্টার মিঠুনের চাইতে এখন ছবি যাদের হাতে বেশি সেই সব নবাগত নায়কদের প্রশস্তিই বেশি শোনা যাচ্ছে শ্রীদেবীর মুখ থেকে। বম্বের চিত্র পরিচালক-দের কাউকে কাউকে শ্রীদেবী তো নবাগত নায়ক নিয়ে ছবি করার পরামর্শও দিচ্ছেন। তাদের কারো কারো সঙ্গে আবার পার্টিতেও দেখা যাচ্ছে শ্রীদেবীকে। তার ছবির নায়কদের সঙ্গে তার যথেচ্ছ মেলামেশা এখন জনসাধারণের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

রাখী, এখনও আকুলতায় 'কোথায় পাব তারে'!

ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে অমৃতা সিংহের সম্পর্ক নিয়ে বাজারে যেসব মুখরোচক সংবাদ ছিল তার সত্যতায় কারো কারো সন্দেহের অবকাশ থাকলেও বম্বে ফিল্ম মহল্লার কারো এ বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় ছিল না। প্রেমের প্রতিশ্রুতিতে অমৃতার সঙ্গে রবি শাস্ত্রীর গাঁটছড়া পড়ার সম্ভাবনা যেখানে শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশি তৈরি হয়ে গেছিল, সেখানে হঠাৎই পড়ল ছেদ। রজনীশ আশ্রমে ফিরে হ্যালির ধূমকেতুর মত বম্বে স্টারডমে বিনোদ খান্না যখন উড়ে এলেন তখন রবিকে ছেড়ে অমৃতা গেলেন বিনোদের কাছে। সুপারস্টার অমিতাভের একসময়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিনোদকে প্রেমিক ধরলে যদি ছবির কাজ বেশি হাতে আসে এই ভেবে কিনা তা অমৃতাই অবশ্য ভাল জানেন। তবে যুবতী নায়িকার প্রেমের হাওয়া বম্বে স্টারডমে কাকে যে কখন ওড়ায় কেউ জানে না। তাদের প্রেমের সম্পর্কগুলির সংবাদচিত্রটি সাধারণের মনে স্থায়ী হয়ে যায়। তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়। রুপোলি মহল্লার কুশলীদের প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈধতার

মিঠুন চক্রবর্তী: বাংলার রোমিও বোম্বাইয়ে

ছবি: বালকৃষ্ণ

সূত্র মেনে হাঁটে না ।

বম্বে স্টারডমে প্রেমের বৈধতার প্রশ্নে সবচাইতে বিতর্কিতা অভিনেত্রী হলেন কফিসুন্দরী রেখা । মিস রেখা গণেশনের প্রেম উপাখ্যান সবার কাছেই চাঞ্চল্যকর । অমিতাভ–রেখার প্রেমপর্ব আজ আর কারও অজানা নেই । রেখা তো অমিতাভ পত্নী জয়ার সতীন হতেও রাজি বলে সাক্ষাৎকার দিয়ে দিলেন । জোর গুঞ্জন অমিতাভের সঙ্গে হোটেলে হোটেলে দু'জনের রাত্রিবাসের হিসেব অন্য যাদেরই অজানা থাক, বম্বে স্টারডমের সকলের কাছেই তা নাকি ঠোঁটস্থ । আর ভায়া-মিডিয়া এই প্রেম উপাখ্যানের সংবাদ চলচ্চিত্র-প্রেমীদের কারোই অজানা নয় । কিন্তু এর পরেও একটি সংবাদ আছে । সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি জয়া বচ্চন আর রেখা নাকি একটি বৈঠকে বসেছিলেন । বিষয় ছিলেন অমিতাভ । অমিতাভের দিকে রেখা যাতে অধিকারের জালটি আর বিস্তার না করেন । রেখার কাছে অমিতাভকে প্রকারান্তরে ভিক্ষে করে নিয়েছেন জয়া । রেখা অবশ্য জয়ার কথার উত্তরে কি জবাব দিয়েছেন তা জানা যায় নি । তবে রেখা-

প্রেমের নায়ক হিসেবে রাজেশ যত ছবিতে অভিনয় করেছেন, অন্য কোন ভূমিকায় তত করেন নি। আজও রাজেশকে প্রেমিক নায়ক হিসেবে দর্শকরা বেশি চেনেন।

অমিতাভ সম্পর্ক বিষয়ে জয়া বিন্দুমাত্র অজ্ঞ নন । রেখা তো সর্বসমক্ষে একথা বলেই দিয়েছেন, আমি সন্তানের জননী হতে চাই । সেই সন্তানের জননী হতেই কি রেখা সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন অমিতাভ, কামাল হাসান, সঞ্জয় দত্ত প্রমুখের সঙ্গে ?

বিতর্কিতা রেখা গণেশনের পরে আছে এক বাঙালি নায়িকার নাম। তিনি রাখী। রাখী আর অজয় বিশ্বাস দু'জনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি । সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর রাখীকে নিয়ে গুঞ্জনের শেষ ছিল না । একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার জন্য রাখীকে নাকি অনেক অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে, অনেকের সঙ্গে অনেক সম্পর্ক তৈরি করতে হয়েছে। বিবাহিত কি অবিবাহিত তখন নাকি কোনই বাছবিচার ছিল না । অবশ্য গুলজারের সঙ্গে বিয়ের পর নাকি তেমনটি আর শোনা যায় না । নিন্দুকেরা অবশ্য বলে, 'পরমা' ছবিতে রাখীকে এনে একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছিলেন পরিচালিকা । স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার ঘটনাটি তাই পরমা ছবিতে এত নিখুঁতভাবে ফুটিয়েছেন রাখী ।

বম্বে স্টারডমে যে নায়কটির ইমেজই হল প্রেমের নায়ক হিসেবে তিনি আর অন্য কেউ নন রাজেশ খান্না । প্রেমের নায়ক হিসেবে রাজেশ যত ছবিতে অভিনয় করেছেন, অন্য কোন ভূমিকায় তত করেন নি । আজও রাজেশকে প্রেমিক নায়ক হিসেবে দর্শকরা বেশি চেনেন । কিন্তু ছায়াছবির বাইরেও রাজেশের সুন্দরী অভিনেত্রীদের সঙ্গ দেবার

ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী

অমিতাভ : এখনও কি মধুকরবৃত্তিতে !

বিষয়ে নানা ঘটনা প্রচলিত । ডিম্পল আর রাজেশের ভাঙা বিয়ে জোড়া লাগার সংবাদটি মাঝে খুবই চাউর হয়েছিল । সম্প্রতি রাজেশ ডিম্পলের সঙ্গে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করায় ফিল্ম মহল্লার অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে নিজেদের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছেন রাজেশ । এদিকে আবার রাজেশ আর টিনার মেলামেশা এমনি স্তরে গড়িয়েছিল এই ক'মাস আগে–লোকে ভাবল টিনা রাজেশকেই বিয়ে করে নেবে । প্রথমদিকে টিনা রাজেশের সঙ্গে অভিনয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে একদিন রাজেশ টিনাকে সত্যি সত্যিই

দীপিকা : রামায়ণের সীতাও প্রেম করছেন !

ছবি : জগমোহন
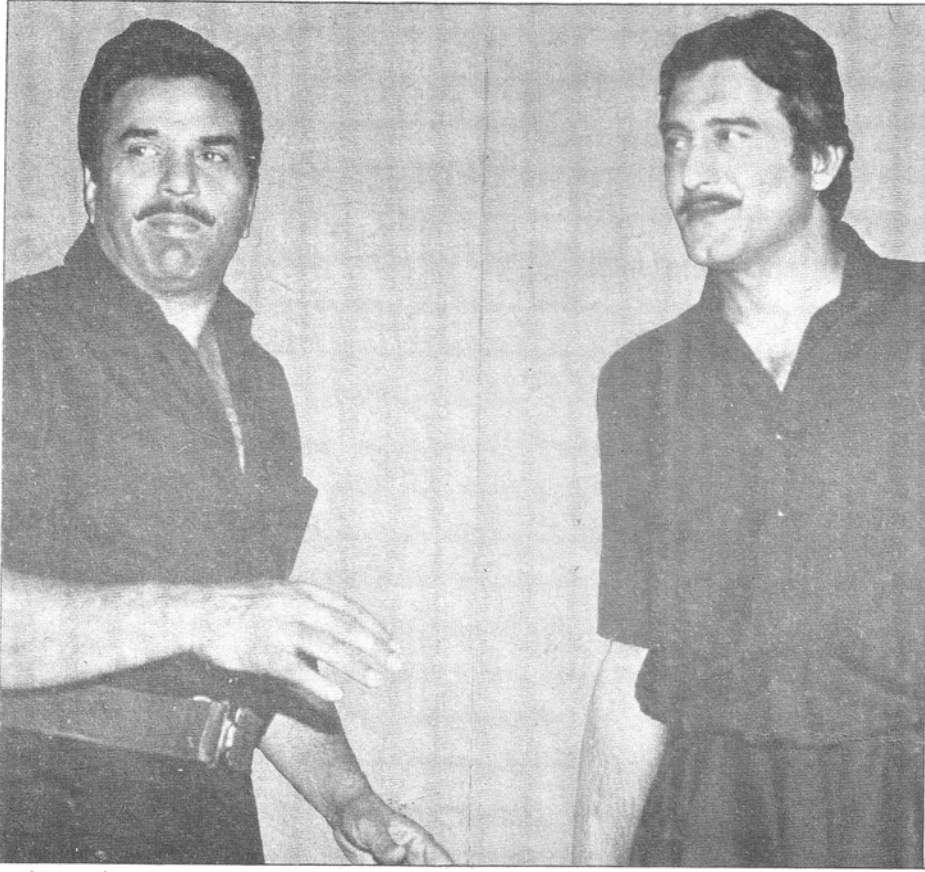
ধর্মেন্দ্র আর বিনোদ খান্না, নায়িকাদের কাছে পুরুষালি ইমেজ।

অভিনয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন নিজের বিপরীতে। রাজেশের উপর টিনার সেই কৃতজ্ঞতা-বোধই হয়ে দাঁড়ায় প্রেম নিবেদনের মূল কারণ। খুব তাড়াতাড়িই পর্যায় পরিবর্তন করতে করতে প্রেম এমনি একটি স্তরে এসে দাঁড়াল যা নাকি বিবাহোত্তর সম্পর্কের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। তবু এক্ষেত্রেও অঙ্কে দুয়ে দুয়ে চার হল না।

দক্ষিণী অভিনেত্রী জয়াপ্রদাকে ঘিরেও সংবাদ কম নয়। এমনিতেই জয়াপ্রদার সঙ্গে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হয়েছিল একজন গ্ল্যামার মহল্লার বাইরের মানুষের সঙ্গে। কিন্তু সম্পর্ক টেকেনি। বিরোধ সপ্তমে উঠলে, কেস গড়ায় আদালত পর্যন্ত। গুঞ্জন, বিয়ে না টেকার একটি মূল কারণ নাকি জয়ার উপর তার স্বামীর সাগর-প্রমাণ অবিশ্বাস। ফিল্ম মহল্লায় নিজের গ্ল্যামার বজায় রাখতে নাকি জয়া এতই তৎপর যে সংশ্লিষ্ট অনেকের কাছেই নিজস্ব রূপের রহস্যটি অনাবৃত করতে তাঁর আপত্তি নেই। বিবাহিত অবিবাহিত পছন্দ-অপছন্দের বাছবিচার না করেই শুধুমাত্র কেরিয়ার এবং কাজের জন্য এই বৈধতা ছাড়া প্রেম নাকি দুঃসহ ছিল জয়াপ্রদার স্বামীর কাছে। কিন্তু জয়াপ্রদারও প্রেম করা ছাড়া নাকি উপায় ছিল না

জয়াপ্রদাতেই শেষ নয়, হেমামালিনীকে ঘিরেও উঠেছে জোর গুঞ্জন। ধর্মেন্দ্র-হেমামালিনীর বৈবাহিক সম্পর্কও মাঝে মধ্যেই বিষিয়ে উঠছে ত্রিকোণ প্রেমের আবর্তে। যেমন হয়েছে শত্রুঘ্ন সিনহার ক্ষেত্রে। বিবাহিত শত্রুঘ্ন চুটিয়ে প্রেম করেছেন অভিনেত্রী রীণা রায়ের সঙ্গে। এও খবরে প্রকাশ অভিনেত্রী রীণা রায়ের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রিকেটারের বিয়ে হয়ে যাবার পরও শত্রুঘ্ন পাকিস্তান উড়ে গেছেন বেশ কয়েকবার। নিন্দুকেরা বলেন, পুরোনো প্রেম চাগিয়ে উঠলেই শত্রুঘ্নকে পাকিস্তানে ছুটতে হয়। বস্তুত একথা যদি সত্যি হয় তাহলে রীণা-শত্রুঘ্ন সম্পর্কটি কতখানি বৈধতার সীমা পেরিয়ে গেছিল-তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্রিয়েটিভ ফিল্মের নায়ক নায়িকাদের অবস্থাও নাকি প্রেমের বৃত্তে একেবারে অসহায়। প্রয়াতা অভিনেত্রী স্মিতার জীবনের পুরুষরা ছিলেন বিক্রম ভোরা, ডঃ সুনীল ভুটানি, বিনোদ খান্না, শেষে রাজ বব্বর। স্মিতা-রাজের বিয়েও হয়েছিল রাজের স্ত্রী নাদিরা ও পুত্র কন্যা বর্তমানে। স্মিতার সঙ্গে রাজের সবরকম সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল বিয়ের আগে থেকেই। সুঅভিনেত্রী শাবানাও বাদ যান না গুঞ্জনের ব্যাপকত্ব থেকে। শাবানার প্রেম বিষয়ে স্টারডাস্ট বিশদ ছেপে দেবার পর শাবানা ও শাবানার স্বামী জাভেদ আদালত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। শাবানা যতই আদালত অব্দি যান না কেন, রটনা কি সবটা মিথ্যে ?

পদ্মিনী কোলাপুরী, রতি অগ্নিহোত্রীর নামও কিন্তু নিন্দুকের ডায়রি বহির্ভূত নয়। যেমন ছিল না আগেকার দিনের অভিনেত্রী মীনাকুমারী কিংবা মধুবালার। বাংলা থেকে 'কভি আজনবী থে' ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে দেবশ্রী তো রীতিমত জড়িয়ে পড়েছিলেন ছবির নায়ক ক্রিকেটার সন্দীপ পাটিলের সঙ্গে। গুঞ্জন বাংলার জামাই ভাগ্য আবারও সুপ্রসন্ন হবার যোগাড় হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। বম্বের এক কালের বক্স অভিনেত্রী বাংলার শর্মিলা ঠাকুরের স্ট্রাটেজি নিয়ে বম্বে গিয়েছিলেন সুচিত্রা তনয়া মুনমুন। রটনা মুনমুন আর ফারুক শেখের মধ্যেই নাকি দারুণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

মন্দাকিনীর সঙ্গে ঋষিকাপুর, জীনতের সঙ্গে শশী কাপুরের, কিমি কাটকারের সঙ্গে গোবিন্দ, জ্যাকি শ্রফ, অনিলকাপুরের নাকি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এমন যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈধতার রেখা পেরিয়ে গেছিল। এদিকে আবার কিছুটা 'বিস্ফোরক' ইমেজ আনার জন্য নবাগতা নায়িকা সোনম, ফারহা, সোনু ওয়ালিয়া, ভানুপ্রিয়ারা জড়িয়ে পড়েছেন বিতর্কিত সব প্রেমের বন্ধনে। গুজব রামায়ণের সীতা দীপিকা নাকি দেদার প্রেম করে-ছেন ভরতের সঙ্গে। মাঝে লক্ষণের সঙ্গে নাকি গভীর সম্পর্কও গড়ে উঠছিল। কিন্তু পাকাপাকি সম্পর্কে লক্ষ্মণ রাজি হননি কারণ ঘরে তাঁর স্ত্রী রয়েছেন।

বম্বে স্টারডমের কালচারই হল চটজলদি চটক-দার গ্ল্যামার আনা। আর বম্বের নায়িকারা নিজেদেরকে হাইলাইটে নিয়ে আসতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিতর্কিত ইমেজ গড়তে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। যারা কয়েক বছর দাপটে অভিনয় করার পর গ্ল্যামারের নিক্তিতে সামান্য হালকা হয়ে ওঠেন সেইসব নায়িকারা তো বটেই, নবাগতারা পর্যন্ত শরীর চেতনাকে সংস্কার বলে মনে করেন না। বরং কিছুটা দুঃসাহসিকভাবে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভেবে নেন একে। স্টারডমে এই নিয়ে চাঞ্চল্য ওঠে, যা নাকি পক্ষান্তরে নায়িকাদের জনপ্রিয়তাকেই বাড়িয়ে দেয়। প্রেমের পঙ্খীরাজে চেপে এইসব নায়িকাদের কাছে উঠে আসতে দেখা যায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন নায়ককে। যে মুহূর্তে যে নায়কের কদর বেশি, তাকে নিয়েও পড়ে নায়িকাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। বিবাহোত্তর কি বিবাহপূর্ব প্রেম, শরীর-ব্যবহার ইত্যাদির প্রশ্ন পিছনে ফেলে নায়িকাদের একমাত্র লক্ষ্যই যেন নিজেদের পয়লা নম্বরে নিয়ে আসা, ও স্টারডমে নিজেদের আসনটি পাকা করে নেওয়া। সনাতন ভারতীয় সংস্কার বোধের দিকটা তাই আড়ালেই থাকে।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

৮৫ পৃষ্ঠার পর

প্রকরণ আবিষ্কারের জন্য তা ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস বুঝিয়ে দেয় বাংলার টেবিল টেনিস-প্রেমীদের।

বিশ্বের সেরা সেরা খেলোয়াড়রা তাঁদের ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষর রেখে যান সাজান আঙিনার বুকে ওই ক'দিনে। টেবিল টেনিস, বিশেষত বাংলার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ক্রীড়াযজ্ঞের কথা ও নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম গড়ে ওঠার কথা।

কলকাতায় ৩৩তম বিশ্ব আসর বসান যায় কিনা দেখতে ১৪ মার্চ ১৯৭৪ আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস সংস্থার সভাপতি মিঃ রয় ইভান্স এলেন কলকাতায়। দেখলেন বিভিন্ন স্টেডিয়ামের নকশা (ব্লু-প্রিন্ট) এবং বিকেলে সাড়ে তিনটা নাগাদ মহাকরণে দেখা করলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়–এর সঙ্গে।

মিঃ ইভান্স–এর সঙ্গে অল্প আলোচনাতেই রাজি হন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিশ্রুতি দেন স্টেডিয়াম তৈরি করে দেবেন। হাসিমুখে বলেন, 'আপনি কনে পছন্দ করে দিন আমরা তাকে সাজিয়ে দেব।' ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট, কলকাতা যদি বিশ্ব টেবিল টেনিস–এর দায়িত্ব পায় তবে সু-সংগঠিত ও সু-আয়োজিত হবার সব বন্দোবস্তই হবে।

১৬ মার্চ ১৯৭৪ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হলো টি·টি·এফ·আই–এর কাউন্সিল মিটিং এবং মিঃ রয় ইভান্স জানান কলকাতা পেয়েছে ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস।

২৬ মার্চ মন্ত্রীসভার বৈঠকে দশ লাখ টাকা (প্রাথমিক) মঞ্জুর হয়। ৩ এপ্রিল পূর্ত-দপ্তরের সার্ভে হয়। ৮ এপ্রিল মহাকরণে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে এবং সিদ্ধান্ত হয় পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম তৈরির এবং স্থায়ী। ২২ এপ্রিল হয় নক্শা অনুমোদন।

৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ রয় ইভান্স এলেন স্টেডিয়াম পরিদর্শনে। বিকেলে উদ্বোধন হলো ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, খেললেন রয় ইভান্স ও সিদ্ধার্থ শংকর রায়।

মাত্র সাত সপ্তাহে তৈরি হয় এই অনুশীলন কেন্দ্র, আয়তন ৩৭ × ২৮ মিটার।

সুইডেন–এর স্টিগা কোম্পানি পাঠায় ৩০ খানি স্টিগা টেবিল ও রোবট প্র্যাকটিস মেশিন। জাপান–এর নিটাকু কোম্পানি দেয় ৭২০ ডজন নিটাকু বল বিনামূল্যে। ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৫। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় উদ্বোধন হল নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের। উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫। ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিসের ম্যাচগুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কলকাতার দর্শকরা পেলেন আধুনিক বিশ্বমানের টেবিল টেনিস–এর প্রকৃত রূপের আস্বাদ।

টেবিল টেনিসে আধুনিকতম অস্ত্র হলো এই কম্বিনেশন ব্যাট ও তার প্রয়োগকারী অর্থাৎ 'টুইডলার'রা। ১৯৭৫এ যার শুরু, তারপর বিশ্ব টেবিল টেনিসে ঝড় তুললো এই 'কম্বিনেশন টুইডলিং'। চীন একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়ে তুলল, কি মেয়ে কি পুরুষ বিভাগে–এই বিশেষ খেলোয়াড়-দের দিয়ে। মজার ব্যাপার হলো সবাই কিন্তু খেলতে পারবে না এই খেলা। মানসিক ভাবে যাঁরা প্রচণ্ড উপস্থিত বুদ্ধি রাখেন, হাতের তালুর গঠন বিশেষ রকম (জন্মসূত্রে) তাঁরাই হবেন 'টুইডলার'। চীন গবেষণা করে তুলে এনেছে এমনি বহু খেলোয়াড়। লু ইয়াং, শেং–এর পরে এসেছেন ইয়ে হুয়া, কাই জেন হুয়া, হুয়াং লিয়াং, শি জিহাও প্রমুখরা।

৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস শেষ হয়ে যাবার পর বাংলা টেবিল টেনিসে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় টেবিল টেনিস ঘিরে। বহু ছেলেমেয়ে
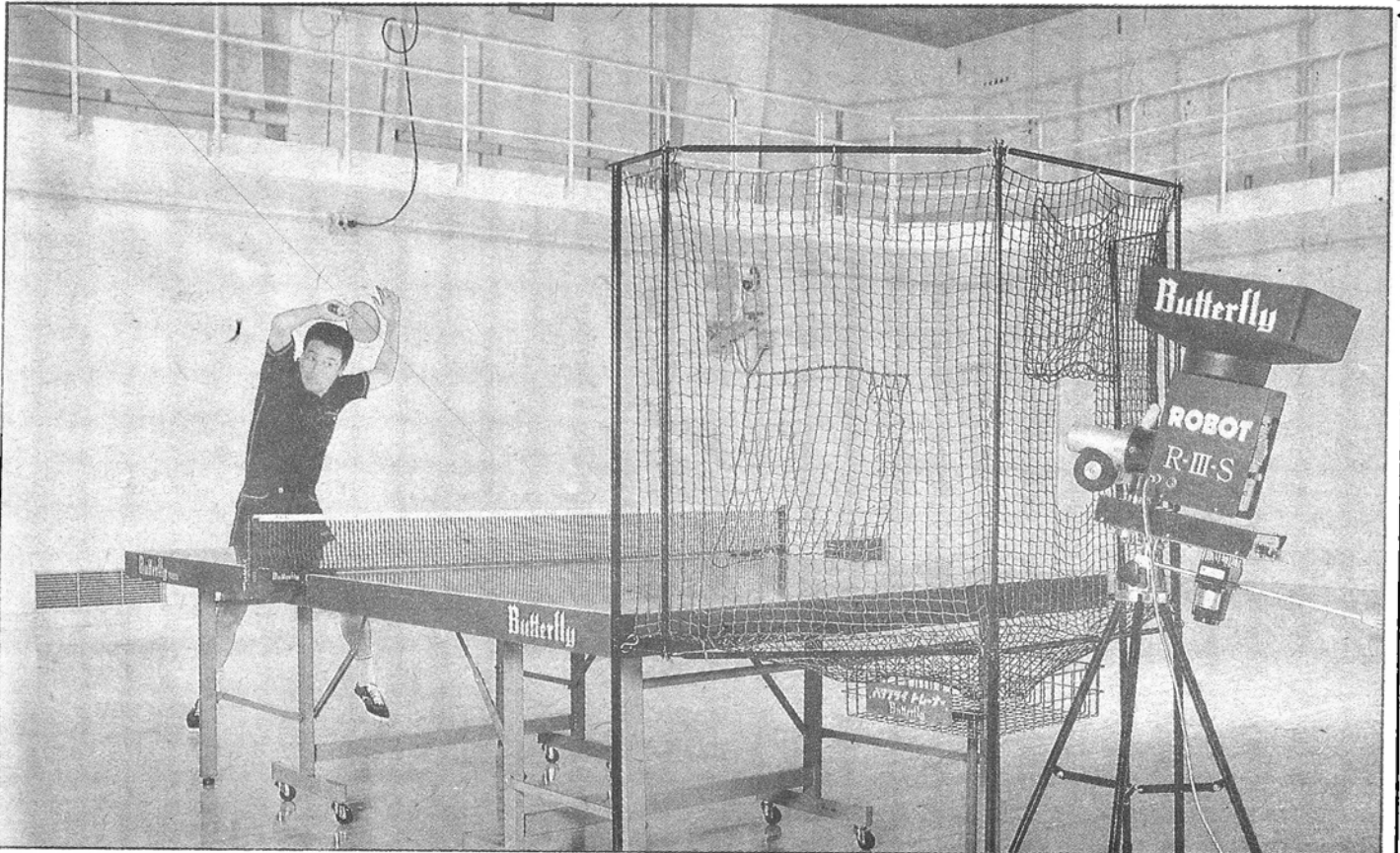
রোবটের সঙ্গে খেলা

এগিয়ে আসে এই খেলাটি খেলতে।

বাংলা টেবিল টেনিসে প্রথম রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৩৪ সালে।

কেটে গেছে তারপর চুয়ান্নটি বছর। গঙ্গা, ভলগা, মিসিসিপি দিয়ে গড়িয়েছে অনেক জল এবং বাংলা টেবিল টেনিসেও এসেছে বহু পরিবর্তন। বিশ্ব টেবিল টেনিসের ক্ষেত্রে ঘটেছে বিভিন্ন উদ্ভাবন।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে প্রথম স্পঞ্জ ব্যাট আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫২ সালে বোম্বে (ভারত) এর আসরে। স্পঞ্জ ব্যাটে খেলে ঝড়ের গতিতে আক্রমণ করে জাপান মাতিয়ে দেয় সবাইকে। শেষ হয় পিম্পলড রবার লাগান কাঠের ব্যাটের যুগ। বলতে গেলে এরই সঙ্গে শেষ হয় টেবিল টেনিসের রাজপুত্র ভিক্টর বার্ণা যুগের স্কিল ভিত্তিক টেবিল টেনিস। শুরু হয় এক নবযুগ। স্কিল–এর সঙ্গে মেশে প্রচন্ড পাওয়ার এবং স্পিন। বোম্বে (১৯৫২) ও কলকাতা (১৯৭৫) বিশ্ব টেবিল টেনিস এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে এই দুই আসরে টেবিল টেনিস বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে দুই নতুন টেকনিক। বোম্বেতে স্পঞ্জ ব্যাট ও কলকাতায় কম্বিনেশন ব্যাট। পরবর্তী আসর ভারতে বসেছিল ১৯৮৭ তে খোদ রাজধানী দিল্লিতে এবং এবারও একটি নতুন মোড় নেয় বিশ্ব টেবিল টেনিস। ১৯৮৭ এর আসরেই প্রথম হলো নিয়ম (কম্বিনেশন ব্যাটের জ্বালাতেই হয়তো!) ব্যাটের দু পিঠের রবারের রঙ হতে হবে লাল ও কালো।

ভারতীয় টেবিল টেনিসে বাংলা একটি বিশিষ্ট স্থানে ছিল ৫০–এর দশকে। পর পর চারবার জাতীয় দলগত খেতাব (পুরুষদের) বার্ণা বেলাক কাপ ঘরে তোলে বাংলা। এই যুগে বাংলা সমৃদ্ধ ছিল একঝাঁক তারকার উপস্থিতিতে। কল্যাণ জয়ন্ত, রণবীর ভান্ডারী, জয়ন্ত দে, দীপক ঘোষ, কুমার ঘোষ প্রমুখ টেবিল টেনিস তারকাদের নাম উচ্চারণ করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও বাংলার টেবিল টেনিস বোদ্ধা ও প্রাক্তনরা। এঁদের পরে পরেই আসেন জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা। ষাটের দশক ও সত্তর এর দশকে বাংলা ভারতীয় টেবিল টেনিসকে সমৃদ্ধ করে দুই সোনার মেয়ে ইন্দু পুরী ও রূপা ব্যানার্জি (মুখার্জি) কে উপহার দিয়ে।

১৯৭২ এ এঁরা জাতীয় প্রতিযোগিতায় দলগতভাবে মহিলাদের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা (জয়লক্ষ্মী কাপ) এনে দেন বাংলাকে। জেতেন মহিলাদের একক বিভাগেও।

এর আগে বাংলার কল্যাণ জয়ন্ত হয়েছিলেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। ষাটের দশকে বাংলার স্থান ওপর দিকেই ছিল জাতীয় পর্যায়ে। আবার আশির দশকে তা চলে আসে মোটামুটি চতুর্থ থেকে অষ্টম–এর মধ্যেই।

আশির দশকে লক্ষ্যণীয় যে বাংলা থেকে এক ঝাঁক তরুণ খেলোয়াড় উঠে আসে, যারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৭৬ সালে বাংলার সৌমেন গাঙ্গুলি জুনিয়র

বাঙালি পোশাকে পোল্যান্ডের আন্দ্রেজ গুব্বা

বিভাগে ন্যাশনাল ফাইনালে উঠে হেরে যান মনমিত সিং–এর কাছে।

আশির দশকে উঠে আসেন গণেশ কুন্ডু, নূপুর সাঁতরা, টি কে দাস, শুভব্রত তালুকদার, চৈতালী দাস, প্রমুখ। সাম্প্রতিক কালে সাড়া জাগিয়েছেন অরূপ বসাক, অর্জুন দত্ত, মানতু ঘোষ, টিংকু কুন্ডু প্রভৃতি। বাংলার শতাব্দী বর্মন সাব জুনিয়রে জাতীয় ক্রমপর্যায়ে এলেও ফর্ম ধরে রাখতে পারেন নি।

বাংলার খেলোয়াড়রা সত্তর এর দশকে বিক্ষিপ্ত লগ্নে কিছু সাফল্য পেলেও এখনকার মত ধারাবাহিক সাফল্য পান নি। সত্তর এর দশকে বাংলার নাব্বু মুখার্জি, বট্টা ভিত্ত, দীপক হালদার, সাধন দত্ত, দিলীপ সিন্হা এঁরা ভিন রাজ্যের বা জাতীয় পর্যায়ের নামী খেলোয়াড়দের মাঝে মাঝে পরাস্ত করেছেন বটে কিন্তু জাতীয় আসরে পদক জয়ের তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বরং এখনকার খেলোয়াড়দের ধারাবাহিক সাফল্য অনেক বেশি। এ কথা মনে রেখেই বাংলা টেবিল টেনিস–এর সহ–সভাপতি শ্রী গোপীনাথ ঘোষ জানালেন, 'মান লক্ষ্যণীয় ভাবে বেড়েছে।'

সাম্প্রতিক কালের খেলোয়াড়দের মধ্যে নূপুর সাঁতরা ১৯৮৭র দিল্লি বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পুরুষ দলে ছিলেন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৮ এর মধ্যে কলকাতা তথা বাংলায় আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস–এর আসর বসেছে তিনটি বড় ও একটি টেস্ট ম্যাচ। ৩৩ তম বিশ্ব টেবিল টেনিস–এর পর হয় ১৯৭৮–এ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ, ১৯৮০ তে হয় ৫ম এশিয় টেবিল টেনিস, ১৯৮৪তে হয় গ্রাঁ প্রী প্রতিযোগিতা। এছাড়াও বসে ১৯৮৭ তে সাফ গেমস–এর টেবিল টেনিস আসর।

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস এখন কি পর্যায়ে এবং বাংলা এখন কোথায় বা কত পিছনে–এ প্রশ্ন হয়ত অনেকেরই মনে। এই ব্যাপারে খোঁজ নিতে হলে আসুন ঘুরে আসি বর্তমান বিশ্বমানে।

১৯৮৭ র ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ৩৯তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যার আসর বসে দিল্লিতে। ৩৯তম বিশ্ব টেবিল টেনিস–এর আসরে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য এই প্রতিবেদক–এর হয়েছিল এবং সুযোগ হয়েছিল বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির খেলোয়াড়, কোচ, টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার বিশেষজ্ঞ ইত্যাদিদের অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার ও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার।

১৯৭৫–এ যাঁরা কলকাতার দর্শকদের মনে স্থান পেয়েছিলেন ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলীর প্রদর্শনে, চীন–এর শি এন টিং, সুসাও শা, সুইডেন–এর শেল জোহানসন ১৯৮৭ তে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মিঃ হিতোসুকি তামাসু (পৃথিবী খ্যাত তামাসু বাটারফ্লাই–এর সভাপতি) এবং তাঁর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট ম্যানেজার মিঃ ডিক ইয়ামোখা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জার্মানির মিঃ জ্যালটকো করডাস যিনি জুলা কোম্পানির প্রমোশন ডিরেকটর এবং পশ্চিম জার্মানি দলের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার। উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সের জাতীয় কোচ ও খেলোয়াড় জাঁ সেক্রেতাঁ (যিনি ১৯৮৭–র বিশ্ব আসরে জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেন) এবং পোলাণ্ডের আন্দ্রেজ বারোনস্কি ও সোভিয়েত রাশিয়ার আন্দ্রেই বেলিয়াকভ। বাটারফ্লাই দোজো (রিসার্চ ল্যাবরেটরী ও ট্রেনিং সেন্টার) এর কোচ এইচ হিরাওখাও ছিলেন উপস্থিত। এঁদের কাছ থেকে পাওয়া নানা তথ্য ও অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথাই উপলব্ধি করা গিয়েছে তা হলো 'আমরা এখনও বিশ্ব টেবিল টেনিস এর বিশাল সমুদ্রতটে শুধু ঝিনুক কুড়োচ্ছি!'

চীন এর কোচ শি এন টিং বা অন্যান্যরা শুধু বলেছেন ক'টি কথা। ওঁদের ভাষায়, 'তাক্তিক', 'স্ত্রাতেজী', 'মেন্তাল' ও 'ফিজিক্' অর্থাৎ– 'ট্যাকটিক্স', 'স্ট্র্যাটেজি', 'মেন্টাল' 'ফিজিক্যাল'। এই কথাগুলির মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে আছে চীনাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। খেলোয়াড়–এর ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার ও মেন্টাল (মানসিক) স্ট্রাকচার–এর উপরই নির্ভর করে সে কি ধরনের খেলোয়াড় হবে। সেই অনুযায়ী তাকে দেওয়া হয় ট্যাকটিক্স এবং প্রতিপক্ষর খেলা অনুযায়ী রচিত হয় স্ট্র্যাটেজী। চীন এইভাবে একটি খেলোয়াড় খুঁজে বের করে ও তাদের স্পোর্টস স্কুল থেকে তৈরি করে চ্যাম্পিয়ন। চীন এর খেলোয়াড়দের বিখ্যাত পারসেন্টেজ টেবিল টেনিস–এর মূলতত্ত্ব এখানেই নিহিত। তাঁরা গবেষণা করছেন ও বের করছেন নতুন নতুন

ট্যাকটিকস, তুলে আনছেন একের পর এক বিশ্ব পর্যায়ের খেলোয়াড়।

ইউরোপীয়ান বিশেষজ্ঞরা বেছে দিয়েছেন দু' ধরনের খেলা হাতে রাখতেই হবে। আপ স্পিন ও ফাস্ট স্পিন। তাঁদের কথায়, 'বিশ্ব আসরে কিছু করতে গেলে এটা চাই–ই।' কলকাতায় যাঁরা সুরবেককে সেরা বলে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন আপ স্পিন এবং এখনকার তারকা আন্দ্রেজ গ্রুব্বার খেলা। গ্রুব্বার কথায়, 'আই প্রেফার টু প্লে আপ স্পিন'। পোলাণ্ড এর এই তারকা পশ্চিম জার্মান লীগ খেলেন, পুরোপুরি প্রফেশনাল। এঁর ব্যাট হল, ফ্যানেক্স্ প্লাই ও দু পিঠে স্রাইভার ব্যাকহ্যাণ্ড এবং ফোর হ্যাণ্ড আপস্পিন অত্যন্ত উঁচুমানের।

সুইডিশ খেলোয়াড়রা কিন্তু আপ স্পিন এর থেকে বেশি পছন্দ করেন ফাস্ট স্পিন সেখানে গ্রুব্বার ব্যাট ও বলের স্পর্শের আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না সেখানে সুইডিশ,–পারসন, অ্যাপেলগ্রেন, বিশ্ব-রানার্স জান ও গলডনার–এর ব্যাটের শব্দ দূর থেকেও শোনা যায়।

আধুনিক টেবিল টেনিস–এর গতি প্রকৃতি কেমন? খেলার গতি সম্বন্ধে একটু আঁচ পাওয়া যাবে ডেসমণ্ড ডগলাস ও অ্যালান কুক (ইংলণ্ড) এর একটি র‍্যালি থেকে। ৫৯ সেকেণ্ডে এঁরা ১৫৭টি কাউন্টার র‍্যালি করেছেন। বলে স্পিন (পাক) সবচেয়ে বেশি করান হাঙ্গেরীর ইস্তভান জুনিয়র ১৫০ আর পি এস অর্থাৎ মিনিটে ৯,০০০ বার।

বিশ্বের সামনের সারির সমস্ত দেশই প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের খেলা তুলে রাখে ভি ডি ও–তে, পরে বিশ্লেষণ করার জন্য। কোচরা তুলে নেন গ্রাফ–এর মাধ্যমে নিজেদের ও প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ভুলত্রুটি।

পারসেন্টেজ টেবিল টেনিস, চীন এবং কম্বিনেশন রবার এবং তার প্রয়োগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় পঃ জার্মানির মিঃ করডাস, জাপান–এর এইচ হিরাওখা, ডিক ইয়ামোখা প্রমুখ এর সঙ্গে। তথ্য হিসাবে পাওয়া যায়, বিশেষ বিশেষ রবার প্রয়োজন বিভিন্ন মানসিকতার খেলোয়াড়দের জন্য। ক'টি র‍্যালি হয় সেকেণ্ডে, কিভাবে খেলার বিভিন্ন স্ট্রোক–এর সময়ে বিভিন্ন আঙুলের পজিশন চেঞ্জ হবে, শ্বাস প্রশ্বাসের ভূমিকা কতখানি এবং কিভাবে তা করতে হবে, কোন স্ট্রোকের সময় ব্যাটের কোণ কি হবে; গ্রিপ শক্ত আলগা হবে, ট্রেনিং শিডিউল কি হবে, কোন বয়স থেকে কিভাবে খেলা শেখাতে হয়, কার কি খেলা উচিত, তালুর গঠন অনুযায়ী ব্যাট ইত্যাদির যা দীর্ঘ ফিরিস্তি ওঁরা দেন তা জেনে একটা কথাই মনে হয় যে এটা কি খেলাধূলা? নাকি যুদ্ধজয়ের রণকৌশল!

চীন–এর এক বিশেষজ্ঞ বলেন 'আমরা অত্যন্ত অল্প বয়সেই বেছে নিই ভবিষ্যত চ্যাম্পিয়ন কারা'।

টেবিল টেনিসে আমরা কবে এই মানে পৌছোব।

বাংলার শ্রী গোপীনাথ ঘোষ এক ছোট্ট সাক্ষাৎকারে বলেন, 'খেলোয়াড়দের ডেডিকেশনের অভাব, সময় দেয় না, সুযোগ সুবিধে নেই, দশ বছরেও বিশ্ব পর্যায়ে যাওয়া যাবে না।' কথাগুলি হয়তো সত্য কিন্তু ৩৯তম বিশ্ব আসরের অভিজ্ঞতা বলে, 'চ্যাম্পিয়ন পাওয়া যায় না, খুঁজে বের করে তৈরি করতে হয়'। টেবিল টেনিসের উপযোগী ছেলেমেয়ে (যাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন পুরোপুরি টেবিল টেনিস খেলার উপযোগী) বেছে নিয়ে তাদের উপযুক্ত আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক এগোতে পারলে পাঁচ সাত বছরেই কিন্তু এই বাংলার বুকে তৈরি হতে পারে বিশ্ব পর্যায়ের খেলোয়াড়।

সুইডেনের কোল জোহানসন–এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিঃ জোহানসন প্রশ্ন রাখেন (উনি সুইডেনের স্টিগা কোম্পানির পাবলিক রিলেশানে আছেন), '১৯৭৫ সালে স্টিগা যে রোবট প্র্যাকটিস মেশিন দিয়েছিল তোমাদের কলকাতাকে তার কি খবর?' প্রতিবেদক সলজ্জে তাঁকে জানাতে বাধ্য হন যে সেই রোবট ব্যবহার হয় না। বিস্ময়ের সুরে মিঃ জোহানসন জিজ্ঞেস করেন 'কিন্তু কেন?' এবং তারপর নানা কথার মাঝে মিঃ জোহানসন জানান,

'রোবট মেশিন খেলোয়াড়দের খেলার মান বাড়াতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।' স্বদেশে ফিরে তিনি পাঠান এই প্রতিবেদককে সেই রোবট (১৯৬৬–১৯৭৭ মডেল) এর ম্যানুয়েল ও অপারেটিং গাইড বুক।

এই স্টিগা রোবটে মিনিটে ৮০টি বল ফেলা যায় ৬০০০ + ৬০০০ আর পি এম এ এবং ফেলা যায় সমস্ত রকম বলই (টপ স্পিন, লুপ, চপ, সাইড স্পিন ইত্যাদি) সমস্ত অ্যাঙ্গেল ও ডিরেকশনে।

রোবট প্র্যাকটিস কতটা প্রয়োজনীয়। এই প্রশ্ন নিয়ে এই প্রতিবেদক মুখোমুখি হয় ৩৯তম বিশ্ব আসরে বিভিন্ন উন্নত দেশ–এর বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্বদের।

রোবট মেশিন সম্বন্ধে প্রত্যেকেই একই কথা বলেন তা হল আন্তর্জাতিক মানে উঠতে হলে রোবট অপরিহার্য। বর্তমানে সমস্ত কোম্পানিই প্রায় রোবট তৈরি করছেন। অত্যাধুনিক স্টিগা রোবট (কম্পিউটারাইজড়) বাটারফ্লাই রোবট ইত্যাদি।

রোবট–এ দু'টি চাকা থাকা বলে স্পিন ও স্পিড করানর জন্য, যাকে বল ডিরেকশন রেগুলেটর, অসিলেটার। কলকাতায় বি টি টি এ–কে দেওয়া স্টিগা রোবটও অসিলেটার যুক্ত। রোবট যিনি চালাবেন অর্থাৎ কোচ তিনি রেগুলেটার বাড়িয়ে কমিয়ে তাঁর ট্রেনীকে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করাবেন এবং খেলোয়াড়দের খেলার গতি, স্পিন–এর মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইত্যাদি বাড়তে থাকবেন ক্রমশ। ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। যে খেলোয়াড় নিয়মিত অনুশীলন করে সাধারণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে যাদের টপ স্পিন ৪–৫ হাজার আর পি এম সে যদি জুনিয়র এর মুখোমুখি হয় তবে স্বাভাবিক ভাবেই ৯,০০০ আর পি এম স্পিন–এর সামনে সে হবে অসহায়, কিন্তু রোবটের মাধ্যমে তার যদি ১২ হাজার আর পি এম স্পিন পর্যন্ত অভ্যাস থাকে তবে ৯০০০ খেলতে তার কোন অসুবিধাই হবে না। ঠিক তেমনি যে খেলোয়াড় মিনিটে ৫০–৬০ বল খেলতে অভ্যস্ত সে যদি ৭০–৮০ বল খেলতে অভ্যস্ত খেলোয়াড়ের সামনে পড়ে তবে অসহায় হবেই কিন্তু রোবটের মাধ্যমে ৮০ বল পর্যন্ত খেলা থাকলে অসুবিধা হবে না।

১৯৮৭ বিশ্ব আসরে বাংলার নূপুর সাঁতরা সুযোগ পায়। তবে ব্রাজিল এর হোয়ামা হুগোর সঙ্গে কোয়ালিফাইং ম্যাচেই হেরে যায়। ওই ম্যাচে বাঁহাতি হোয়ামা শুধু আপস্পিন–এই অসহায় করে দেন নূপুরকে। প্রথম গেমে নূপুর প্রায় দাঁড়িয়ে হারেন। হোয়ামার ব্রেজিং আপস্পিন–এ যে মানের স্পিন থাকছিল তা নূপুর ব্লক রাখতে পারছিলেন না। বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি হবে কি? প্রশ্নের উত্তরে বাংলা টেবিল টেনিস–এর ব্যাপারে অভিজ্ঞ জনৈক জানান, 'আগামী দশ বছরেও নয়'। কথাটি নির্মম সত্য কিন্তু এর সঙ্গে আরও একটু যোগ করতে হয় যে দশ কেন কোনদিনও সম্ভব হবে না যদি না গলদ শুধরান যায়।

বাংলা থেকে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি হবে কি? প্রশ্নের উত্তরে বাংলা টেবিল টেনিস-এর ব্যাপারে অভিজ্ঞ জনৈক জানান, 'আগামী দশ বছরেও নয়'।

আধুনিক টেবিল টেনিস–এ আপস্পিন বা টপ স্পিন হল অন্যতম অপরিহার্য স্ট্রোক। কেবলমাত্র চীন–এর পিম্পলড ব্যাট খেলোয়াড়রা ব্যতিক্রম। বাংলার খেলোয়াড়রা খেলে কতকটা ইউরোপীয়ান ধাঁচে। বাংলার উঠতি তারকারা, নূপুর, অরূপ বসাক, টি কে দাস, অর্জুন দত্ত–এরা সবাই ইউরোপীয়ান ধাঁচের খেলাই অনুসরণ করতে চায় যাদের মূলমন্ত্র হল টপস্পিন।

আন্তর্জাতিক মানের টপস্পিন বা আপস্পিন করা শিখতে গেলে কিভাবে তা শেখা উচিত? 'বাটারফ্লাই টেবিল টেনিস রিপোর্ট'–এ বিখ্যাত কোচ জোলটান বেরজিক এর একটি রচনায় দেখা যায় টপস্পিন শেখার আগে আটটি বেসিক স্ট্রোক শিখতে হবে এবং তারপর প্রথম দু'সপ্তাহ বোর্ডের বাইরে অর্থাৎ ইনট্রোডাকটরি টপস্পিন এবং তারপর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ৪ –৬ মাস শিখতে হবে। অথচ আমাদের বাংলায় খেলোয়াড়রা প্রথম মাসেই (একমাস কোচিং ক্যাম্প) শেখে টপস্পিন এবং ইনট্রোডাকটরি ছাড়াই। সুতরাং বিশ্ব মানের টপস্পিন করা যে এদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য।

বিখ্যাত হাই টস, সার্ভিস, অর্থাৎ বল অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে সার্ভ করা এই সার্ভে যে বলের ভরবেগ বাড়ান কমানর দ্বারা স্পিনের তারতম্য ঘটান যায় তা ক'জন অভ্যাস করে?

বাংলার খেলোয়াড়দের কাউকে 'মিডিল চপ' করতে দেখা যায় না। দেখা যায় না প্র্যাকটিস করতে 'অ্যারাউণ্ড দ্য নেট' স্ট্রোকও।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে যা এখন সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র সেই কম্বিনেশন গেমও বাংলায় খুব একটা কেউ খেলেন না। কয়েক বছর আগে আনন্দ স্বামীনাথন শুধু কিছুটা খেলছিলেন। ব্যাটের দু'পিঠে দু'রকম চরিত্রের রবার লাগিয়ে ঝড়ের গতিতে র‍্যালির মধ্যে ব্যাট ঘুরিয়ে খেলার গতিপ্রকৃতি বদলে প্রতিপক্ষকে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে অসহায় করে দেওয়া। এ খেলা আজ টেবিল টেনিসে এত মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে যে ইউরোপের কিছু দেশ প্রতিবাদের ঝড় তোলে কারণ যদি দু'পিঠের রবারের একই রঙ হয় তবে প্রতিপক্ষের বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে বলের গতিপ্রকৃতির আন্দাজ। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় ব্যাটের দু'পিঠের রবারের রঙ হবে লাল ও কাল। এতে কিছুটা সুবিধা হবে আগে ভাগে আন্দাজ করতে।

বাংলার মেয়েরা অধিকাংশই ব্যবহার করে ওই কম্বিনেশন ব্যাট। চৈতালী দাস, করবী ঘোষ, বিশাখা চৌধুরী থেকে মানতু ঘোষ। মজার ব্যাপার হল এরা কম্বিনেশন ব্যাটে খেলে কিন্তু তার প্রয়োগ অর্থাৎ 'টুইডলিং বিটুইন র‍্যালি' করে না, অর্থাৎ ব্যাপারটি কতকটা বন্দুক হাতে নিয়ে গুলি না ছুঁড়ে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করার মতই। কম্বিনেশন টুইডলার সবাই হতে পারে না। তার জন্য চাই বিশেষ মানসিক গঠন ও তালুর গঠন যা নেই চৈতালী, করবীর মধ্যে। এদের কম্বিনেশন ব্যাটে খেলা যাঁরা ধরিয়েছেন তাঁদের জানা উচিত ছিল যদি কম্বিনেশন ব্যাটে খেলতেই হয় তবে না ঘোরাতে পারলে সাফল্য নেই। কিন্তু চৈতালী, করবী, বিশাখা কি সাফল্য পায় নি? পেয়েছে, ভারত সেরা হয়ত হওয়া যায় টুইডলার না হয়ে। কিন্তু বিশ্ব সেরা? নৈব নৈব চ। হয়ত এঁদের লক্ষ্যই ভারত সেরা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাল কি হয় বিশ্ব সেরা কম্বিনেশন টুইডলারদের হাতে পড়লে তা জানতে হলে বেশি দূর যেতে হবে না, যে কোন টুইডলার–এর সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দের স্কোরই বলে দেবে।

আসলে জন্মগত ভাবে কম্বিনেশন টুইডলার যারা তারা হয়ত জানেই না তাদের কি খেলা উচিত। এজন্য দায়ী কোচেরাই। মাত্র দু'তিন মাসের (২০–২২ ঘন্টা) প্র্যাকটিসেই জন্ম টুইডলার বিদ্যা ববিতা প্রিথিয়ানি ব্যাট ঘোরাতে শুরু করে নিপুণতার সঙ্গে কিন্তু পরিস্থিতির পাকচক্রে এই জন্মগত টুইডলাররা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

কিন্তু কেন বাংলা টেবিল টেনিসে খেলোয়াড়রা ঠিক ভাবে তৈরি হতে পারছে না? তুল্যমূল্য বিচার করার আগে সম্প্রতি জাপানে কোচিং নিয়ে আসা দুই খেলোয়াড়–এর বক্তব্য তুলে ধরছি। এরা হলো গণেশ কুণ্ডু ও দেবাশিস চৌধুরী। গণেশ ১৯৮৫তে ও দেবাশিস '৮৬তে জাপান গিয়েছিলেন, ওগিমুরা ট্রেনিং সেন্টারে ২১ দিনের কোচিং–এ।

গণেশের প্রথম কথাই ছিল, '২১ দিনের কোচিং–এ কিছু লাভ নেই অন্তত ছ'মাস হলে কিছু হত।' গণেশের মুখেই শোনা গেল ওদের প্র্যাকটিস করান হত দিনে ছয় ঘন্টা এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং আধ ঘন্টা। রাত্রে থিওরি ও ভি ডি ওতে ভুল দেখান হত আধ ঘন্টা। এছাড়া এক ঘন্টা গেম খেলান হত। সপ্তাহে একদিন 'ওয়েট ট্রেনিং'। ওদের বিভিন্ন জায়গায় খেলান হত।

দেবাশিস-এর কথায় বল কনট্রোল, স্পিন কনট্রোল বেড়েছে, বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। দেবাশিসকে উপদেশ দেওয়া হয় বেশি ফ্ল্যাটের উপর খেলতে দুইদিকেই অর্থাৎ ব্যাকহ্যাণ্ড ও ফোর হ্যাণ্ড ওপেন করতে। ভি ডি ওতে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের সার্ভিস দেখিয়ে বলা হতো সার্ভিস বেছে নিতে ও অনুশীলন করান হত। জাপান থেকে আসার পর দেবাশিসের খেলায় লক্ষ্যণীয়ভাবে স্পিন বেড়েছে।

গণেশ, দেবাশিস, নূপুর ইত্যাদিরা জাপান ঘুরে এসেছেন আরও জুনিয়ররা ভবিষ্যতেও যাবেন কিন্তু বিদেশে গিয়ে কোচিং নিলেই কি বিদেশিরা তাঁদের ভাণ্ডার উজার করে সুপ্রবিদ্যা দেবেন? উত্তর এক কথায়ই যে কখনই না। বিদেশ থেকে কোচ আমদানি করা হয় প্রায়ই হয় কোচিং ক্যাম্পও। কিন্তু বিদেশিরা খেলার প্র্যাকটিক্যাল দিকটাই শুধু শেখান, থিওরি উজাড় করে দেন না। 'একটি বল পুশ করতে হবে এইভাবে' করে দেখান কিন্তু থিওরি ভাঙেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিদেশি কোচেরা প্রত্যেকেই গ্রাফ করতে জানেন কিন্তু প্রদেশে এসে কোচেস কোচিং-এ তাঁরা গ্রাফ শেখান না।

১৯৮৫তে দুই কোরীয় কোচ কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরা 'মাল্টি বল' প্র্যাকটিস করিয়েছিলেন। অর্থাৎ ঝুড়ি ভর্তি বল নিয়ে একটির পর একটি বল পাঠান, ধীরে ধীরে স্পিড, স্পিন যার বেড়ে টাইমিং আসে কমে কিন্তু কতজন বাংলার কোচ ওই আধুনিক স্টাইল রপ্ত করেছেন? এই বল ফেলার একটি সুনির্দিষ্ট ছক আছে, আছে হিসেব রাখার নানা উপায় সেগুলি কি তাঁরা দেখিয়েছেন? এই 'মাল্টি বল' প্র্যাকটিস করান হত চীনের বিখ্যাত কম্বিটিইডলার চেন জিন হুয়াকে। এই ভাবে অনুশীলনে খেলার মান অত্যন্ত উন্নত হয় যে তা বলাই বাহুল্য।

'স্টিগা' রোবট বাক্স বন্দী, নেই সেরকম কোন উদ্যোগ নিয়মিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোচিং স্কিম খেলোয়াড় তৈরি করার। বাংলা টেবিল টেনিসের বিখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব বলেছিলেন কতকটা হতাশার সুরে, 'কোন ধারণা নেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক টেবিল টেনিস সম্পর্কে' কথাটি খাঁটি সত্য কারণ যেখানে বিদেশে নিরন্তর গবেষণা চলছে খেলার মান বাড়ানর জন্য সেখানে আজও বাংলার টেবিল টেনিস সংস্থাকে ন্যূনতম সরঞ্জাম অর্থাৎ ব্যাটের রবারের যোগান দিতেও হিমসিম খেতে হয় 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' গোছের অবস্থা। টি টি এফ আই কবে রবার দেবেন! যদি রাজ্যগুলি আমদানির লাইসেন্স পায় তবে অন্তত খেলোয়াড়রা রবারটুকু নিয়মিত হাতে পায়। বিশ্ব টেবিল টেনিসে খেলোয়াড়দের দেখা যায় ঘন ঘন রবার বদলাতে। পোলাণ্ডের তারকা আন্দ্রেজ গ্রুব্বাকে প্রশ্ন করতে উত্তর আসে, 'এই বারদিনে আমার ৮-১০টি সাইভার লেগেছে, আগে রবারের মান খারাপ ছিল তখন প্রায় প্রতিদিনই পাল্টাতে হত।' আমাদের খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই অবাক হবে কিন্তু এটাই ঘটনা যে নতুন রবারের বাউন্স থাকে অটুট এবং নিখুঁত, ফলে স্ট্রোকও হয় নিখুঁত।

বাংলার টেবিল টেনিস থেকে বিশ্ব পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরি হতে পারে একথাকে যাঁরা অলীক স্বপ্ন বলে ভাবেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে শুধু এটুকু জানান যেতে পারে যে সম্ভব। যদি, হ্যাঁ কতকগুলি যদি আছে শুধু। বাংলার প্রশিক্ষকরা যদি আধুনিক টেবিল টেনিস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন, যদি রবারের স্পিন স্পিড ও কনট্রোল কি তা জানেন; যদি কোন রবার কোন ধরনের খেলার উপযোগী জানেন; যদি কিভাবে জানতে হয় কোন খেলোয়াড় কি ধরনের খেলা খেলতে পারে তা বুঝতে শেখেন; যদি কে প্রকৃত খেলোয়াড়ের মানসিকতার অধিকারী তা বুঝতে পারেন, যদি খেলোয়াড়ের মানসিক দৃঢ়তা বাড়াবার কৌশল আয়ত্ত করেন, যদি প্রতিপক্ষের খেলা দেখে নিজের খেলোয়াড়কে সঠিক স্ট্র্যাটেজি দিতে পারেন (নিজের খেলা খেলো বলেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া নয়), খেলোয়াড় নয়, কে খেলোয়াড় হতে পারে খুঁজে নিয়ে যদি টেবিলে আনতে পারেন এবং যদি পারেন একনিষ্ঠভাবে গড়তে চাওয়ার সাধনায় লেগে থাকতে, যদি পারেন খেলোয়াড়ের খেলার সঠিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঠিক সময়ে হাতে তুলে দিতে, যদি পারেন খেলোয়াড়ের মানসিকতা গড়ে দিতে 'বিশ্ব পর্যায়ে যাওয়ার জন্যই আমার জন্ম', তবে বলা যায় নিঃসন্দেহে বাংলা থেকেও তৈরি হতে পারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

বাংলার উঠতি তারকা অরূপ বসাকের কোচ শ্রী জয়ন্ত পুশিলাল ৩৯তম বিশ্ব আসরে বিদেশি কোচদের দেখে সখেদে মন্তব্য করেন যে 'আমরা এখানকার কোচেরা হলাম জোকার।' একজন কোচ হবেন তাঁর ট্রেনির ফ্রেণ্ড ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড এটাই উপলব্ধি করার মত, শেখার মত। আর এর ওপরেও আছে সমালোচক ও টেবিল টেনিস অজ্ঞ জোকাররৃন্দ, ইনট্রোডাকটরি টপস্পিন দেখে হয়ত কেউ মন্তব্য করবেন, 'বোর্ডে নয়, মাঠের মধ্যে বা টেনিস কোর্টে টপস্পিন! এ কিরকম কোচ?'

আসল কথা হলো আমরা কুয়োর ব্যাঙ, কুয়োটাকেই সাগর ভাবি আর সাগরের রূপ কেউ বর্ণনা দিলে ভাবি মিথ্যা বলছে। যেখানে বিশ্ব টেবিল টেনিস সুসংগঠিত হয়, হয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নিয়মিত ব্যবধানে, যাঁরা এই মহাযজ্ঞের সফল উদ্যোক্তা তাঁরাই বলেন, 'আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক টেবিল টেনিস সম্বন্ধে ধারণা নেই' এই ধারণা না থাকার দায়িত্ব কার? বিশ্বমানে ভারত প্রথম কুড়ির মধ্যেই আছে আর যে খেলাতে (ফুটবল) ভারত বহু নিচে বিশ্ব মানের সেই খেলা ঘিরে তুমুল জনপ্রিয়তা অথচ টেবিল টেনিসে নেই কিন্তু কেন? বোদ্ধারা বলবেন যে মোটিভেশন-এর অভাব। কিন্তু প্রশ্ন কি রাখা যায় না যে মোটিভেট করার দায়িত্ব কিন্তু সংস্থা ও সংগঠক এবং কর্মকর্তাদেরই।

এখানে খেলোয়াড়রা সফল হলেই প্রশিক্ষক গলা বাড়িয়ে বলেন কৃতিত্ব যেন শুধু তাঁরই কিন্তু ব্যর্থ হলে খেলোয়াড়-এর ঘাড়েই চাপান হয় দোষটা। বাংলা জাতীয় আসরে সম্প্রতি বেশ সফল-এ ব্যাপারে হয়ত কোচ দাবি জানাবেন কৃতিত্ব তাঁরই, কিন্তু সবিনয়ে জানাই যে কপিলদেবও বিলিয়ার্ড খেলেন কিন্তু যদি কপিলদেব কোচ নিযুক্ত হন, মাইকেল ফেরেরা, সুভাষ আগরওয়াল ও গীত শেঠী সমৃদ্ধ ভারত দলের এবং তাঁরা বিশ্ব বিলিয়ার্ড জেতেন তবে কি কপিলদেব কৃতিত্ব দাবি করতে পারবেন? নিশ্চয়ই না, ঠিক তেমনি জাতীয় পর্যায়ের তিন খেলোয়াড় নূপুর সাঁতরা, গণেশ কুণ্ডু ও শুভব্রত তালুকদার-এর বাংলা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হতে পারে জাতীয় আসরে কোন কোচ না রেখেই। এখানে খেলোয়াড়রা নিজেদের উদ্যোগে প্র্যাকটিস করে একটু মান বাড়লেই, অন্যদের সঙ্গে খেলে খেলেই তারা আনে কৃতিত্ব সম্পূর্ণ নিজে উদ্যোগে।

প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, চাই সংস্থার উদ্যোগ খেলোয়াড় তৈরির, প্রয়োজন নিখুঁত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। লক্ষ্য হোক একটিই, 'বিশ্ব আসরে পদক জয়।'

সঠিক পথে এগোলে তবেই আসবে সাফল্য নচেৎ আমরা শুধু মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক আসর সুসংগঠিত করে, বিদেশিদের তারিফ কুড়িয়ে এবং অন্য দেশের সেরাদের হাততালি দিয়ে শুধু অভিনন্দিত করেই ধন্য হব। মনে ভাবব, 'আহা কি সুন্দর খেলে এমনটি যদি আমাদের খেলোয়াড়রা পারত!' ওই সুন্দর খেলার পিছনে যে কঠিন পরিশ্রম, সাধনা, বিজ্ঞান আছে তা কিন্তু খুঁটিয়ে আমরা দেখব না, জানতে চাইব না ওরা যেভাবে তৈরি আমরাও সেভাবে তৈরি হলে কি হবে?

আসল দোষ আমাদের মানসিকতার, দূরদৃষ্টির ওপর ওপর দেখেই আমরা সন্তুষ্ট খুঁটিয়ে তলিয়ে কিছুতেই আমরা দেখি না; চাই রেডিমেড। তৈরি করে নেবার ধৈর্য নেই। যেদিন আমরা তলিয়ে দেখতে শিখব, শিখব হীরে পালিশ করার কৌশল সেদিনই হবে আন্তর্জাতিক আঙিনায় স্থান নয়ত 'আমরা পিছনে' এই দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই কেটে যাবে কাল, বিশ্ব পর্যায়ে কেন যেতে পারব না, যেতে হবেই এই মোটিভেশন যেদিন খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রশিক্ষকরা আনতে পারবেন সেদিনই কমে আসবে ব্যবধান এবং ঘুচলেও ঘুচতে পারে ফারাক। বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরিতেই হবে তা, অন্যথায় নয়। বাংলাকে এগোতে হলে দায়িত্ব নিতে হবে প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে শুধু খেলোয়াড়দের নয়।

৩৬ পৃষ্ঠার পর

বলেছে নেই! হাজার বার আছে। বিদেশ যাত্রা হবেই।

১৯৭০-এ আমি লণ্ডন যাচ্ছিলাম। ইন্দ্রজিতকে বললাম, তুমিও চল আমার সাথে। দেখি তোমার বিদেশ যাত্রা আছে কিনা। আমার কথা শুনে ও মাকে লুকিয়ে দিল্লি থেকে পাসপোর্ট করাল। কারণ সে একমাত্র ছেলে। ঠিকুজিতে যখন বিদেশ যাত্রা নেই তখন তার মা তাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না। কিন্তু তার মা কি করে জেনে গেলেন। তারপর বকাবকি। সে এসে হতাশ হয়ে বলল, ভাই, আমার কপালে সত্যি বিদেশ যাত্রা নেই!

আমি বললাম, আলবাৎ আছে! তুমি মাকে না জানিয়েই টিকিট-ফিকিট কিনে নাও।

সে বলল, কিন্তু, এখন ২৫ হাজার টাকা পাই কোথায়?

তখন ক্রেডিট প্ল্যানে টিকিট কেনা হল। আর আমি কিছু টাকা ধার দিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ট্রাভেল ফরেন এক্সচেঞ্জ নিল সে।

আমার ফেভারিট ফ্লাইট ছিল সানডেতে। এয়ার ইণ্ডিয়ার ৭০৭ বোয়িং। তখনও জামবো আসেনি। ৯টার সময় প্লেন ছাড়ে লণ্ডনে পৌঁছোয় সন্ধেবেলা। ঐ ফ্লাইটেই বুক করলাম।

ওর মা কিছু জানেন না। যাবার সময় ও শুধু বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিল যে, আমার সাথে দক্ষিণে যাচ্ছে।

যথারীতি প্লেন ছাড়ল। দেখি, ইন্দ্রজিৎ সিটের ওপর কাঠের পুতুলের মত নট নড়নচড়ন হয়ে বসে আছে। তার মুখ-চোখ শুকনো। ব্রেকফাস্ট এল। সে ছুঁয়েও দেখল না। আমি তাকে কতভাবে সাহস দিলাম। কিছুতেই কিছু হল না।

প্লেন প্রথম ল্যান্ড করল কায়রোতে। নেমে লাউঞ্জে বসলাম কোল্ড ড্রিংকস্ নিয়ে। তাকে সহজ করার জন্যে বললাম, এখন তো তুমি বিদেশের মাটিতে, নাকি বল? আবার বললাম, হাবসিদের দেখেছ, এরা কত লম্বা! কিন্তু, তার খুব একটা পরিবর্তন হল না।

প্লেন আবার উড়ল জেনেভার পথে। কিন্তু আবহাওয়া বেশ খারাপ হয়ে উঠল। ঝড়ে পড়ে প্লেন কখনও ১০০-২০০ ফিট নিচে পড়ে যায় আবার কখনও হঠাৎ ৫০-১০০ ফিট ছিটকে ওপরে উঠে যায়। যাত্রীদের নাজেহাল অবস্থা। কার কম্বল উড়ে যাচ্ছে, কার গ্লাস পড়ে যাচ্ছে। অনেকে বমি করে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। এবার কিন্তু আমারই ভয় হতে লাগল। আমার ভয় হচ্ছিল এই জন্যে যে তাকে জোর করে এনেছি আমিই। তাছাড়া, চারপাশে বমিটমি দেখে আমারই কেমন বমি পাচ্ছিল। যাই হোক জেনেভা তো পৌঁছানো গেল। কিন্তু জেনেভা থেকে লণ্ডনের পথটুকু আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে গেল। আমি নিজে এত ভয় পেয়েছিলাম যে কি বলব! নিজের ওপরই তখন আমার অবিশ্বাস হচ্ছিল, আমি কি ইন্দ্রজিতের হাত ভুল দেখেছি। কিন্তু শেষমেষ নিরাপদেই প্লেন ল্যান্ড করল লণ্ডনে।

পরদিন রতন এল একটা সাদা অ্যামবাস্যাডরে চড়ে। বলল, আপনি ডেকেছেন তাই এলাম। অন্য কেউ হলে সময় দিতে পারতাম না। এক্ষুনি চলে যাব।

ইন্দ্রজিৎকে নামিয়ে বললাম, তোমার বিদেশ ভ্রমণ হল হে!

এরপর তো অন্তত বার ২০ বিদেশ গেছে ইন্দ্রজিৎ। কোন জ্যোতিষ বলেছিল, তার বিদেশ যাত্রা নেই!

যে ঘটনাটি বলে এ কাহিনীর ইতি টানব, সেটি বেশ মজার। মনে আছে রতনের কথা। এক বন্ধুর অনুরোধে তাকে আমি একটি চাকরি দেখে দিয়েছিলাম। তখন আমি কালকা মেলে কলকাতায় প্রায়ই যাতায়াত করি। প্রতিবারই আমি হাওড়ায় নেমে অবাক হয়ে দেখতাম, কেউ থাকুক না থাকুক সে আমার জন্যে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। সে কি করে যে আমার যাবার খবর পেত তা আমার কাছে আজও অনাবিষ্কৃত! যাই হোক, প্রতিবারই সে আমাকে বলত যে সে আগের চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছে। তাকে আর একটা চাকরি যেন দেখে দিই। ছেলেটির ওপর আমার কেমন স্নেহ পড়ে গিয়েছিল। তাই কয়েকবার তার আব্দার রক্ষা করেছিলাম।

একবার হাওড়ায় নেমে দেখি সে যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিতে মালপত্র তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে যেতে যেতে সে তার পুরোনো আব্দার শুরু করল। তখন হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে আমাদের ট্যাক্সি ছুটছিল। তার আব্দারে বিরক্ত হয়ে বললাম, বুঝলে হে, তোমার দ্বারা চাকরি বাকরি হবে না। তুমি বরং এখানে বসে মাদুলি বিক্রি কর।

আমার কথায় সে কেমন আশ্চর্য হয়ে তাকাল। তারপর একদম চুপ করে বসে রইল। সারা পথে আর একটি কথাও বলেনি।

বহু বছর আর রতনের দেখা নেই। একদিন আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, রতনের খবর কি? কেমন আছে ছেলেটা?

বন্ধু বলল, সে কি আর সেই রতন আছে! সে এখন রীতিমত বড়লোক হয়ে উঠেছে। লোককে মাদুলি দেয় আর গাদা গাদা টাকা নেয়।

আমি মুচকি হেসে বললাম, তাই নাকি। কাল একবার পাঠিয়ে দিও তো আমার কাছে।

পরদিন রতন এল একটা সাদা অ্যামবাস্যাডরে চড়ে। বলল, আপনি ডেকেছেন তাই এলাম। অন্য কেউ হলে সময় দিতে পারতাম না। এক্ষুনি চলে যাব। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলি। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার সময়টা এখন খুব খারাপ যাচ্ছে। একটা মাদুলি ধারণ করুন। খুব বেশি পড়বে না…মাত্র ২০০ টাকা। স্নানান্তে, শুদ্ধ বস্ত্রে লাল ঘুনসিতে ধারণ করুন। দেখবেন…।

রতনের মত আমিও পারতাম আমার এই সহজাত ক্ষমতার বিনিময়ে অনেক অনেক কিছু করতে। কিন্তু করিনি। নইলে সুযোগ তো কম ছিল না। গজেন্দ্রর প্রথম স্ত্রীর ভাই উত্তর ভারতের এক রাজ্যের চিফ মিনিস্টার। তিনিও আমার এই ক্ষমতার ফল প্রত্যক্ষ করেছেন। ললিতের প্রথম স্ত্রীর এক ভাই কেন্দ্রীয় সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি। সেও আমার ক্ষমতার কথা জানে। এছাড়া এতগুলো জেনারেল এবং বহু নামীদামী লোকের প্রেডিকশন করেছি আমি। কিন্তু, কারোর কাছ থেকে এক ফোঁটাও সুযোগ নিইনি কখনও।

এই গল্প পেশ করার সাথে সাথে একটা অনুরোধ রাখছি। পাঠকদের মধ্যে হয়ত কারও এমন ক্ষমতা রয়েছে। দয়া করে তাকে ব্যবসা করে তুলবেন না। একবার চক্করে পড়লে ফেরার পথ বন্ধ।

ও হো, হ্যাঁ। একটা কথা বলতে ভুলেছি। এ পর্যন্ত আমার একটা প্রেডিকশনই ভুল হয়েছে। এক ভদ্রমহিলাকে বলেছিলাম, আমার চেয়েও ভাল ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে। তা হয়নি! ভদ্রমহিলা আমারই স্ত্রী।

Casuals or Formals, That's Great Style !